প্রতিচিন্তা

খতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

ষষ্ঠ বর্ষ ● প্রথম সংখ্যা ● ঢাকা ● জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ : সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার ঢাকা-১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১

পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

প্রতি চিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যা, ২০১৬

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; ফেলো, পিপিআরসি

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পর্ষদ
নজরুল ইসলাম, ঊর্ধ্বতন অর্থনীতিবিদ, জাতিসংঘ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-বিষয়ক বিভাগ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
হাসান ফেরদৌস, জাতিসংঘে কর্মরত
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, প্রথম আলো

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

সহকারী সম্পাদক
খলিলউল্লাহ্ ও গোলাম মুস্তাফা

দাম : ৫০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : protichinta.com, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
January-March Issue, 2016; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
100 Kazi Nazrul Islam Avenue (CA Bhaban), Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

রাজনৈতিক অর্থনীতি

দরিদ্রবান্ধব স্থানীয় সরকার ও ইউনিয়ন পরিষদ নেতাদের রাজনৈতিক হিসাবনিকাশ ৯
মির্জা হাসান ও সোহেলা নাজনীন

শিক্ষা

দারিদ্র্য দূরীকরণে শিক্ষাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ ৫৭
এম এম আকাশ

দক্ষিণ এশিয়ায় মাদ্রাসাশিক্ষা : প্রাক-ঔপনিবেশিক এবং ঔপনিবেশিক আমল ৭৫
আলী রিয়াজ

স্বাস্থ্য

বিশ্ব স্বাস্থ্যের পরিপ্রেক্ষিত ও বাংলাদেশ ১০৫
শাহাদুজ্জামান

পর্যালোচনা নিবন্ধ

মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদ : মিথ না রিয়েলিটি? ১১৯
আরিফ রহমান

বই আলোচনা

জেনোসাইড বাংলাদেশ : আপেক্ষিক বনাম তথ্যগত দৃষ্টিভঙ্গি ১৪৯
মো. ফজলে রাব্বি

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংঘাতের ইতিবৃত্ত ১৬৯
গোলাম মুস্তাফা

পাঁচ বছরের প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বই আলোচনা ১৮৪

লেখক পরিচিতি ১৮৯

খোলা চিন্তা
সম্পাদকীয়

সুশাসন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সর্বস্তরের এক পরম আকাঙ্ক্ষিত বিষয় হলেও দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য তা আরও বেশি জরুরি। ইউনিয়ন পরিষদই স্থানীয় সরকারব্যবস্থার সর্বনিম্ন ও একমাত্র স্তর, যেখানে সাধারণ মানুষের কিছু মাত্রায় হলেও যোগাযোগ ও কথা বলার সুযোগ রয়েছে। তাই সরকারব্যবস্থার এই স্তরটির সুশাসন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকারের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। আগামী মার্চে ইউপি নির্বাচনকে সামনে রেখে 'দরিদ্র্যবান্ধব স্থানীয় সরকার ও ইউনিয়ন পরিষদ নেতাদের রাজনৈতিক হিসাবনিকাশ' প্রবন্ধটি স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিতকরণে রাজনৈতিক নির্ধারকগুলো বুঝতে সহায়তা করবে। প্রবন্ধটি লিখেছেন মির্জা হাসান ও সোহেলা নাজনীন।

শিক্ষা অন্যতম মৌলিক মানবাধিকার। সুশিক্ষাই পারে বাংলাদেশের বহুল জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে সমৃদ্ধ করে একটি উন্নত রাষ্ট্রগঠনের দিকে এগিয়ে নিতে। অন্যদিকে শিক্ষার সঙ্গে দারিদ্র্যের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বিদ্যমান। সুশিক্ষার অবাধ বিস্তারই পারে কোনো সমাজের এবং বৃহত্তর অর্থে রাষ্ট্রের দরিদ্র মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে। বাংলাদেশ সর্বশেষ ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। এই শিক্ষানীতির অন্যতম মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি-সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন-সহায়ক করে তোলা এবং বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সবার জন্য শিক্ষালাভের সমান সুযোগ অবারিত করা। এম এম আকাশ তাঁর 'দারিদ্র্য দূরীকরণে শিক্ষাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ' শীর্ষক প্রবন্ধে নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ তুলে ধরে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কর্মমুখী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার যুক্তি তুলে ধরেছেন। লেখকের মতে, প্রাথমিক শিক্ষা-পরবর্তী স্তরে মানসম্মত কারিগরি শিক্ষার প্রচলন ও সমন্বয় সম্ভব হলে দেশকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা সম্ভব। এই প্রবন্ধ উৎসাহী পাঠক এবং নীতিনির্ধারক উভয়কেই শিক্ষার বিস্তার এবং উন্নয়নে নতুন ভাবনার খোরাক জোগাবে বলে আশা করি।

গত ১২ জানুয়ারি, ২০১৬-তে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে মাদ্রাসাছাত্রদের সঙ্গে পুলিশ এবং ছাত্রলীগ-যুবলীগ কর্মীদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। যদিও ঘটনার সূত্রপাত এর আগের দিন ১১ জানুয়ারিতে। এই দিন সংঘর্ষে শহরের জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার এক শিক্ষার্থী নিহত হয় এবং এর জের ধরে পরের দিন শহরে ছড়িয়ে পড়ে সহিংসতা। এই সহিংসতায় ধ্বংস করা হয় উপমহাদেশের স্বনামধন্য সংগীতসাধক ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর স্মৃতিবিজড়িত সংগ্রহশালাসহ নানা সংগ্রহ ও স্থাপনা। এই ঘটনাকে অনেকে দেখছেন বিশ্বব্যাপী বিকাশমান ধর্মীয় উগ্রবাদের মহড়া হিসেবে। অন্যদিকে অনেকের মতে, এটি চলমান জাতীয় রাজনৈতিক অস্থিরতার একটি বহিঃপ্রকাশ। ভারতীয় উপমহাদেশে মাদ্রাসাশিক্ষার উৎপত্তি, ইতিহাস এবং বিকাশের ধারণার বিস্তৃত আলোচনা এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই আলী রীয়াজের 'দক্ষিণ এশিয়ায় মাদ্রাসাশিক্ষা: প্রাক-ঔপনিবেশিক এবং ঔপনিবেশিক আমল' নামক প্রবন্ধটি ছাপা হলো। এই প্রবন্ধটিতে পাঠক উপমহাদেশে মাদ্রাসাশিক্ষার ইতিহাস এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতির পরিবর্তনের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন বলে আশা করি।

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশের অন্যতম পূর্বশর্ত। বর্তমানে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বাস্থ্যকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কয়েক দশক ধরে এইচআইভির মতো মরণব্যাধিকে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছিল। তবে বিশেষত গত কয়েক বছরে ইবোলা এবং বর্তমানে জিকা ভাইরাসের সংক্রমণের পর থেকে রাষ্ট্রগুলোকে তাদের নাগরিকদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে আগের চেয়ে আরও বেশি সচেতন হতে দেখা যাচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হলো শাহাদুজ্জামানের 'বিশ্ব স্বাস্থ্যের পরিপ্রেক্ষিত ও বাংলাদেশ' নামক প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটিতে লেখক আন্তর্জাতিক এবং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিষয়টি পর্যালোচনা করেছেন।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রাসঙ্গিক বিষয় হচ্ছে এ সময় ঘটে যাওয়া মানব ইতিহাসের অন্যতম জঘন্য গণহত্যা। এই গণহত্যায় নিহতের সংখ্যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানা বিতর্ক-আলোচনা-সমালোচনা চলে আসছে। এই আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে সাম্প্রতিক বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর মন্তব্য ও মতামত। এই বিষয়টিতে একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে নতুনভাবে ভাবার ও বিশ্লেষণের সুযোগ আছে বলে আমরা মনে করি। একটি ঐতিহাসিক সত্যকে যদিও প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হয় না, তবে এটিকে ঘিরে যে বিতর্ক, সেটিকে একটি তাত্ত্বিক ও একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা হিসেবে এই সংখ্যায় তরুণ গবেষক আরিফ রহমানের 'মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদ: মিথ না রিয়েলিটি?' শীর্ষক প্রবন্ধ ছাপা হলো। অন্যদিকে বই আলোচনা অংশে ছাপা হলো কল্যাণ চৌধুরীর *জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ* (১৯৭২) বইয়ের পর্যালোচনা প্রবন্ধ 'জেনোসাইড বাংলাদেশ: আপেক্ষিক বনাম তথাগত দৃষ্টিভঙ্গি'। বই পর্যালোচনাটি করেছেন মো. ফজলে রাব্বি।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংঘাত একটি নিয়মিত প্রবণতা। স্বাধীনতার পর থেকেই এটি রাজনীতির একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে এত দিন ধরে বিভিন্ন সময় নানা ধরনের আলোচনা হলেও, ২০১৫ সালে প্রকাশিত বদরুল আলম খানের *সংঘাতময় বাংলাদেশ: অতীত থেকে বর্তমান* শীর্ষক বইটি নিঃসন্দেহে এই ক্ষেত্রে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বইটির রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে এই সংখ্যায় বইটির একটি পর্যালোচনা ছাপা হলো। পর্যালোচনাটি করেছেন গোলাম মুস্তাফা। আশা করি, যাঁরা এখনো বইটি পড়েননি, তাঁরা পর্যালোচনাটি পড়ার পর বইটি পড়তে উৎসাহিত হবেন।

রাজনৈতিক অর্থনীতি

দরিদ্রবান্ধব স্থানীয় সরকার ও ইউনিয়ন পরিষদ নেতাদের রাজনৈতিক হিসাবনিকাশ[১]

মির্জা হাসান ও সোহেলা নাজনীন

সারসংক্ষেপ

এই প্রবন্ধের মূল দৃষ্টিপাত থাকবে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে জোগানের দিকটির ওপর, যেমন ইউপি নেতাদের প্রণোদনা। সেটা হতে পারে তাঁদের আচরণের জন্য বরাদ্দ পুরস্কার বা শাস্তি। এটি ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও দরিদ্র্যবান্ধব শাসনব্যবস্থা সৃষ্টি ও শক্তিশালীকরণে ইউনিয়ন পরিষদ নেতাদের প্রণোদনাগুলো কীভাবে রাজনৈতিকভাবে নির্ধারিত হয় তা বিশ্লেষণ করবে। এ ছাড়া এই প্রবন্ধে দেখা যাবে কীভাবে নতুন আইন (যেমন ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯) এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠানগুলো (যেমন : ওয়ার্ড সভা, উন্মুক্ত বাজেট, স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহ ইত্যাদি) ইউপি নেতাদের মধ্যে এই ধরনের প্রণোদনা তৈরিতে সাহায্য করেছে (বা করেনি)।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

ইউনিয়ন পরিষদ, নেতা, শাসনব্যবস্থা, ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯, এলিট রাজনৈতিক সমঝোতা, ত্রুটিপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা।

প্রারম্ভিক কথা

সম্প্রতি স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং স্থানীয় পর্যায়ে শাসনব্যবস্থা প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদই সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর। ১৯৭০-এর দশক থেকেই ইউনিয়ন পরিষদ চালু রয়েছে। ১ জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ৯ জন সাধারণ সদস্য (মেম্বার) এবং সংরক্ষিত আসনের ৩ জন নারী সদস্য নিয়ে মোট ১৩ জন সদস্যের সমন্বয়ে এই ব্যবস্থা গঠিত হয়। বিভিন্ন আইন ও বিধির মাধ্যমে ধীরে ধীরে ইউনিয়ন পরিষদে ক্ষমতা প্রদান করা হলেও

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দরিদ্রবান্ধব শাসনব্যবস্থার উন্নয়নে এসব আইন ও বিধির প্রভাবটি মিশ্র রয়ে গেছে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থা, বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদগুলো রাজনৈতিক এলিটবেষ্টিত থাকে। এর ফলে অতিমাত্রায় দুর্নীতি, নাগরিকদের চাহিদার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা এবং শাসনব্যবস্থায় নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তি বা অংশগ্রহণের অনুপস্থিতি জনমনে উদ্বেগের জন্ম দেয়।

২০০৯ সালে আগের সংস্কারগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইউনিয়ন পরিষদ বিধি ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদকে একটি কার্যকর ও জনস্বার্থ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করতে এই আইনে অনেক বাধ্যবাধকতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নাগরিক অংশগ্রহণের গুরুত্ব নিশ্চিত করে বলা হয় যে প্রত্যেক নির্বাচনী ওয়ার্ডে নাগরিকদের যুক্ত করতে একটি করে ওয়ার্ড সভা গঠন করা হবে। নাগরিকদের অধিকার এবং তাদের প্রতি ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব বর্ণিত একটি নাগরিক ঘোষণাপত্র রয়েছে। তবে এই আইনের প্রভাব এখনো সুষ্ঠুভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তুটি সুনির্দিষ্ট। এখানে শাসনব্যবস্থা প্রক্রিয়ার জোগানের দিকটি বা ইউপি নেতাদের প্রণোদনাগুলো[১] দেখা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও দরিদ্রবান্ধব শাসনব্যবস্থা সৃষ্টি ও শক্তিশালীকরণে ইউনিয়ন পরিষদ নেতাদের প্রণোদনাগুলো কীভাবে রাজনৈতিকভাবে নির্ধারিত হয় তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ধরনের শাসনব্যবস্থা গরিবদের 'আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান ও বৈষম্যের' ব্যাপারে সোচ্চার হতে সাহায্য করে এবং অংশগ্রহণের ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। এর ফলে অতিদরিদ্র জনগণ তাদের অধিকার দাবি করতে পারে এবং সরকারকে দায়বদ্ধ করতে পারে (হিন্টন ২০১০, পৃ. ৫)। এই প্রবন্ধের আলোচনায় দেখানো হয়েছে, কীভাবে নতুন আইন (যেমন ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯) এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠানগুলো (যেমন : ওয়ার্ড সভা, উন্মুক্ত বাজেট, স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহ ইত্যাদি) ইউপি নেতাদের মধ্যে দরিদ্রবান্ধব শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় প্রণোদনা তৈরিতে সাহায্য করেছে (বা করেনি)।

এই প্রবন্ধের প্রেক্ষাপটটি তিনটি ইউনিয়ন পরিষদের শাসনব্যবস্থা প্রক্রিয়া। যে তিনটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে তা হলো নীলফামারী জেলার বতলাগাড়ি ও খোকশাবাড়ি ইউনিয়ন এবং লালমনিরহাট জেলার সারপুকুর ইউনিয়ন।

তাত্ত্বিক কাঠামো

এই গবেষণায় রাজনৈতিক সমঝোতা (Political Settlement) ও ত্রুটিপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা (Imperfect Political Market) তত্ত্বের আলোকে

দেখানো হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ নেতাদের প্রণোদনার পেছনে রাজনৈতিক নির্ধারকগুলো কী। ডি জন ও পাটজেলের (২০০৯ পৃ. ৪) মতে, 'রাজনৈতিক সমঝোতা' মানে হলো 'বিবদমান সামাজিক গোষ্ঠী ও সামাজিক শ্রেণিগুলোর মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন বা ভারসাম্য...।' এলিট-রাজনৈতিক সমঝোতায় এলিট গ্রুপগুলো নিজেদের মধ্যে দর-কষাকষি করে এ ধরনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করে। এখানে সব পক্ষকে সন্তুষ্ট করেই সম্পদের ভাগাভাগি হয়। যেকোনো এলিট-রাজনৈতিক সমঝোতার (বা এলিট ও নন-এলিটের মধ্যে) গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সম্পদের ভাগাভাগি এমন হতে হবে যেন প্রত্যেক পক্ষই তার সামাজিক অবস্থান ও ক্ষমতা অনুযায়ী ভাগ পায়। এটা খানের (২০১০, পৃ. ৮) দেওয়া রাজনৈতিক সমঝোতার সংজ্ঞায় স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে: রাজনৈতিক সমঝোতা বলতে 'কতগুলো প্রাতিষ্ঠানিক ও বণ্টন সম্পর্কিত ছাড় বোঝায়, যেখানে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও সুবিধা উভয়েরই বণ্টন নিশ্চিত করা হয়'। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলো এ ধরনের অর্থনৈতিক সুবিধাগুলোর বণ্টনকে সমর্থন করে থাকে। আসলে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানই এ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে। রাজনৈতিক সমঝোতা বলতে একটা প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্য বোঝায়, যেখানে প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলোর সুবিধাপ্রাপ্তি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হয়।

খানকে অনুসরণ করে ক্ষমতাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, ক্ষমতাবান বলতে বোঝায় 'দ্বন্দ্ব চলাকালীন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সম্পৃক্ত হওয়া ও টিকে থাকার সক্ষমতা' (পৃ. ৪)। 'উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাজনৈতিক সমঝোতার মধ্যে নিহিত ক্ষমতার বণ্টন বহুলাংশে নির্ভর করে অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের ওপর, বিশেষ করে অর্থনৈতিক সুবিধা বরাদ্দকারী পেট্রন-ক্লায়েন্ট নীতিমালার' ওপর (প্রাগুক্ত)। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমঝোতা মানে হলো পুরোপুরি ক্লায়েন্টভিত্তিক রাজনৈতিক সমঝোতা। বাংলাদেশের মতো প্রতিযোগিতামূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্লায়েন্টভিত্তিক রাজনৈতিক সমঝোতাও প্রতিযোগিতামূলক হয়। আর এটাই প্রাসঙ্গিক এলিট বা নন-এলিট গোষ্ঠীগুলোর প্রণোদনাকে বহুলাংশে নির্ধারণ করে দেয়।

'ত্রুটিপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা (Imperfect Political Market)' পদ্ধতি রাজনীতিবিদ (জনপ্রতিনিধি) ও নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিন ধরনের ত্রুটির ওপর জোর দেয়। এগুলো হলো: নাগরিকদের প্রতি রাজনীতিবিদদের করা প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাসযোগ্যতার ঘাটতি; রাজনীতিবিদদের সক্ষমতা যাচাই করার জন্য ভোটার/নাগরিকদের প্রয়োজনীয় তথ্যের ঘাটতি এবং ভোটার/নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক বিভাজন ও বিভক্তি, যা বিভিন্ন ধরনের

আত্মপরিচয়ের রাজনীতির মাধ্যমে প্রকাশ পায় (কিফার ও খামেনি, ২০০৫)।

এ ধরনের ত্রুটি নির্বাচনী জবাবদিহির গতিশীলতাকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে। এসব গতিশীলতা সেবা বা পাবলিক গুডস (সমাজের সকলকে মুনাফা ছাড়া প্রদত্ত পণ্য বা সেবা) প্রদানে রাজনীতিবিদদের প্রণোদনা কাঠামোকে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করে, বা দরিদ্রবান্ধব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক/অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা তৈরিতে তাদের 'রাজনৈতিক ইচ্ছা' সৃষ্টি করে (নাও করতে পারে)। ত্রুটিপূর্ণ রাজনৈতিক বাজার ভোটার/নাগরিকদের সবাইকে সমানভাবে প্রভাবিত করে না। এলিট, দরিদ্র, নারী ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলো তাদের ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আদর্শিক সম্পদের পরিমাণ অনুযায়ী এই ত্রুটি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। হতে পারে তা ইতিবাচক, নেতিবাচক বা দুটোরই সংমিশ্রণ।

এসব ত্রুটির প্রভাবকে আবার বৃহত্তর কাঠামোগত উপাদান নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। এগুলো হলো দল-রাষ্ট্র বা দল-সমাজ সম্পর্কের ধরন ('দলতান্ত্রিক'[২] অথবা দলতান্ত্রিক নয়); রাজনীতির ধরন 'কর্মসূচিভিত্তিক' কি না (যেমন যেখানে রাজনীতিবিদেরা বা দল বিশেষ নীতিগত অবস্থান নেয় এবং নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় পূর্ববর্তী নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির জন্য তা পূরণের চেষ্টা করে) বা 'ক্লায়েন্টভিত্তিক' কি না (যেমন দল/রাজনীতিবিদেরা তাদের এলিট পৃষ্ঠপোষকদের নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণেই অনেকাংশে ব্যস্ত থাকে, কারণ এসব এলিট বহুসংখ্যক ক্লায়েন্ট জোগাড় করার ক্ষমতা রাখে; রাজনীতিবিদদের অবস্থান এসব এলিটের স্বার্থ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়)।

জনগণের প্রতিনিধিগণ ও নাগরিকদের মধ্যে দায়বদ্ধতার প্রকৃত ধরন বিশ্লেষণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'জবাবদিহি' হলো ক্ষমতাবানেরা নিজে থেকেই যখন তাদের কাজের জন্য দায়ী হতে বা দায়িত্ব নিতে বাধ্য থাকে। কাগজে-কলমে ইউপি নেতারা মূলত 'নির্বাচনী জবাবদিহি'র মাধ্যমে নাগরিকদের কাছে দায়ী থাকে, যা 'উল্লম্ব জবাবদিহি' (Vertical acountability) হিসেবে পরিচিত। এই ধরনের জবাবদিহি সময়মতো নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নাগরিকদের দাবি-দাওয়া প্রকাশ করার মাধ্যমে বজায় রাখা হয়। নির্বাচনী জবাবদিহির মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের কেবল নির্দিষ্ট সময় পরপর সঠিক পথে পরিচালিত করার সুযোগ প্রদান করে (বাংলাদেশের ইউপির ক্ষেত্রে প্রত্যেক পাঁচ বছরে একবার)। কিন্তু দুটি নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়বদ্ধ করতে পারে না। সামাজিক জবাবদিহি নির্বাচনী জবাবদিহির সীমাবদ্ধতাকে দূর করতে পারে। নাগরিকেরা বা সিভিল সোসাইটি সংগঠন যখন সরাসরি নির্বাচিত নেতাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করে, সেটাকে সামাজিক জবাবদিহি বলে। এর ফলে

নাগরিকেরা জবাবদিহি, নেতাদের কর্মদক্ষতা পর্যবেক্ষণ এবং নীতি সিদ্ধান্ত ও উন্নয়ন বাজেটের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দর-কষাকষি এবং সেবা প্রদান প্রণালিগুলো নিয়মিত দাবি করতে পারে।

কার্যকরী নির্বাচনী জবাবদিহি প্রক্রিয়া

ভবিষ্যৎ নির্বাচনে জিততে শক্তিশালী প্রণোদনা : কীভাবে তা নির্বাচনী জবাবদিহিকে প্রভাবিত করে?

বেশির ভাগ ইউপি নেতার জন্য নির্বাচনে জয়লাভ করাটা একবারের বিষয় নয়। এই মর্যাদা ধরে রাখতে এবং পরবর্তী নির্বাচনগুলোয় জয়লাভ করতে তাঁরা বেশ ভালোই উৎসাহী। এই প্রণোদনা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁদের আচরণ ও কাজকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। এর মানে হলো বিভিন্ন ধরনের প্রভাবশালী মধ্যবর্তী বা মূল সমর্থক গোষ্ঠী, ভোট ব্যাংক এবং 'অবশিষ্ট' সাধারণ ভোটারদের দাবি মেনে নেওয়ার রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা তাদের জন্য অগ্রাধিকারমূলক কাজ হয়ে ওঠে (দাবিগুলো প্রায়ই সাংঘর্ষিক ও চূড়ান্তভাবে জয়, না হয় পরাজয়ের মতো)। এটা আরও বেশি জটিল হয় যখন দাবিগুলো শ্রেণি ভেদাভেদ, ধর্মীয় পরিচয়, আঞ্চলিকতা (দেশি), আত্মীয় ও গোষ্ঠী এবং স্থানীয় বিবেচনার বিষয় দ্বারা প্রভাবিত।

একজন চিরাচরিত ইউপি চেয়ারম্যানের জন্য ভোটারদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সামষ্টিক চাহিদা পূরণে ভারসাম্য রক্ষার কাজটি করতে বিভিন্ন কৌশলগত বিষয় বিবেচনা করতে হয়। এই কাজের মধ্যে অনেক সংবেদনশীল বিষয়ও রয়েছে। যেমন খুব বিপদে থাকা (যৌতুক বা অসুস্থতা) কোনো ব্যক্তির চাহিদা মেটানো (প্রয়োজনে দান করা) বা নির্বাচনে জেতার স্বার্থে সমাজে প্রভাবশালী এলিটদের সঙ্গে ভালো আন্তসম্পর্ক রক্ষা করা (ব্যক্তিগত সামাজিক মূলধন রক্ষা ও বৃদ্ধি করা)। এ ক্ষেত্রে নির্দয়ভাবে গরিব ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থকেও তারা এড়িয়ে যায় (যেমন মধ্যস্থতার সময় অতিমাত্রায় পক্ষপাতিত্ব গ্রহণ করা বা গরিবদের বঞ্চিত করে সচ্ছল আত্মীয়স্বজনকে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর সুবিধা দেওয়া)। এটা বলা প্রয়োজন, কোন মধ্যস্থতায় পক্ষপাতিত্ব করাটা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। বেশির ভাগ ইউপি নেতাই পক্ষপাতিত্ব করলেও তাঁরা চান না ধরা পড়ুক। কারণ সমাজে তাঁরা 'ন্যায্য ও সুষ্ঠু' হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করতে চান যখন আনুষ্ঠানিক [গ্রাম্য আদালত, সালিসি পরিষদ (Arbitration Council)[৩]] ও অনানুষ্ঠানিক (সালিস[৪]) ন্যায়বিচার-সম্পর্কিত কাজ করে। ইউপি নেতাদের জন্য নির্বাচনে জিততে হলে পছন্দনীয় ক্লায়েন্ট গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সুবিধা বণ্টন

করে দিতে হবে এবং নিজেকে সমতা ও সুষ্ঠুতার প্রতীক বলে দাবি করলে পক্ষপাতহীন কাজ করতে হবে। এই দুটোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা তার জন্য জরুরি এবং নিয়ত চ্যালেঞ্জও বটে। কিন্তু ইউপি নেতাদের জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ও নির্বাচনী সফলতা এই ভারসাম্য বজায় রাখার ওপর নির্ভর করে।

নির্বাচনে জয়—দলীয় সংশ্লিষ্টতা কি প্রভাব রাখে?

নির্বাচনে জেতার জন্য দলীয় সংশ্লিষ্টতা খুব কমই ভূমিকা রাখে (ইউপি নেতাসহ উত্তরদাতাদের মূল্যায়ন দেখে বোঝা যায় এটা মোটামুটি ১০ থেকে ১৫ শতাংশ ভূমিকা রাখে)। এ ছাড়া এটুকু শুধু ইউপি চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যা অন্য ইউপি সদস্যদের বেলায় আবার খাটে না। সংসদীয় নির্বাচনের সঙ্গে এর বেশ পার্থক্য রয়েছে। কারণ সংসদীয় নির্বাচনে দলীয় সংশ্লিষ্টতাই জয়ের জন্য মুখ্য ভূমিকা রাখে। উপজেলা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও দলীয় পরিচয় কিছুটা ভূমিকা রাখে। এমনকি একজন ইউপি নেতার জন্যও স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান বা এমপির সঙ্গে দৃশ্যমান সম্পর্ক থাকলে তার রাজনৈতিক বা নেটওয়ার্ক মূলধন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রমাণাদি দেখে মনে হয় নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনা বেড়ে যায় যদি কোনো ইউপি নেতার উপজেলা চেয়ারম্যান বা এমপির সঙ্গে রাজনৈতিক মিল থাকে, কারণ ভোটাররা দেখতে চান নেতার রাজনৈতিক নেটওয়ার্ক কেমন।

ইউপি নেতার কর্মসাধন (Performance) সম্পর্কে ভোটারদের ধারণা

গবেষণা এলাকার একজন ইউপি নেতা বলেন যে ইউনিয়ন পরিষদের শাসনপ্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে চলছে কি চলছে না, সেটা নিয়ে মানুষের তেমন আগ্রহ নেই। শুধু যখন কোনো উন্নয়ন প্রকল্প আসে বা সেবা প্রদান-সম্পর্কিত কর্মসূচি আসে, তখন তারা ইউপির শাসনব্যবস্থা প্রক্রিয়া নিয়ে আগ্রহী হয়ে পড়ে। জনগণের সঙ্গে ইউপির সম্পর্ক শুধু দৃশ্যমান সেসব কর্মসূচির সঙ্গে, যেগুলোকে মানুষ তাদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বলে মনে করে। এলিটদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো, সিদ্ধান্ত প্রণয়ন-প্রক্রিয়ায় তাদের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে নিজের লোকদের সুবিধা প্রদান করতে পারা। অন্যদিকে গরিবদের মূল ভাবনা হলো, সুবিধা দেওয়ার তালিকায় তাদের নাম উঠল কি না সেটা। আবার এলিটরা যখন ইউপি নেতাদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করতে চায়, তখন বুঝতে হবে তারা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়াটা নিশ্চিত করতে চায়। গরিবদের জন্য অগ্রাধিকারমূলক বিষয় হলো বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প বণ্টন-প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠুতা ও সমতার

বিষয়গুলো কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে কি না।

বর্তমানে ইউপি নেতাদের কর্মদক্ষতা-সম্পর্কিত জ্ঞান আগের তুলনায় ভোটারদের মধ্যে বেশি। এর কারণ হলো বিভিন্ন ইউপি-সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন (২০০৯ আইন, স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোতে নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করার বিধান); উন্নয়ন কর্মসূচিতে সামাজিক দায়বদ্ধতা পদ্ধতি চালু করা (যেমন এলজিএসপির জন্য গণসমাবেশ); তথ্যপ্রযুক্তির সূচনা ও ইউপির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন (ওয়ার্ড সভা, স্ট্যান্ডিং কমিটি, উন্মুক্ত বাজেট আলোচনা ইত্যাদি) এবং এনজিও কর্তৃক নাগরিক/সুবিধা গ্রহণকারীদের সংঘবদ্ধ করা। ইউপির উন্নয়ন বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো এখন সামাজিক ও রাজনৈতিক এলিট, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত (স্কুলশিক্ষক, সামাজিক কর্মী) ও এনজিও কর্তৃক নির্ধারিত দরিদ্রতর শ্রেণি থেকে 'স্বভাব নেতাদের' নিয়োজিত করা। এই ব্যক্তিগুলো সাধারণ মানুষের জন্য মূল মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এরা সাধারণ মানুষকে ইউপি নেতাদের কর্মদক্ষতা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে, বিশেষ করে সম্পদ বণ্টন-সম্পর্কিত তথ্য। মধ্যবিত্ত সামাজিক নেতারা সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তিদের তালিকা প্রণয়নে দুয়ারে দুয়ারে যায়। তাই তারা এসব তালিকা প্রণয়নে স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু তথ্যের নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। আরেকটি তথ্যের মাধ্যম হলো ইউপি কার্যক্রমে এনজিও কর্মসূচি। বিশেষ করে নারীরা ইউপি কার্যাবলি সম্পর্কে জানতে পারে এনজিওগুলোর মাধ্যমে। এনজিও কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফোরাম ধীরে ধীরে নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতা তৈরির আশ্রয় হয়ে উঠছে। ইউপি কার্যাবলি ও সভ্যদের কর্মদক্ষতা সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে অন্যান্য অপ্রাতিষ্ঠানিক পন্থাও রয়েছে। এগুলো হলো জনশ্রুতি এবং উন্নয়ন বরাদ্দে যারা ইউপি কার্যাবলির সঙ্গে অনেক বেশি জড়িত হতে চায় তাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য।

ভোটার/নাগরিকদের ভাবনা/দাবি : ভোটাররা কোন বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দেয়?

নেতাদের প্রতি ভোটারদের প্রত্যাশার একটি স্পষ্ট শ্রেণিভিত্তিক কাঠামো আছে। এই কাঠামোটি সেবা প্রদান ও পাবলিক গুডস দেওয়ার ক্ষেত্রে ইউপি নেতাদের প্রণোদনা কাঠামোকে বুঝতে সাহায্য করে। অতিদরিদ্ররা বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী সম্পর্কিত সেবা (যেমন : ভিজিডি, ভিজিএফ, বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, কাজের বিনিময়ে টাকা, ৪০ দিনের কর্মসংস্থান কর্মসূচি ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন ধরনের ত্রাণ কর্মসূচি নিয়ে ভাবে। মজার বিষয় হলো কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও ৪০ দিনের কর্মসংস্থান কর্মসূচির বাড়তি প্রভাব রয়েছে। এসব কর্মসূচির ফলাফল হলো নতুন নির্মিত বা সংস্কারকৃত অবকাঠামো, সড়ক, কালভার্ট ইত্যাদি। এসব অবকাঠামোর ব্যাপারে মধ্যবিত্ত এবং গ্রামের ধনী যারা মূলত ব্যবসায় জড়িত,

তাদের মধ্যে বেশ আগ্রহ রয়েছে। তাই অবকাঠামোগত উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচিগুলোও পাবলিক গুডস এবং এদের চাহিদা অর্থনৈতিক শ্রেণিগুলোর মধ্যে প্রভাব ফেলে।

টেবিল ১ : বিভিন্ন শ্রেণির ভোটারদের চাহিদার ধরন

শ্রেণি/গোষ্ঠী	চাহিদার ধরন	সম্পৃক্ততা ও বাড়তি প্রভাবের ধরন
গ্রামীণ ধনিক ও এলিট ভোটার	পাবলিক গুডস : সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, সেচব্যবস্থা; স্কুল/মসজিদ নির্মাণ স্থান নির্ধারণ; আইনশৃঙ্খলা রক্ষা	উচ্চমাত্রা : এই বিষয়গুলোতে পরামর্শ প্রত্যাশা করে
মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভোটার	সারে ভর্তুকি, কৃষিপণ্যের জোগান, গভীর নলকূপ স্থাপন; আইনশৃঙ্খলা রক্ষা	উচ্চমাত্রা
গরিব ভোটার	সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী; চাকরি কর্মসূচি	উচ্চমাত্রা : চাকরি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে আগ্রহী

তথ্যসূত্র : লেখকদ্বয়

গ্রামীণ সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভোটারদের জন্য মূল চিন্তার বিষয় হলো সার ও অন্যান্য কৃষিপণ্যসংক্রান্ত ভর্তুকি। তারা আশা করে ইউপি নেতারা এসব জিনিস ও নলকূপের জোগান সহজতর করবেন। ধনিক শ্রেণি স্থানীয় পাবলিক গুডসের বৃহৎ জোগান আশা করে (এলাকায় সড়ক ও কালভার্ট এবং সেচব্যবস্থা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ)। তারা এটাও ভাবে যে ইউপি নেতা স্কুল/মাদ্রাসা এবং মসজিদ/মন্দির, নলকূপ ইত্যাদি নির্মাণের স্থান নির্ধারণের সময় তাদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। এ ছাড়া তারা চায় ইউপি নেতারা তাদের সঙ্গে সামাজিক পরামর্শ করবেন, যেন তাদের ক্লায়েন্ট/অনুসারী, আত্মীয়স্বজনেরা পাবলিক গুডস এবং সেবার 'যথাযথ' অংশ পেতে পারে। মধ্যবিত্ত ও ধনিক শ্রেণি উভয়েরই আইনশৃঙ্খলার ব্যাপারে যথেষ্ট ভাবনা রয়েছে। এই শ্রেণিগুলোর অগ্রাধিকার দাবি হলো সামাজের প্রয়োজনীয় সম্পত্তির সুরক্ষা। ইউপি নেতাদের মধ্যেও ছোটখাটো চুরি ও অর্থনৈতিক অপরাধ কমানোর তাগিদ রয়েছে, যেন তারা এলিটদের মধ্যে

নিজেদের বৈধতা রক্ষা করতে পারে।

অসম রাজনৈতিক ও সামাজিক সামর্থ্যসম্পন্ন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ভিন্ন ভিন্ন দাবি-দাওয়ার ফলে ইউপি নেতাদের জন্য একটি জটিল প্রণোদনা কাঠামো তৈরি হয়, যা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউপি নেতৃত্বের ভূমিকাকে জটিল করে ফেলে। নিচের আলোচনায় দেখা যাবে, ভূমিকা রাখার ধরন ও পরিমাণ অনেকাংশে নির্ভর করে কাঠামোগত বিষয়গুলোর ওপর। এই কাঠামোগত বিষয়গুলো হলো স্থানীয় ও বৃহত্তর এলিট রাজনৈতিক সমঝোতার ধরন যেখানে ইউপি নেতারা সম্পৃক্ত এবং এজেন্সির উপাদানগুলো, যেমন সংশ্লিষ্ট নেতৃত্বের রাজনৈতিক দক্ষতা, যা দিয়ে রাজনৈতিক-কাঠামোগত উপাদানের মারপ্যাঁচের মাধ্যমে প্রভাবিত করা যায়।

কে জিতে নির্বাচনে?

যেসব ইউপি নেতার মধ্যে নিম্নোক্ত কিছু ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকে তাদের জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এগুলো হলো ব্যক্তিগত নেতার বেশি পরিমাণ সামাজিক মূলধন[৫](সামাজিক পরিচিতি সম্পর্ক ইত্যাদি), দ্বন্দ্ব মেটানোর ক্ষেত্রে সক্রিয় ও দক্ষ এবং কমিউনিটি সদস্যদের ব্যক্তিগত কল্যাণমূলক চাহিদা পূরণে বেশি সংবেদনশীল ও সক্ষম। নেতাদের বংশগত মর্যাদাও (পারিবারিক ঐতিহ্য, আত্মীয়তা) গুরুত্বপূর্ণ। যদি সম্ভাব্য নির্বাচনী প্রার্থী রাজনৈতিক জীবনে সফল হতে চায়, তাহলে ওপরে বর্ণিত সবগুলো গুণ প্রাথমিকভাবে থাকতে হবে। এই শর্তগুলো প্রয়োজনীয়, তবে যথেষ্ট নয়।

আরও যেসব শর্ত পূরণ করতে হবে, তা অনেক বেশি রাজনৈতিক-কৌশলগত ধরনের। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো নেটওয়ার্ক মূলধন। নেটওয়ার্ক মূলধন এলিট অংশের কিছু উপাদানের সঙ্গে এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সঙ্গে ভালো নেটওয়ার্ক রক্ষা করার মাধ্যমে নিশ্চিত হয় এবং এই শ্রেণিগুলো ইউপি নেতা ও কমিউনিটির মধ্যে যোগাযোগকারী হিসেবে কাজ করে। যেকোনো প্রার্থীর জন্য নির্বাচনী প্রক্রিয়ার এসব গোষ্ঠী 'মূল সমর্থক গোষ্ঠী' হিসেবে বিবেচিত এবং তাদের ক্লায়েন্ট গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রবেশ করাটা নির্বাচনে জেতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের ব্যক্তিদের 'মূল সমর্থক গোষ্ঠী' ধরা হয়, কারণ তারা রাজনৈতিক বিনিয়োগকারী (ভোট ব্যাংকগুলো নিশ্চিত করে) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও ক্লায়েন্ট গ্রুপগুলোর পৃষ্ঠপোষক, যে গ্রুপগুলো আঞ্চলিকতা, ধর্মীয় পরিচয়, আত্মীয়তা ও স্থানিকতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। এসব সামাজিক বিভক্তি সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা নির্বাচনে জয়ী হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। খোকশাবাড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচনী কৌশল সম্পর্কে বলেন, এখানে নির্বাচনে জিততে হলে স্থানীয়

সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনায় নিতে হবে, যারা স্থানীয় এলাকার নয় তাদের মানুষ ভোট দিতে চায় না।

অন্য বিষয়গুলো যা ভূমিকা রাখে তা হলো ধর্মীয় পরিচয় (আমাদের গবেষণায় হিন্দু ও মুসলিম) এবং অভিবাসীরা যে এলাকা থেকে এসেছে সে অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিচয় (এ ক্ষেত্রে টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, কোচবিহার [ভারত] ইত্যাদি)। নির্বাচনী হিসাবনিকাশে জটিলতাটি ইউপি নির্বাচনের একজন নারী প্রার্থীর ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। খোকশাবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদে একজন নারী প্রার্থী তাঁর আঞ্চলিক/স্থানীয় এলাকা থেকে সমর্থন পেয়েছিলেন, এমনকি বিরোধী রাজনৈতিক দল থেকেও। আত্মীয়তা ও আঞ্চলিক বিষয়গুলো সরাসরি দলীয় বিবেচনাকে স্পষ্টতই ছাপিয়ে গিয়েছিল। প্রকৃত নির্বাচনী হিসাবনিকাশে জেন্ডারবিষয়ক গুরুত্বও রয়েছে। নারী প্রার্থীর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো চায় তাদের 'লোকেরা' সংরক্ষিত আসনগুলো ধরে রাখুক; তাই তারা নির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী পরিবার থেকে আসা নারীদের সমর্থন দেয়, যাদের নির্বাচনে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এলিট পরিবারগুলো তাদের নারীদের নির্বাচনে আসতে দেয় সম্মান এবং ইউপিতে আরও বেশি প্রবেশাধিকার পাওয়ার জন্য। স্বামীরা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। তাই তাদেরও নারী প্রার্থিতা সমর্থন করার জোরালো কারণ রয়েছে, যা তাদের ব্যক্তিগত প্রভাব ও সম্পদের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। প্রশ্ন হলো, কীভাবে এলিট পৃষ্ঠপোষকেরা, যারা 'মূল নির্বাচনী ক্ষেত্র' হিসেবে কাজ করে, তাদের স্ব স্ব ক্লায়েন্ট গ্রুপগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে? ক্লায়েন্টদের আনুগত্য (ভোট দেওয়ার পছন্দ হিসেবে) অর্থনৈতিক নির্ভরতার মাধ্যমে বজায় রাখা হয়। গরিবেরা পৃষ্ঠপোষকদের ভূমিতে বসবাস করে, তাদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে সারা বছর কাজ করে (বাণিজ্যিক ফার্ম, শিল্প-কারখানা), চাষাবাদের জন্য জমি লিজ নেয়, চরম দুঃসময়ে ঋণ অথবা দান করা অর্থ পায় (বিয়ে, যৌতুক, অসুস্থতা ইত্যাদি) এবং সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী, দ্বন্দ্ব মীমাংসা ইত্যাদিতে পৃষ্ঠপোষকদের রাজনৈতিক প্রভাবের ওপর নির্ভর করে। আমাদের মূল তথ্যদাতারা পর্যবেক্ষণ করেছেন যে ভোটারদের একটি বড় অংশ (বতলাগাড়ি ইউনিয়নের আনুমানিক ৩০ শতাংশ) এসব অর্থনৈতিক নির্ভরতা ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে বিভিন্ন পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি অনুগত থাকে। কিন্তু এই অবস্থা এখন কমে যাচ্ছে, কারণ চাকরির খোঁজে গ্রামবাসী অন্যান্য অঞ্চলে চলে যাচ্ছে। নির্বাচনে বিজয়ী হতে কর্মসক্ষমতা (সেবা প্রদানের সামগ্রিক মান, প্রকল্প বাস্তবায়নের হার ও মান ইত্যাদি) কম গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভোটাররা এসব বিষয়ে খুব কমই মনোযোগ দেন। একজন ইউপি সচিব বলেন :

> সাধারণত পূর্ববর্তী ইউপি নেতা ও বর্তমান নেতাদের কর্মসাধনের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। যেমন আগের এবং বর্তমানের উভয় নেতারাই রিলিফের চাল চুরি করে, বিনা মূল্যে সেবা দেওয়ার পরিবর্তে টাকা দাবি করে এবং দুর্নীতিতে যুক্ত হয় ও উন্নয়নের অর্থ অপব্যবহার করে। নির্বাচিত নেতারা তাদের সাধারণ কর্মসক্ষমতা বা ব্যক্তিগত সততা দিয়ে মূল্যায়িত হন না।

ইউপি চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে ভোটারদের প্রণোদনার এই ব্যাখ্যা অনেকাংশেই সত্য। কিন্তু ইউপি সদস্যরা অনেকাংশেই তাদের ব্যক্তিগত সততা এবং সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী বরাদ্দে কর্মসক্ষমতার ভিত্তিতে মূল্যায়িত হয়। আমাদের গবেষণার ইউপিগুলোয় ধারাবাহিক নির্বাচনে ইউপি চেয়ারম্যানের তুলনায় সদস্যদের অর্জন অনেক বেশি। ইউপি সদস্যদের কর্মসক্ষমতা ও ব্যক্তিগত সততা অবলোকন করা সহজ, কারণ তারা কমিউনিটির কাছাকাছি থাকে। এ ছাড়া সেবার ধরন (যেমন নিরাপত্তাবেষ্টনী বণ্টন সদস্যদের নিয়মিত গরিবদের কাছে নিয়ে যায়) এবং সশরীরে যোগাযোগ (বিভিন্ন দৈনন্দিন কাজে) করার মাত্রাও ভূমিকা রাখে, যা সাধারণ মানুষ প্রত্যাশা করে। এসব পর্যবেক্ষণ ইউপি চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে তত প্রযোজ্য নয়। এর ফলে ভোটার হিসেবে সাধারণ নাগরিকদের ইউপি চেয়ারম্যানের কর্মসক্ষমতা ও ব্যক্তিগত সততা সম্পর্কে তুলনামূলক তথ্য ঘাটতি রয়েছে। এর মানে এই নয়, গরিব নাগরিকেরা চেয়ারম্যানের সক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত সততার ব্যাপারে কম সচেতন (যেমনটি উপরে ইউপি সচিবের উদ্ধৃতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে), বরং চেয়ারম্যান সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করার মতো জ্ঞান তাদের নেই। এটা চেয়ারম্যানকে সম্ভবত এলিট ভোট ব্যাংকে (টাকার রাজনীতি, এলিট আত্মীয়তা নেটওয়ার্ক ইত্যাদি) এবং স্বল্প আকারে প্রভাবহীন নাগরিকদের ওপর মনোযোগ দিতে এবং রাজনৈতিকভাবে অধিক বিনিয়োগ করতে প্রণোদনা জোগায়। ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে নির্বাচনী জবাবদিহি দরিদ্রদের চেয়ে অন্য গোষ্ঠীর প্রতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়।

এর মানে হলো যেটি নির্বাচনে জিততে ভূমিকা রাখে তা হলো কীভাবে প্রার্থী তার রাজনৈতিক সম্পর্ক (মূলত পৃষ্ঠপোষকতা-সংক্রান্ত সুবিধা বরাদ্দ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে) 'মূল নির্বাচনী ক্ষেত্রে'র সঙ্গে সম্পাদন করে এবং 'মূল সমর্থক গোষ্ঠীর' সদস্যরা কৌশলগত হিসাবনিকাশের পর বর্তমান প্রার্থীদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সমর্থন দেয়। বর্তমান প্রার্থী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী উভয়কেই আগে থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় ও মূল সমর্থক গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে এসব উদ্যোগ থামাতে হয়। সম্পর্ক গড়ে ওঠে পৃষ্ঠপোষকতার সুবিধা ভাগাভাগি এবং আক্ষরিক অর্থেই এসব ব্যক্তির আনুগত্য ক্রয়ের ভিত্তিতে।

খোকশাবাড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বলেন: 'যারা চেয়ারম্যানের জন্য প্রচারণা চালিয়েছিল তারা তাদের এলাকার অনুসারীদেরও বস্তুগত সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। নির্বাচিত চেয়ারম্যানকে অবশ্যই সেসব ব্যক্তির অনুসারীদের প্রতি যেসব প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল সে ব্যাপারে নজর দিতে হবে, অন্যথায় তার বৈধতা থাকবে না।' আনুগত্য ক্রয়ের শেষের কৌশলটি স্থানীয় নির্বাচনে ক্রমবর্ধমান অর্থের রাজনীতি চালু করেছে। টাকা দিয়ে ভোট ব্যাংক (মূল সমর্থক গোষ্ঠী) ও সাধারণ ভোটারদেরও কেনার ঘটনা বাড়ছেই। ৩০ লাখের উপরে (বেশির ভাগ উপাত্ত নিজ উদ্যোগে করা) পরিমাণ টাকাও সাম্প্রতিক নির্বাচনে ব্যয় হয়েছে। এটা বলতে হবে যে টাকার রাজনীতিটা অনেকগুলো কৌশলের মধ্যে একটি, যা নির্বাচনে জিততে হলে ব্যবহার করতে হয়। আবার কিছু কিছু প্রার্থী সাম্প্রতিক নির্বাচনে অনেক টাকা ব্যয় করেও জিততে পারেননি।

পেট্রন-ক্লায়েন্টভিত্তিক দায়বদ্ধতা প্রক্রিয়া

ইউপি নেতাদের জবাবদিহি আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রক্রিয়া বা সরাসরি জবাবদিহির মাধ্যমে নিশ্চিত হয়। আনুষ্ঠানিক জবাবদিহির প্রক্রিয়াও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যা সর্বব্যাপী বিরাজমান পেট্রন-ক্লায়েন্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। এটা আবার শ্রেণি, গোষ্ঠী ও আত্মীয়, ধর্মীয় গ্রুপ, আঞ্চলিকতা এবং স্থানীয়তাভিত্তিক পরিচয়ের মতো বিভিন্ন সামাজিক বিভক্তির কারণে টিকে থাকে। খুব বৃহৎভাবে বলতে গেলে, ক্লায়েন্টভিত্তিক জবাবদিহি পদ্ধতি 'সামাজিক বাধ্যবাধকতা ও রাজনৈতিক হিসাব'—দুটোর ওপর ভিত্তি করে চলে, যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে একটি আরেকটিকে ছাপিয়ে যায়।

'সামাজিক বাধ্যবাধকতা' ভিত্তিক পৃষ্ঠপোষকতা বরাদ্দ-প্রক্রিয়া 'পূর্ব রাজনৈতিক' এবং প্রাচীন প্রথা, মূল্যবোধ এবং প্রত্যাশার দ্বারাও অনেকাংশে পরিচালিত হয়। এগুলোও আবার গোষ্ঠী ও আত্মীয়, আঞ্চলিক ও ধর্মীয় পরিচয় এবং স্থানীয় যুক্তি যেমন পাড়া ও প্রতিবেশীভিত্তিক পরিচয়ের সমাজতত্ত্ব দ্বারা গঠিত। যেসব নেতা এক বা একাধিক এসব সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে তারা বংশগত পরিচয়ের ভিত্তিতে যতটা নির্বাচনী রাজনৈতিক ও নৈতিক সমর্থন পায়, কৌশলগত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিবেচনায় ততটা পায় না এবং গোষ্ঠী প্রতিনিধিত্বকারীদের সমর্থন কম-বেশি নিশ্চিত (ভোট ব্যাংক অনুযায়ী)। এটা বতলাগাড়ি চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে আংশিক এবং খোকশাবাড়ি ইউনিয়নের নারী প্রার্থীর জন্য সম্পূর্ণ প্রযোজ্য।

অনেকটা আদর্শিকভাবে প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃত্ব প্রকৃত সামাজিকভাবে নির্ধারিত সম্মতিতে ভোটব্যাংকগুলোকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ

বরাদ্দের মাধ্যমে সহযোগিতা করতে বাধ্য। তাই নেতারা বংশভিত্তিক নির্বাচনী এলাকার কাছে দায়বদ্ধ থাকে এবং ভোটের বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি নেতাদের অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামাজিক সমর্থন দেয় (যা বিচারব্যবস্থা-সম্পর্কিত সেবা প্রদানে খুবই দরকার)। নির্ধারিত সুবিধাভোগীরা হলো সাধারণ গরিব এবং এগুলো সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী-সম্পর্কিত সুবিধা (ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্ক ও বিধবা ভাতা, ৪০ দিন কর্মসংস্থান ইত্যাদি)। তাই যোগ্য গরিবদের একটি অংশ বংশভিত্তিক জবাবদিহি নেটওয়ার্কে থেকে কিছু সুবিধা নিশ্চিত করতে সক্ষম। মনে রাখতে হবে যে সামাজিক বাধ্যবাধকতাভিত্তিক জবাবদিহিকে প্রায়ই গোষ্ঠী ও আত্মীয়দের আদর্শভিত্তিক দেখাশোনা করার প্রতিশ্রুতি দ্বারা বৈধতা দেওয়া হয়, যারা একই সঙ্গে 'যোগ্য গরিবও'। ইউপি নেতাদের চালাকিটা হলো, বন্ধু বা পরিবারের সদস্য, যারা ধনিক শ্রেণি, তাদের প্রকাশ্যে সুবিধা প্রদান এড়িয়ে যাওয়া। একজন ইউপি চেয়ারম্যান বলেন, গরিব পারিবারিক সদস্য বা বন্ধুদের সাহায্য করাটা কোনো অন্যায় না...প্রত্যেকেরই আত্মীয়স্বজন আছে...যদি তাদের স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ইউপি সম্পদ দেওয়া হয়, কেউ সমালোচনা করবে না...প্রশ্ন আসবে তখনই, যখন কোনো সচ্ছল আত্মীয় সুবিধা পায়।

'রাজনৈতিক হিসাবভিত্তিক' জবাবদিহি প্রাথমিকভাবে এলিট ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সঙ্গে জড়িত, যাদের কাছে ইউপি নেতৃত্ব রাজনৈতিকভাবে দায়বদ্ধ। কারণ এ গোষ্ঠীগুলো নির্বাচনের সময় নেতাদের সমর্থন দিয়েছিল।

এখানে পৃষ্ঠপোষক সুবিধা বণ্টন (স্থানীয় পাবলিক গুডস, সেবা, নিরাপত্তাবেষ্টনী) কৌশলগত রাজনৈতিক সুবিধা বিনিময়ের ভিত্তিতে হয়, যা বংশগত বিবেচনাবহির্ভূত। এ ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা সুবিধা বরাদ্দ মূলত পাবলিক গুডসে দেওয়া হয় (অবকাঠামো, স্কুল, মসজিদ/মন্দির ইত্যাদি) যেখানে এলিট রাজনৈতিক বিনিয়োগকারীরা অনানুষ্ঠানিক সমঝোতার অংশ হিসেবে উন্নয়ন প্রকল্পের স্থান বাছাইয়ের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। রাজনৈতিক হিসাবভিত্তিক পৃষ্ঠপোষকতা সুবিধা বরাদ্দ গরিবদেরও উপকারে আসে, যারা এলিটদের পৃষ্ঠপোষকতা সুবিধা গ্রহণকারী ক্লায়েন্ট। গরিবদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী বরাদ্দের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হিসাবভিত্তিক এলিট-নিয়ন্ত্রিত পৃষ্ঠপোষকতা নেটওয়ার্ক অনুসরণ করে এবং যেসব গরিব কোনো এলিট নেটওয়ার্কের অংশ নয়, তারা বাদ পড়ে।[৬] তাই দেখা যায়, এই জবাবদিহি পদ্ধতি গরিবদের একটি অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে যারা অন্যথায় কোনো পৃষ্ঠপোষকতা নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার অংশ নয়। কারণ তারা জবাবদিহির বংশগত পরিচয়ভিত্তিক নেটওয়ার্কের অংশ নয়।

স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক সমঝোতার গতিপ্রকৃতি

ইউপি পর্যায়ে এলিট রাজনৈতিক সমঝোতা সাধারণত স্থানীয় এলিটদের প্রণোদনা ও স্বার্থের মতৈক্যের মাধ্যমে হয়। অধ্যায় ২-এ যেমনটি বলা হয়েছিল যে কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী হতে হলে যেকোনো এলিট রাজনৈতিক সমঝোতাকে এমন হতে হবে যেখানে অবশ্যই ব্যক্তি বা সামষ্টিক এলিটদের ক্ষমতা ধরে রাখার ভারসাম্য প্রতিফলিত হয় এবং প্রণোদনাটি এমন হতে হবে যা সংশ্লিষ্ট অ্যাক্টরদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্থানীয় এলিটদের সমষ্টি বিভিন্ন ইউনিয়ন অনুযায়ী ভিন্ন হয়, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে তারা সবাই রাজনীতিবিদ, অনেক জমির মালিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, সাবেক সরকারি কর্মকর্তা ইত্যাদি। এসব ব্যক্তির সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে: তারা উচ্চ মর্যাদাশীল পরিবারের সদস্য: যেমন তাদের সামাজিক বংশ মর্যাদাভিত্তিক খ্যাতি রয়েছে, তাদের উল্লেখযোগ্য সম্পদ রয়েছে এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে সংঘাত মেটাতে তাঁদের প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রভাব রয়েছে।

অনেক এলিট ব্যক্তি ওপরের তালিকার দুই বা ততোধিক ভূমিকা পালন করেন। এসব ব্যক্তিই ওপরে বর্ণিত ইউপি নেতাদের জন্য 'মূল নির্বাচনী ক্ষেত্র' বলে বিবেচিত হয়। এলিট রাজনৈতিক সমঝোতায় রাজনৈতিক এলিটদের বেশি দর-কষাকষি দক্ষতা থাকে এবং ইউপি নেতাদের জন্য একটি চিরন্তন চ্যালেঞ্জ হলো স্থানীয় ও জাতীয় উভয় এলিটদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের কার্যত স্বাধীনতা বজায় রাখা। একটি ইউনিয়নে স্থানীয় এলিটদের মধ্যে (এলিট ভারসাম্য) স্থিতিশীল ও কার্যকর শাসনব্যবস্থার জন্য ন্যূনতম শর্ত হলো একটি প্রকৃত রাজনৈতিক ও সামাজিক মতৈক্য। ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ইউপির নাগরিকদের জন্য বিশেষ করে গরিবদের কল্যাণের ক্ষেত্রে এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। যেমন দ্বন্দ্ব নিরসনে কোনো আনুষ্ঠানিক (গ্রাম্য আদালত, সালিসি পরিষদ) বা অনানুষ্ঠানিক ফোরামে (সালিস) যেকোনো রায় প্রতিদ্বন্দ্বী এলিটদের মধ্যে একটি প্রকৃত সামাজিক ও রাজনৈতিক মতৈক্যের মাধ্যমে হতে হবে। অন্যথায় এসব রায় বাস্তবায়নযোগ্য হবে না বা 'সুষ্ঠু ও ন্যায্য' বলে বিবেচিত হবে না। এটা সম্ভাব্য বড় আকারের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য, যেটির আন্তসম্প্রদায় দিক রয়েছে এবং যা সাম্প্রদায়িক স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে। আইনশৃঙ্খলার কার্যকর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যে সমন্বয় জরুরি। তাই একটি স্থিতিশীল এলিট-রাজনৈতিক সমঝোতা স্থানীয় কমিউনিটির স্থায়ী শান্তি ও সম্প্রীতি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বলে বিবেচিত হয়।

স্থানীয় পর্যায়ে এলিট-রাজনৈতিক সমঝোতা থাকলে উপজেলা চেয়ারম্যান ও এমপির কাছ থেকে বেশি পরিমাণে সম্পদ আদায় নিশ্চিত করা সহজ হয়। এসব

স্থানীয় পর্যায়ে সমঝোতার ফলে প্রাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ নিয়ে এলিটরা জিরো-সাম (একজনের লাভ, অন্যের ক্ষতি) সংঘর্ষে জড়ায়, যার মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষমতাসীন দলীয় নেতারা গরিবদের জন্য বরাদ্দকৃত উন্নয়ন সম্পদ বহুলাংশে নিয়ে নেয়। এলিট-রাজনৈতিক সমঝোতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো এটি উন্নয়ন প্রকল্পসংশ্লিষ্ট সামষ্টিক কর্মসমস্যা (কালেকটিভ অ্যাকশন প্রবলেম) সমাধানে সাহায্য করে। যেমন সাধারণত স্কুল বা মসজিদ অথবা সড়ক সম্প্রসারণের জন্য জমি পাওয়া খুব কঠিন। এ ছাড়া এসব উন্নয়ন প্রকল্পে বিশাল আকারে জমি দরকার হয়। ইউপি নেতাদের জন্য এলিটদের উদ্বুদ্ধ করে জমি দান পাওয়া একটা মারাত্মক সমস্যা। এলিট সমঝোতা স্থিতিশীল এবং কম জিরো-সামভিত্তিক হলে এসব সমস্যা কম হয়। সামাজিক এলিট চাপের ফলে (রাজনৈতিক ও সামাজিক উভয়ই) অন্য ব্যক্তিরা সহজেই কমিউনিটির কাজের জন্য দান করে।

বেশির ভাগ এলিট নেতৃত্ব (বিশেষ করে ইউপি চেয়ারম্যান) বিভিন্ন রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে একটি কার্যকর পর্যায়ের স্থিতিশীল ও পজিটিভ-সাম এলিট মতৈক্য বজায় রাখতে চায়। এই কৌশলগুলো হলো সহযোগিতা, সহযোজন, মানিয়ে নেওয়া ও ছাড় দেওয়া এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক/সাম্প্রদায়িক বিভক্তিগুলোর মধ্যে জোট গঠন করা—ভিন্ন ভিন্ন সাফল্যের মাত্রায়। এ সাফল্য নির্ভর করে এজেন্সি বা ব্যক্তিগত নেতাদের রাজনৈতিক/সামাজিক প্রভাব বিস্তারের দক্ষতার ধরনের ওপর এবং বৃহত্তর কাঠামোগত বিষয়ের ওপর: যেমন ইউপি এবং তার উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক এককের মধ্যে সম্পর্কের ধরন। এটাকে বলে ইউপি এবং ওপরের স্তরে (উপজেলা, জেলা পর্যায়ে) রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের মধ্যে প্রকৃত রাজনৈতিক মিলন। বতলাগাড়ি ইউনিয়নের একজন সামাজিক এলিট, ইউপি নেতাদের (মূলত ইউপি চেয়ারম্যান) রাজনৈতিক/সামাজিক প্রভাব বিস্তারকারী সক্ষমতার ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন:

> [রাজনৈতিকভাবে চতুর নেতা] এলিটদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে...তাদের সঙ্গে দেখা হলে সুহৃদ্যতা বিনিময় করে...এলিটদের স্থানীয় দ্বন্দ্ব নিরসনে বিচার প্যানেলে আমন্ত্রণ জানায়, উন্নয়ন/সেবা প্রদান কাজ করার আগে পরামর্শ করে এবং এসব কাজে তাদের যুক্ত করে...এবং সাধারণত ইউপির শাসনব্যবস্থা প্রক্রিয়ায় তাদের পরামর্শ গ্রহণ করে।

স্থিতিশীল ও পজিটিভ-সাম এলিট-রাজনৈতিক সমঝোতার সুবিধা শুধু ইউপি নেতৃত্বই ভোগ করে না। সম্পর্কটা পরস্পর নির্ভরশীল। সামাজিক এলিটরাও এই মূল্যবান সামাজিক রাজনৈতিক সম্পদ স্থানীয় পাবলিক গুডস (অবকাঠামো, স্কুল, মসজিদ/মন্দির) থেকে শুরু করে বিশেষ সুবিধা পেতে ব্যবহার করে থাকে। বিশেষ সুবিধাগুলো হলো তাদের গরিব গোষ্ঠী ও আত্মীয়ের জন্য অর্থনৈতিক সম্পদের

ব্যবস্থা করা এবং নিজেদের আত্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে কঠিন ও সংবেদনশীল দ্বন্দ্ব নিরসন করা, বিশেষ করে যেসব দ্বন্দ্ব শুধু তাদের নৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের মাধ্যমে মেটানো সম্ভব নয়।

বৃহত্তর রাজনৈতিক সমঝোতা এবং ইউপি নেতাদের ওপর এর প্রভাব

ইউপি শাসনব্যবস্থাও বৃহত্তর রাজনৈতিক সমাজের মধ্যে প্রোথিত। অনেকাংশেই, ইউপি নেতৃত্বের রাজনৈতিক ক্ষেত্রটি উপজেলা চেয়ারম্যান ও স্থানীয় এমপির ক্লায়েন্টভিত্তিক রাজনৈতিক ধরন দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলো হলো কোন দল স্থানীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে? ইউপির শাসনব্যবস্থা প্রক্রিয়ায় এমপি/উপজেলা চেয়ারম্যানের ভূমিকা কী? ইউপি নেতৃত্ব কি দলীয় নেতাদের অধস্তন নাকি তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারে? এই বৃহৎ পরিসরে কি ভারসাম্যপূর্ণ রাজনৈতিক সমঝোতা রয়েছে (এখানে কি নিচু স্তরের রাজনৈতিক সমঝোতার মতো একটি এলিট মতৈক্য রয়েছে, যা একটি পজিটিভ-সাম এলিট প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে এবং যেখানে সচরাচর দেওয়া-নেওয়ার পদ্ধতি কাজ করে)?

আমাদের গবেষণা বলে যে ইউপি নেতৃত্বের রাজনৈতিক ক্ষেত্রটি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয় স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে বিশেষ করে, উপজেলা পর্যায়ের আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের সঙ্গে ইউপি নেতৃত্বের সম্পর্কের ধরনের ভিত্তিতে। আমলাতন্ত্রের ওপর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক দলের প্রভাব থাকায় (দলতন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক) রাজনৈতিক সমাজ এবং আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্য করা ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে পড়েছে। যার ফলে ইউপির ওপর প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ হচ্ছে, যার স্ববিরোধী দিকও রয়েছে। স্ববিরোধী দিকগুলো হলো নিরপেক্ষ আমলাতান্ত্রিক যৌক্তিকতার একটি মিশ্রণ (অনেক কিছুর মধ্যে কার্যকরী জবাবদিহি পদ্ধতি প্রতিপালন করা ও চর্চা করা এবং ইউপিতে নিরপেক্ষ আমলাতান্ত্রিক তদারকি নিশ্চিত করা) এবং দলীয় রাজনীতি (আমলারা সহজেই রাজনৈতিক নির্দেশ মেনে চলে এবং দলীয় পদ্ধতিতে আইন প্রয়োগ করে)। বতলাগাড়ি ইউনিয়ন পরিষদে এমন মিশ্রণ উল্লেখযোগ্যভাবে চোখে পড়ে (ভারসাম্যপূর্ণভাবেই হয় বলে প্রমাণ পাওয়া যায়)। অন্য দুটি ইউপিতে ভারসাম্যটি আমলাতন্ত্রের দলীয় বিবেচনার প্রতি ঝুঁকে বলে মনে হয়। এ ধরনের আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ ইউপি পর্যায়ে একটি জটিল জবাবদিহির প্রক্রিয়া তৈরি করে। নিচের টেবিলে আমাদের গবেষণার তিনটি ইউপিতে বৃহত্তর রাজনৈতিক সমঝোতার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য ও গতিপ্রকৃতিগুলো সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে।

টেবিল ২ : তিনটি ইউনিয়ন পরিষদে বৃহত্তর রাজনৈতিক সমঝোতা

শাসনব্যবস্থা নির্দেশক	বতলাগাড়ি ইউপি	খোকশাবাড়ি ইউপি	সারপুকুর ইউপি
নির্বাচনী শক্তি/ইউপি চেয়ারম্যানের জনপ্রিয়তা	রাজনৈতিক কাজের মেয়াদ অনেক দীর্ঘ (১৫ বছর)। দুবার নির্বাচিত কিন্তু দায়িত্ব পালন বাধাগ্রস্ত হয়েছে	রাজনৈতিক কাজের মেয়াদ মধ্যম (৭.৫ বছর)। দুবার নির্বাচিত কিন্তু দায়িত্ব পালন বাধাগ্রস্ত হয়েছে	রাজনৈতিক কাজের মেয়াদ অনেক দীর্ঘ (১৬.৫ বছর)। চারবার নির্বাচিত কিন্তু দায়িত্ব পালন বাধাগ্রস্ত হয়েছে
দলীয় সংশ্লিষ্টতা	প্রকাশ্যে নির্দলীয় (গোপনে গোপনে বিএনপিপন্থী)	আওয়ামী লীগ	বিএনপি
বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যান	বিএনপি	জাতীয় পার্টি	আওয়ামী লীগ
বর্তমান এমপি	আওয়ামী লীগ	আওয়ামী লীগ	জাতীয় পার্টি
সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক	কর্মকর্তাদের সঙ্গে শক্তিশালী ও কার্যকর নেটওয়ার্ক। অনেক এনজিও কর্মসূচি ইউপি নেতাদের উপজেলা প্রশাসনে ভালো অবস্থান করে দিয়েছে, যা প্রশাসন ও ইউপি নেতাদের মধ্যে একটি সহযোগিতার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। এ ছাড়া ইউপি নেতাদের জেলা সমিতির সভাপতি হিসেবে তিনি উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বিশেষ সম্মান পান। এসব বিষয়ের কারণে, ইউপি সহজেই প্রশাসন থেকে সেবা ও কারিগরি সহায়তা পেয়ে থাকে। ফলে এটি ইউপির সম্পদ ও সেবা প্রদানে দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে। নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সমঝোতা উন্নয়ন দক্ষতার একটি শুভচক্র তৈরি করেছে। রাজনৈতিক সমঝোতা শাসক বদলের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ইউপি-আমলাতন্ত্র সম্পর্কটি নির্দলীয়/যৌক্তিক ভারসাম্য ও রাজনৈতিক বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল	ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে রাজনৈতিক সাদৃশ্য ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ জ্যেষ্ঠ আমলার সঙ্গে ইউপি চেয়ারম্যানের বন্ধুত্ব থাকার ফলে সম্পর্কটা স্বাচ্ছন্দ্যময় ও একধরনের অশুভ আঁতাতের মতো। এখন অনেক সম্পদ পেয়ে থাকে কিন্তু এই ধরনের সুবিধা অনেক নড়বড়ে, যেহেতু ক্ষমতাসীন দলের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্মকর্তারা বদলি হয়ে থাকেন। ইউপি-আমলাতন্ত্র সম্পর্কটি দলীয় বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল	সরকারের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে তিনজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির রাজনৈতিক মিল না থাকায় সম্পর্কটি বেশ দুর্বল। আমলাতন্ত্র থেকে সম্পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান রাজনৈতিক সমঝোতার নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। ইউপি-আমলাতন্ত্র সম্পর্কটি দলীয় বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল

শাসনব্যবস্থা নির্দেশক	বতলাগাড়ি ইউপি	খোকশাবাড়ি ইউপি	সারপুকুর ইউপি
ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে ইউপির সম্পর্ক	ইউপি চেয়ারম্যানের আত্মীয় নেটওয়ার্কের ভিত্তিতে একটি পজিটিভ-সাম সম্পর্ক। রাজনৈতিক সমঝোতা দল পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যেহেতু আত্মীয়তার বন্ধনের ফলে সব বড় রাজনৈতিক দলেই তাদের লোক রয়েছে	ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোরালো ও লাভজনকভাবে (সম্পদপ্রাপ্তিতে) সম্পৃক্ত। রাজনৈতিক সমঝোতা দল পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল	ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে দুর্বল, জিরো-সাম ও অলাভজনকভাবে (সম্পদপ্রাপ্তিতে) সম্পৃক্ত। অবস্থাটি ইতিবাচকভাবে সম্ভাবনাময় যদি ক্ষমতার পরিবর্তন ইউপি চেয়ারম্যানের পক্ষে যায়

সূত্র : লেখকদ্বয়

টেবিল ২-এর প্রমাণাদি দেখে বোঝা যায় যে তিনটি ইউপির শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে বতলাগাড়িতে বেশি, যেখানে উন্নয়ন বরাদ্দ ও সেবা প্রদানে এক ধরনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি রয়েছে (সুবিধাপ্রাপ্ত দরিদ্র হিসেবে)। অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা কিছুটা দেখা যায় খোকশাবাড়িতেও, কিন্তু স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বাহ্যিক রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে বহুলাংশে ছাড় দেওয়া হয়ে থাকে। এ দুটির তুলনায়, সারপুকুরের শাসনব্যবস্থা প্রক্রিয়াটি মোটেও অংশগ্রহণমূলক নয় এবং সেবা প্রদান ও উন্নয়ন বরাদ্দের ক্ষেত্রে খুব কম জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা দেখা যায়। শাসনব্যবস্থার কর্মসক্ষমতার পার্থক্যকে আমরা কীভাবে দেখব? রাজনৈতিক সমঝোতার পদ্ধতি কি এই পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারে?

তিন ইউপির মধ্যে তুলনা

শাসনব্যবস্থার গুণগত মানে ভিন্নতা থাকলে নির্বাচনী জবাবদিহি কোনো ভূমিকা রাখে না। সব চেয়ারম্যানই নির্বাচনে ভালো ফল অর্জন করেছে। তিনটি ইউপির মধ্যে পার্থক্যের কারণ হলো ইউপি-রাজনৈতিক সমাজ ও ইউপি-আমলাতন্ত্রের সম্পর্ক। স্থানীয় শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে দলীয় সংশ্লিষ্টতার ধরন, ইউপি শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দলের ভূমিকা এবং ইউপি ও আমলাতন্ত্রের সম্পর্কের ধরন তিন ইউপিতে ভিন্ন ভিন্ন শাসনব্যবস্থা হওয়ার কারণ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে।

বতলাগাড়ি ইউপির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমঝোতার মূল বৈশিষ্ট্য হলো চেয়ারম্যান কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রকাশ্যে যুক্ত নন। এর ফলে অন্য দুই চেয়ারম্যানের তুলনায় এই চেয়ারম্যান দলতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামোয় দর-কষাকষি ও পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সুবিধা পায়। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক এলিটদের (উপজেলা, এমপি পর্যায়ে) সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বতলাগাড়ির চেয়ারম্যানের তুলনামূলক স্বাধীনতা থাকায় তিনি অপেক্ষাকৃত বেশি সমতাপূর্ণ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন বরাদ্দ ও সেবা প্রদান-প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা করতে পারে। যে ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান সরাসরি কোনো দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন, সেখানে উন্নয়ন সিদ্ধান্তের রাজনীতি নির্ধারিত হয় স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে এবং সীমিত আকারে বৃহত্তর পর্যায়ে রাজনৈতিক বিবেচনার দ্বারা। এই ব্যাখ্যাটি অনেকাংশে গরিবদের সেবা প্রদানের সঙ্গে সম্পৃক্ত শাসনব্যবস্থা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সত্য এবং সীমিত আকারে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বরাদ্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বৃহত্তর পর্যায়ে রাজনৈতিক সমঝোতা বতলাগাড়ি ইউপি চেয়ারম্যানের প্রণোদনাকে খুব কম প্রভাবিত করে এবং দর-কষাকষির শর্তগুলো তার জন্য অসম হয়ে যায়। বতলাগাড়ির চেয়ারম্যানের মতো যারা স্থানীয় কমিউনিটিতে বংশগত কারণে ঐতিহাসিকভাবেই উচ্চপদস্থ/সমর্থিত, তারা রাজনৈতিক সমাজের ক্ষমতাবান সদস্যদের সঙ্গে দর-কষাকষির ক্ষেত্রে সুখ্যাত এবং রাজনৈতিক মূলধন হিসেবে বিবেচিত। বড় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বতলাগাড়ির চেয়ারম্যানের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ রয়েছে, যেহেতু তার আত্মীয় নেটওয়ার্ক সব দলেই আছে। চেয়ারম্যান তাঁর অদ্বিতীয় ক্ষমতা এবং সামাজিক অবস্থানকে ব্যবহার করে ইউপিকে আরও এক্সক্লুসিভ ও অস্বচ্ছ উপায়ে পরিচালিত করতে পারত। কিন্তু তিনি স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক এলিটদের একত্র করে একজন মতৈক্য প্রতিষ্ঠাকারী হতে চেয়েছেন। উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে তিনি এমন শাসনব্যবস্থা চালু করেছেন, যা এনজিও ও সরকার উভয়কেই তার ইউপির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী করেছে। এর ফলে তিনি অনেক সম্পদ জোগাড় করতে পেরেছেন। এর সবই আবার সেবা প্রদান ও সুপ্রকল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে। ভালো নেতৃত্ব ও বাহ্যিক সহায়তার শুভচক্রের ফলে এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দক্ষ ইউপি শাসনব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে, যাকে সরকার রোল মডেল বলে মনে করে থাকে। মজার ব্যাপার হলো বতলাগাড়ির চেয়ারম্যান আরবিএনএস-কেয়ারের মতো এনজিওকে সাফল্যের জন্য দায়ী মনে করেন, যাদের কর্মসূচি তাঁর ইউপির সঙ্গে উপজেলা আমলাতন্ত্রের ভালো নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সরকারি কর্মকর্তা ও অন্যান্য

আশপাশের ইউপি থেকে সদস্যদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তার ইউপি সম্পর্কে ভালো ধারণা তৈরিতে সাহায্য করেছে।

খোকশাবাড়ি ইউপি চেয়ারম্যান ক্ষমতাসীন দলের এমপির সঙ্গে হুবহু রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা থাকায় কৌশলগতভাবে প্রথাগত সুবিধা ভোগ করে। একটি দলতান্ত্রিক রাজনৈতিক বিন্যাসে, এমন সঠিক রাজনৈতিক মিল সরকারি সম্পদের প্রাপ্তি সহজভাবে নিশ্চিত করে, কিন্তু ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের লোকদের কথা ধরলে চেয়ারম্যানের জন্য স্বাধীন রাজনৈতিক ক্ষেত্র তৈরি কঠিন হয়ে পড়ে। যদিও সম্পদের সহজলভ্যতার ফলে খোকশাবাড়ি ইউপি প্রথাগত ক্লায়েন্টভিত্তিক পৃষ্ঠপোষকতা নেটওয়ার্কের বাইরে যোগ্য গরিবদের জন্য অনেক সম্পদ বরাদ্দ করতে পেরেছে, কিন্তু উন্নয়ন বণ্টন ও সেবা প্রদানসংক্রান্ত শাসনব্যবস্থা প্রক্রিয়া তত স্বচ্ছ নয়, বহুলাংশে এক্সক্লুসিভ এবং ক্ষমতাসীন দলের এলিট কর্তৃক অনেক বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকে।

খোকশাবাড়ি ইউপির ওপর ক্ষমতাসীন দলের নিয়ন্ত্রণ (এ ক্ষেত্রে বলা যায়, অগ্রহণযোগ্য নিয়ন্ত্রণ) একটি ঘটনা থেকে বোঝা যাবে। খোকশাবাড়ি ও বতলাগাড়ি ইউপির বয়স্ক ব্যক্তিরা বয়স্ক ভাতা নিয়ে আসতে নিয়মিত জেলা সদরে (নীলফামারী) যেত, কারণ ব্যাংকগুলো সেখানে রয়েছে। বৃদ্ধ মানুষের জন্য এই প্রক্রিয়া বেশ কষ্টসাধ্য ও দীর্ঘ (সারা দিন লাগে)। উভয় চেয়ারম্যানই ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে অনুরোধ করে যেন কমপক্ষে তাদের দুজন লোককে নিয়মিত পাঠিয়ে এখানে বয়স্ক ভাতা বণ্টন করে দিয়ে যায়, যাতে বয়স্করা শহরে যাওয়ার দীর্ঘ ভ্রমণ থেকে রেহাই পায়। দুই ইউনিয়নেই কিছু স্বেচ্ছাসেবক মিলে বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছ থেকে ২০ টাকা করে নিয়ে ব্যাংকের লোকদের জন্য দুপুরের খাবার ব্যবস্থা করে। খোকশাবাড়ি ইউনিয়নে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা (আওয়ামী লীগ এ ক্ষেত্রে) শিগগিরই ইউপি চেয়ারম্যানের ওপর এই মহৎ ব্যবস্থা বন্ধ করতে দুটি যুক্তি তুলে ধরল : চেয়ারম্যান তাদের এ ব্যাপারে জানায়নি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো দুপুরের খাবারের জন্য যে টাকা তোলা হলো তার ভাগ দেয়নি। রাজনৈতিক নেতাদের চাপে এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অন্যদিকে, বতলাগাড়ি ইউপি সফলভাবে এই ব্যবস্থা চালু করেছে এবং এখনো চলছে। চেয়ারম্যান তাঁর রাজনৈতিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে স্থানীয় দলতন্ত্রের খারাপ প্রভাব থেকে এই ব্যবস্থাকে রক্ষা করেছে। খোকশাবাড়ি ইউপিতে দলতন্ত্রের প্রভাব মানে হলো সরকার থেকে সম্পদপ্রাপ্তি নিশ্চিত করাটা সরকার বদলের ওপর নির্ভরশীল, যা বতলাগাড়িতে নয়। সরকারের অনিশ্চয়তার ফলে সামাজিক জবাবদিহি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিত হতে পারে না এবং এদের দায়িত্বও প্রশ্নবিদ্ধ থাকে।

সারপুকুরে দেখা যায়, যখন বৃহত্তর রাজনৈতিক সমঝোতা না থাকে তখন কী ঘটতে পারে। বর্তমান সমঝোতাটা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ, কারণ সব গুরুত্বপূর্ণ কর্তাব্যক্তির মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শে মিল নেই (ইউপি ও উপজেলা চেয়ারম্যান, এমপি)। ইউপি চেয়ারম্যান ও এমপির মধ্যে রাজনৈতিক বৈসাদৃশ্যের ফলে দলতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে সরকারের কাছ থেকে যে সর্বোচ্চ সম্পদ পাওয়া যায় তা সম্ভব হচ্ছে না। ইউপি চেয়ারম্যান তাঁর যেটুকু সীমিত নেটওয়ার্ক রয়েছে তা দিয়ে উপজেলা প্রশাসন থেকে কিছু পেতে হলে সংগ্রাম করতে হয়। উন্নয়ন বরাদ্দগুলো তিনটি ভিন্ন রাজনৈতিক অ্যাক্টরদের (ইউপি চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যান এবং এমপি) রাজনৈতিক ক্লায়েন্টভিত্তিক বিবেচনায় তদর্থক পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন করা হয়। এই তিনটি রাজনৈতিক অ্যাক্টরের মধ্যে কোনো সংঘবদ্ধ রূপ পাওয়া দুষ্কর। আমরা আগে আলোচনা করেছি যে এ ধরনের একটি সংঘবদ্ধ রূপ বতলাগাড়িতে পাওয়া যায়।

বতলাগাড়ি চেয়ারম্যান বলেন, সাধারণত ইউপি বিশৃঙ্খলাপূর্ণ শাসনব্যবস্থা প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বড় অ্যাক্টরদের (এমপি, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউএনও, ইউপি চেয়ারম্যান) মধ্যে জবাবদিহি সীমানাগুলো বোঝা কঠিন এবং তাদের নিজ নিজ আনুষ্ঠানিক ভূমিকা কার্যত অনানুষ্ঠানিক ভূমিকা দ্বারা বদলিয়ে ফেলা হয়েছে। যেখানে এমপির সংসদে আইন প্রণয়ন করার কথা ছিল, সেখানে তিনি অনানুষ্ঠানিকভাবে টেস্ট রিলিফের (টিআর) বণ্টনে যুক্ত এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্যের (কাবিখা) অর্থ তদারক ও বরাদ্দে ব্যস্ত। টিআর ও কাবিখা প্রদানের নির্দেশ দাপ্তরিকভাবে ইউএনওর পরিবর্তে উপজেলা চেয়ারম্যানের ওপর ন্যস্ত। ইউএনও তাঁর ঊর্ধ্বতনের কাছে কিছু মাত্রায় আনুষ্ঠানিক জবাবদিহি করে থাকে, কিন্তু উপজেলা চেয়ারম্যান কারও কাছেই কার্যকরভাবে দায়বদ্ধ নয়। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক জবাবদিহি কাঠামোর এই ধরনের গুলিয়ে যাওয়াটা বৃহত্তর এলিট রাজনৈতিক সমঝোতাকে কিছুটা অস্থিতিশীল ও অনিশ্চিত করে ফেলেছে। শুধু বিভিন্ন এলিট স্বার্থের দক্ষ পরিচালনার মাধ্যমে একজন চেয়ারম্যান যোগ্য গরিবদের জন্য সেবা প্রদান ও উন্নয়ন বরাদ্দ ব্যবস্থাপনা করতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় অনেক সমঝোতা করতে হয় ক্ষমতাবান এলিটদের সঙ্গে এবং ফলে সেবা প্রদান-সম্পর্কিত শাসনব্যবস্থা প্রক্রিয়া অনেক বেশি ছাড় দেওয়া হয় ও কম অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়।

দ্বৈত কর্তৃত্ব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থা

আমাদের বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলতে চেয়েছি যে যদি স্থানীয় ও বৃহত্তর রাজনৈতিক সমাজে ইউপি প্রোথিত থাকে তাহলে তা ইউপি শাসনব্যবস্থা ও ইউপি

নেতাদের প্রণোদনার ধরনকে প্রভাবিত করে। প্রভাবের ধরন ভিন্ন হয় এবং এই ভিন্নতা স্পষ্ট এলিট রাজনৈতিক সমঝোতার ওপর নির্ভর করে ঘটে থাকে। সাধারণভাবে, তিনটি ইউপিই রাজনৈতিক এলিট ও ইউপি নেতাদের দ্বৈত কর্তৃত্বের ওপর নির্ভরশীল। একটি ইউপির একজন সদস্য বলেন, 'যদিও ইউপির নির্বাচনী রাজনীতিতে দলগুলোর কোনো প্রভাব নেই, কিন্তু সেবা প্রদান ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে তাদের ভালো প্রভাব রয়েছে।' দ্বৈত কর্তৃত্ব কাঠামোয় উভয় ধরনের অ্যাক্টররাই সম্পদের ওপর তাদের দাবির বৈধতা পাওয়ার চেষ্টা করে। খোকশাবাড়ি ইউপি চেয়ারম্যান বলেন, ইউপি সদস্যরা 'স্থানীয় জনগণের আসল প্রতিনিধি' হিসেবে তাঁদের কর্তৃত্ব ফলাতে চেষ্টা করেন।

অন্যদিকে রাজনৈতিক এলিটরা 'সরকারের প্রতিনিধি' হিসেবে তাঁদের কর্তৃত্ব দেখান (পড়ুন ক্ষমতাসীন দল)। দলতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, রাজনৈতিক এলিটদের দাবি বেশ গুরুত্ববহ। আমাদের সাধারণ পর্যবেক্ষণ হলো ইউপি পর্যায়ে এই প্রকৃত দ্বৈত কর্তৃত্ব চেয়ারম্যানকে স্বাধীনভাবে গরিবদের সেবা করতে বাধাগ্রস্ত করে। যোগ্য গরিবেরা ভোগান্তিতে পড়ে, যেহেতু তাদের চিহ্নিত করা ও সেবা করার জন্য (নির্বাচনী প্রণোদনা) রাজনৈতিক এলিটদের চেয়ে ইউপি সদস্যরা বেশি দক্ষ ও সক্রিয়। কিন্তু বৃহত্তর রাজনৈতিক বিন্যাসে ইউপি সদস্যদের অসম শক্তির ফলে তারা গরিবদের জন্য আনীত সম্পদে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ইউপি পর্যায়ে কার্যত কর্তৃত্ব কাঠামোয় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক এলিটদের প্রভুত্ব দরিদ্রবান্ধব ও অংশগ্রহণমূলক সেবা প্রদান ও সম্পদ বরাদ্দ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় বড় রকম চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। রাজনৈতিক এলিটদের প্রভুত্বের ফলে যোগ্য গরিবদের থেকে ইউপিভিত্তিক সম্পদ ক্ষুদ্র রাজনৈতিক ক্লায়েন্টদের কাছে চলে যায়।

তিনটি ইউপিতেই লক্ষণীয় হলো স্থানীয় পর্যায়ের ক্ষমতাসীন দলীয় রাজনৈতিক নেতাদের সুবিধা দেওয়ার জন্য ইউএনও ইউপি চেয়ারম্যানদের ওপর অনেক চাপ সৃষ্টি করে। ফলে এই নেতারা এর সুবিধা নিচ্ছেন। চেয়ারম্যানকে দক্ষভাবে নীতি ক্ষেত্রে একসাথে অনেকগুলো কঠিন কাজ সম্পাদন করতে হয়, যে ক্ষেত্রটিতে ইউপি থেকে উন্নয়ন সম্পদ দখল করতে সব বড় রাজনৈতিক দলের নেতারা দর-কষাকষি প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকেন।[৭] ইউপি ও রাজনৈতিক সমাজের মধ্যে সম্পর্কের বৃহত্তর দিকটি মাথায় নিলে, সমমনা এলিটদের মধ্যেও কাজের সম্পর্ক প্রত্যেক ইউপিতে স্পষ্ট এলিট-রাজনৈতিক সমঝোতার ধরন অনুযায়ী ভিন্ন হয়। কার্যত সমমনা এলিট সম্পর্কও ইউপি সদস্যদের নেতৃত্ব দক্ষতার ওপর নির্ভর করে (নেতাদের সুদক্ষ পরিকল্পনা দক্ষতা, তাদের জোট করার কৌশল, চ্যালেঞ্জিং কাঠামোগত বাধা থাকার পরও)। এ জন্য ব্যক্তিগত নেতাদের 'এজেন্সি'ও গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে সহজ এলিট-রাজনৈতিক সমঝোতা ও সমমনা এলিটদের সম্পর্ক খোকশাবাড়ি ইউপির ক্ষেত্রে দেখা যায়। এখানে ইউপি চেয়ারম্যান ও এমপির রাজনৈতিক মিল রয়েছে (দুজনেই আওয়ামী লীগ)। স্থানীয় রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে এমপিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাক্টর। এমপিকে নিজের রাজনৈতিক পক্ষে রাখতে পারা মানে সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও পৃষ্ঠপোষকতা সুবিধা বণ্টনের নোংরা স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি চালনা করার অনেক সুবিধা পাওয়া। খোকশাবাড়ি ইউপি চেয়ারম্যানের জন্য ইউপি সদস্যদের দ্বৈত কর্তৃত্ব ও স্থানীয় ক্ষমতাসীন দলের এলিটদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা তুলনামূলক সহজ। এটা তার রাজনৈতিক পরিচয় ও এমপির সমর্থনের জন্যই। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সহজতর এই এলিট সমঝোতা মূলত ক্ষমতাসীন দলের নেতৃত্বের জন্য সুবিধাজনক, কিন্তু গরিবদের জন্য খুব কমই ইতিবাচক। অন্য দুই ইউপির ক্ষেত্রে সমমনা এলিটদের সম্পর্কের বিবর্তনটা অনেক বেশি কঠিন, যেখানে চেয়ারম্যানদের ও এমপিদের রাজনৈতিক পরিচয় ভিন্ন ভিন্ন। ফলে সম্পদ নিয়ন্ত্রণের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা অনেক বেশি জটিল ও অনিশ্চিত হয়ে গেছে এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে যোগ্য গরিবদের জন্য সম্পদ বরাদ্দের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব সারপুকুর ইউপিতে বেশি এবং তা বতলাগাড়িতে কম। কারণ হলো বতলাগাড়ি ইউপি চেয়ারম্যানের জোট ও মতৈক্য তৈরির দক্ষতা।[৮]

জেন্ডার, ইউপি নারী সদস্যদের প্রণোদনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক সমঝোতা

বিভিন্ন রাজনৈতিক নির্ধারকের মাধ্যমে কীভাবে নারী প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক এজেন্সি গঠিত হয় এবং কীভাবে এসব নির্ধারক গরিব নারীসহ নারী সদস্যদের স্থানীয় ভাবনার প্রতি মনোযোগী করতে প্রণোদনা জোগায়, তা বোঝার জন্য একটি আলাদা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জেন্ডার-সম্পর্কিত রাজনৈতিক সমঝোতার গবেষণা তুলনামূলকভাবে কম; এদের বেশির ভাগই নারীর প্রতিনিধিত্ব, কোটা ও নীতি-প্রক্রিয়ায় জেন্ডারকে কেন্দ্রে আনার উপর আলোকপাত করে (নাজনীন ও মাহমুদ, ২০১২)।

যদিও ইউপি পর্যায়ে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংরক্ষিত আসন রাখার বিধান নারীদের স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনে অনেক বেশি প্রতিযোগিতা করার সুযোগ করে দিয়েছে (ফ্রাঙ্কেল, ২০০৩, খান ও অ্যারা, ২০০৬), আমাদের উপাত্ত দেখাচ্ছে যে কোনো নারীর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে আত্মীয়তা, পরিবারের রাজনৈতিক মূলধন, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে

সংশ্লিষ্টতা ইত্যাদি। এই গবেষণা ফলাফল বিদ্যমান গবেষণাগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ (দেখুন খান ও মহসিন, ২০০৮; নাজনীন ও অন্যান্য, প্রকাশিতব্য)। মূল বিষয়টা হলো নারীরা কি এখানে স্বাধীন অ্যাক্টর (যেটা বহুলাংশে পুরুষ সদস্যদের থাকে), নাকি তাদের পরিবারের ক্ষমতাচর্চার একটা মাধ্যম? যদিও আত্মীয়স্বজন এবং অন্যান্য বংশগত সংশ্লিষ্টতা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই নির্বাচনে জয়ের জন্য এবং শাসনব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মূল নিয়ামক, কিন্তু নারী ইউপি সদস্যদের পরিবার নারীদের রাজনৈতিক এজেন্সি প্রভাবিত করতে বড় ভূমিকা রাখে। যা হোক, স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত নারীদের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করার পদ্ধতির ক্ষেত্রে ধীর একটা পরিবর্তন ঘটছে।

সব ইউনিয়নেই ইউপি চেয়ারম্যানরা এবং সদস্যরা নারীদের তাদের পরিবারের 'প্রক্সি' প্রতিনিধি হিসেবে দেখে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যদের পরিবার ও স্থানীয় এলিট/রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্ররোচিত করে এবং নির্বাচনী প্রচারণায় সাহায্য করে। সাহায্য করার পেছনে মূল কারণ থাকে স্বার্থসিদ্ধি। এসব নারী প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সমর্থন পায় তাদের বংশগত মর্যাদার জন্য (কোথা থেকে তার পরিবার এসেছে, আত্মীয় সম্পর্ক), কারণ এর ফলে সংরক্ষিত আসনগুলো জিতলে তাদের কমিউনিটি বা নিজের লোকের হাতেই যেন থাকে। রাজনৈতিক দলগুলো এই নারীদের সমর্থন দেয়, কারণ তাদের পরিবার এসব রাজনৈতিক দলের অন্তর্গত। নারীদের জন্য স্থানীয় সমর্থন আদায়ে 'গোষ্ঠী' ও 'দেশি'রা মূল ভূমিকা পালন করে। সেবা প্রদান ও স্বার্থ প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রণয়নে যেসব নারী ইউপি সদস্য রয়েছে তারা এসব বিষয়ে বেশি গুরুত্ববহ। এসব নারীর পরিবারগুলোও সাধারণত তাদের প্রার্থিতাকে সমর্থন দেয়, কারণ এর মাধ্যমে পরিবারগুলো ইউপি সিদ্ধান্ত প্রণয়নের কেন্দ্রে প্রভাব ও প্রবেশ বৃদ্ধি করতে পারে। সাক্ষাৎকার প্রদানকারী বেশির ভাগ ইউপি নেতা বলেন যে নারী সদস্যদের স্বামীরাই সভা ও কমিউনিটিগুলোতে সক্রিয়। মজার ব্যাপার হলো, যদিও দৃশ্যত ইউপি নেতারা নারী নেত্রীদের সক্ষমতা সম্পর্কে নেতিবাচক, কিন্তু তারা এটা বলেনি যে নারীরা স্বভাবগতভাবেই কম সক্ষম (প্রাকৃতিকভাবেই দুর্বল)। সব সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীই সামাজিক বাধা যেমন জেন্ডার শ্রম বিভাজন, নারীর সামাজিক গতিশীলতার ওপর বিধিনিষেধ, বিভিন্ন কমিউনিটিতে জেন্ডার-সম্পর্কিত আদর্শ এবং রাতে চলাফেরাকে দেখিয়েছে নারীদের কার্যকরভাবে ইউপি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে না পারার পেছনে কারণ হিসেবে। এসব সামাজিক বাধা দেখলে দেখা যাবে যে সমাজ যেভাবে জেন্ডার পক্ষপাতিত্বকে বিশ্লেষণ করে তার পদ্ধতিতে একটা পরিবর্তন হচ্ছে।

নারী ইউপি নেত্রীরা সালিসে ভূমিকা রাখেন, বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে 'নারীঘটিত বিষয়' থাকে (বিয়ে, তালাক, পারিবারিক নির্যাতন ইত্যাদি)। এ বিষয়গুলো পৃষ্ঠপোষকতা সুবিধা বণ্টন ও সম্পদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে যায় না। তার ওপর এ ঘটনাগুলোকে 'ব্যক্তিগত' সমস্যা হিসেবে দেখা হয় (একজন পুরুষ তার স্ত্রীর প্রতি সহিংস) যা স্থানীয় জেন্ডার ক্ষমতাকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে না। এ জন্য সালিসে নারী ইউপি নেত্রীদের অংশগ্রহণকে পুরুষরা বাধা দেয় না। সালিসে নারীদের অন্তর্ভুক্তির জন্য পুরুষদের সমর্থন নারীদের উপস্থিতি যেমন বৃদ্ধি করে, পাশাপাশি সম্ভবত একটা 'ডেমোনস্ট্রেশন ইফেক্ট'ও তৈরি করে (যেমন নারীরা পুরুষদের জায়গাগুলোতেও আসতে পারে; (ম্যানসব্রিজ, ১৯৯৯); এটা জেন্ডার ভূমিকা ও জেন্ডার সম্পর্কের সঙ্গে আবর্তিত স্থানীয় রাজনৈতিক সমঝোতাকে চ্যালেঞ্জ করে না। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে নারী প্রতিনিধিত্বের যে বিধান রয়েছে, তার মাধ্যমে নারী ইউপি নেত্রীদের জন্য সৃষ্টি হওয়া ক্ষেত্রটির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই ফলাফলগুলোও বিদ্যমান গবেষণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ (দেখুন নাজনীন ও তাসনিম, ২০১০)।

এমন ঘটনাও রয়েছে যেখানে নারী ইউপি সদস্য ও চেয়ারম্যান/পুরুষ সদস্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেধেছে। একটা ঘটনায়, ইউপি নারী সদস্যের পাওয়া প্রকল্প বরাদ্দ চেয়ারম্যান নিয়ে নেন। তখন নারী সদস্য সভা বর্জন করে তার প্রতিবাদ জানান এবং কমিউনিটিকে জানান কেন তিনি সভা বর্জন করেছেন। এর ফলে ইউপি চেয়ারম্যানের ওপর একটা পরোক্ষ চাপ তৈরি হয়, যেন তিনি স্বীকার করেন যে তিনি ভুল করেছেন এবং ভবিষ্যতে আর করবেন না (খোকশাবাড়ি ইউপি)। কিন্তু এসব ঘটনা খুবই কম। নারীদের সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার আইনি বাধ্যবাধকতা থাকার ফলে ইউপি চেয়ারম্যানরা এসব প্রকল্পে কীভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তা নিয়ন্ত্রণ করতে সংরক্ষিত আসনের নারীদের ব্যবহার করেন। ইউপি সচিব ও সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীরা নিচের কারণগুলো উল্লেখ করেছেন কেন চেয়ারম্যান নারীদের এভাবে কাজে লাগাতে পারেন : নারীদের জ্ঞান কম; তাঁরা জেন্ডার শ্রম বিভাজন থাকার ফলে সভায় অনুপস্থিত থাকেন; নারীদের স্বামীরা চেয়ারম্যানের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ফেলতে পারেন এবং নারীদের তা মেনে নিতে বাধ্য করতে পারেন ইত্যাদি। আমাদের ফলাফলে দেখা যায়, উপজেলায় নির্বাচিত নারীনেত্রী ও ইউপিতে নির্বাচিত নারীনেত্রীদের মধ্যে যোগাযোগ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, কমপক্ষে খোকশাবাড়ি ও সারপুকুর ইউনিয়নে। তাই নারীনেত্রীদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নারী অধিকার ও স্বার্থরক্ষার সম্ভাবনা বর্তমানে খুব কম। নারী ইউপি নেত্রীরা বলেন যে সরকারের নারীবিষয়ক অধিদপ্তরের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল এবং এই অধিদপ্তরের সঙ্গে যুক্ত বিদ্যমান আমলাতান্ত্রিক

চ্যানেলের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে তারা বিভিন্ন নারীবিষয়ক প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। যা হোক, অন্যান্য সরকারি বিভাগ নারী প্রতিনিধি যুক্ত করতে কোনো বিশেষ প্রচেষ্টা নেয়নি। নারী প্রতিনিধিদের জন্য এর মানে হলো আমলাতান্ত্রিক চ্যানেল ব্যবহার করে রাজনৈতিক চাপ মোকাবিলা করার সম্ভাবনাও কম। এটা আরও নির্দেশ করে যে 'নারীর বিষয়গুলো' একটি অধিদপ্তরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

ওপরের সবকিছু দেখে মনে হয়, নারী ইউপি নেত্রীদের জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রদানের সম্ভাবনা অনেক কম, যদিও নারীদের জন্য অনেক দিক উন্মোচিত হয়েছে (সালিস) এবং জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হচ্ছে। এখানে মূল বিষয়টি হলো কীভাবে এসব নারী ইউপি নেত্রীর জেন্ডার-সম্পর্কিত বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগী করতে ব্যবহৃত প্রণোদনাগুলোকে শক্তিশালী করা যায়। কোন কোন চ্যানেল সৃষ্টির মাধ্যমে নারী ইউপি নেত্রীদের বৃহত্তর নেটওয়ার্কের সঙ্গে এবং স্থানীয় নারী নির্বাচনী এলাকার সঙ্গে কার্যকরভাবে যুক্ত করা যায় (দেখুন অধ্যায় ৭; ওয়ার্ড সভার ওপর আলোচনা)।

ইউপি-সম্পর্কিত সাম্প্রতিক আইন, বিধি ও সামাজিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠান কি নেতাদের প্রণোদনায় কোনো পরিবর্তন নিয়ে আসছে?

সরকার সাম্প্রতিক সময়ে ইউপিকে শক্তিশালী করতে নতুন আইন ও নীতি প্রণয়ন করেছে এবং ইউপি শাসনব্যবস্থা প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন ফোরাম তৈরি করেছে। সবচেয়ে বিখ্যাত হলো ২০০৯ আইনের বাস্তবায়ন, বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটির কাজের পুনরুজ্জীবন এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সংবিধানের জন্য সভা আহ্বান করা বাধ্যতামূলক দেখিয়ে পরিপত্র পাঠানোর নীতি। ইউপি শাসনব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ায় এসব নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ইউপি সদস্যদের আচরণকে প্রকৃত অর্থে প্রভাবিত করেছে, তাদের জন্য নতুন প্রণোদনা সৃষ্টি করেছে। এসব নতুন সংযোজন অন্য স্টেকহোল্ডারদের ক্ষমতাও বাড়িয়েছে, যারা ইউপি প্রশাসনের বাইরে থাকলেও উন্নয়ন বরাদ্দ ও পৃষ্ঠপোষকতা সুবিধা বণ্টনের প্রক্রিয়ার ক্ষমতা বিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত।

নাগরিকদের, বিশেষ করে অসংগঠিত গরিবদের স্বার্থ, প্রণোদনা ও সামগ্রিক কর্মসক্ষমতাও পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তন ইউপি নেতৃত্বকে যেমন বাধাগ্রস্ত করেছে, তেমনি সুবিধাও দিয়েছে এবং গরিবদের ব্যাপারে ইউপি নেতৃত্বের জন্য জটিল প্রণোদনা সৃষ্টি করেছে। এর মানে রাজনৈতিক সমঝোতার অভ্যন্তরীণ গতিপ্রকৃতির ধরন শুধু এলিটদের মধ্যেই পরিবর্তিত হয়নি, এলিট ও গরিবদের মধ্যেও হয়েছে। স্বার্থ ও অ্যাক্টরদের এই নতুন কাঠামো বিন্যাসে বৃহত্তর ও স্থানীয়

এলিট-রাজনৈতিক সমঝোতার গতিপ্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। নিচে আমরা শাসনব্যবস্থার গতিপ্রকৃতিতে পরিবর্তন এবং ইউপি নেতৃত্ব, স্থানীয় এলিট এবং গরিব নাগরিকদের প্রণোদনায় পরিবর্তন ও ইউপিতে নতুন আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক নীতি বাস্তবায়নের আলোকে আলোচনা করব।

ওয়ার্ড সভা ও অন্যান্য সামাজিক জবাবদিহি ফোরাম

ইউপি আইন ২০০৯-এর একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো ওয়ার্ড সভার সূচনা, যা ইউপি পর্যায়ে যেকোনো সামাজিক জবাবদিহি ফোরামের চেয়ে বেশি আকারে নাগরিকদের যুক্ত করে। ওয়ার্ড সভার কার্যক্রম উন্নয়ন বরাদ্দের ধরন ও বিভিন্ন ধরনের সেবার ক্ষেত্রে ইউপি নেতৃত্ব ও স্থানীয় নাগরিকদের মধ্যে তথ্যগত অসমতা কমিয়েছে। তথ্যের এই প্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলের সুবিধা নাগরিক ও ইউপি নেতারা উভয়ই পেয়েছেন।

গরিব নাগরিক ও নারীদের সুবিধা এবং অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা

ওয়ার্ড সভা হওয়াতে নাগরিকেরা (মূলত গরিব ও নারী) প্রত্যাশার চেয়ে কম সেবা পাওয়া এবং সেবার অপব্যবহার সম্পর্কে তাদের হতাশা ব্যক্ত করতে পারেন। নাগরিকেরা সামষ্টিকভাবে ইউপি নেতাদের সেবাসম্পর্কিত কর্মসক্ষমতার ব্যাপারে ব্যাখ্যা দাবি করতে পারেন। মোট কথা, ওয়ার্ড সভার ফলে দরিদ্র নাগরিকদের জন্য ভীতিহীনভাবে তাদের দাবি পেশ করার সুযোগ কাঠামো তৈরি হয়েছে, যেহেতু গরিব ও নারীরা ইউপি নেতাদের সংঘবদ্ধ হয়ে সামষ্টিকভাবে খোলামেলা চ্যালেঞ্জ করতে পারছেন। গরিবদের জন্য এসব সামাজিক জবাবদিহি ফোরাম রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং মাঝে মাঝে ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসনের সিইও) এসব জায়গায় উপস্থিত থাকেন, যা ইউপি নেতাদের ওপর জবাবদিহি চাপ বাড়িয়ে দেয়। ওয়ার্ড সভায় পেট্রননির্ভর গরিবদের সামষ্টিক কর্মপন্থার রাজনৈতিক সুবিধা স্পষ্ট, যদিও এসব সুবিধাকে অতিরঞ্জিত করা যাবে না। গবেষণায় দেখা যায়, মানুষ ভয় পায় এই ভেবে, যদি নেতাদের এখন চ্যালেঞ্জ করে, তাহলে পরে তার প্রতিশোধ নিতে পারে। কেউ কেউ মনে করে যে যদি এখন তারা সামষ্টিক ফোরামগুলোতে বেশি দাবি করে এবং সমালোচনা করে তাহলে বিদ্যমান পৃষ্ঠপোষকতা নেটওয়ার্ক থেকে তাদের নাম বাদ পড়তে পারে। তাই এখন মুখ বন্ধ রেখে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখলে ভবিষ্যতে প্রথাগত অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ক্রমাগত সুবিধা পাওয়া ভালো।

এতৎসত্ত্বেও, আমাদের সব শ্রেণির মূল তথ্যদাতাদের বক্তব্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, ওয়ার্ড সভা অভিযোগ প্রকাশের এবং অধিকার আদায় ও কর্মসক্ষমতা এবং

অপূর্ণ প্রতিজ্ঞার জন্য ইউপি নেতাদের জনসম্মুখে দায়বদ্ধ করার ক্ষেত্রে একটা জনপ্রিয় স্থান হয়ে গেছে। এটা সুচিন্তিত ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রেরও একটি স্থান, যা এখনো গ্রামীণ দরিদ্রদের কাছে দুষ্প্রাপ্য। এনজিওগুলো এসব প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে দৃঢ়ভাবে অধিকার এবং নাগরিকত্বের ধারণাগুলো গরিবদের বোঝাতে পারছে। অধিকারসংক্রান্ত ধারণা জেন্ডার রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আবর্তিত হচ্ছে।

স্থানীয় ওয়ার্ড সভা এবং অন্যান্য জায়গায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় প্রত্যেক তথ্যদাতা ফোরামগুলোতে নারীদের দৃশ্যমানতা নিয়ে মন্তব্য করেছে। তারা এটাও বলেছে যে নারীরা দাবিগুলো সামষ্টিকভাবে তুলে ধরে। বিশেষ করে গরিব নারীরা এসব ফোরাম থেকে লাভবান হয়েছে। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে মধ্যবিত্ত বা এলিট শ্রেণি থেকে কদাচিৎ কোনো নারীকে ওয়ার্ড সভায় দেখা গেছে।

যা হোক, দরিদ্র নারীদের অংশগ্রহণ আরও বিশ্লেষণের দাবি রাখে। নারীরা অংশগ্রহণ করতে পারে (সম্ভবত পুরুষেরা আরও কম) কারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এমন সময়ে যখন নারীরা আসতে পারে (বিকেলের ঠিক আগে)। এনজিও কর্তৃক নারী গ্রুপগুলোকে সংঘবদ্ধ করা ও তথ্যের অধিকার ও প্রশিক্ষণ নারীদের জনসভায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করেছে। অন্য কারণগুলো সম্ভবত এলিট ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির নারীদের মধ্যে সামাজিক রক্ষণশীলতা (পর্দা), জনসমাবেশে দরিদ্র নারীদের সঙ্গে মিশতে তাদের অনীহা এবং এ জন্য যে এলিট/মধ্যবিত্ত শ্রেণির নারীরা পুরুষতান্ত্রিক নিয়মনীতি দ্বারা বেশি বাধাগ্রস্ত (স্থানীয় কমিউনিটি মিটিংয়ে অংশগ্রহণের জন্য পুরুষ অভিভাবকের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়া কঠিন)।

গরিব নারীদের অধিক অংশগ্রহণের ফলাফল হলো যেসব দাবি ওয়ার্ড সভায় উঠত তা গরিব ও নারীদের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক ছিল। একটি জনপ্রিয় দাবি হলো বাড়ির আঙিনায় সস্তা ল্যাট্রিন সুবিধা। অন্য সংশ্লিষ্ট দাবিগুলো হলো ইউপি নেতারা কার্যকর পদক্ষেপ নেয়: পরিবারে সহিংসতা কমাতে; যৌতুক প্রথা থামাতে; বাইরে/কর্মক্ষেত্রে নারীদের যৌন নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে; বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে; নারী ও পুরুষের মধ্যে অসম মজুরি বিষয়ে মনোযোগ দিতে; নারীদের উৎপাদন দক্ষতা তৈরিতে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে। জেন্ডার-সংশ্লিষ্ট এমন অনেক দাবি ইউপি নেতাদের জন্য সুখকর নয়। এর কারণ সমাজের পুরুষতান্ত্রিক প্রথাগত প্রেক্ষাপট।

মূল প্রশ্নটি এখানে নারীদের অংশগ্রহণের মান। আমাদের কোনো পদ্ধতিগত প্রমাণ নেই যে কীভাবে ইউপি নেতারা এ ধরনের দাবিগুলোকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে এবং কীভাবে জেন্ডার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থায় কিছু নৈতিক নীতিবাক্য উচ্চারণের প্রচলিত শব্দগুচ্ছের বাইরে এগুলোকে দেখে থাকে। ইউপি নেতাদের বা কমিউনিটির ওপর নারীদের প্রভাব (প্রভাব ব্যবহার করে এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট দর-কষাকষির সামর্থ্য বিচারে) ওয়ার্ড সভাতে তাদের দৃশ্যমান সংখ্যক উপস্থিতি থাকা

সত্ত্বেও সীমিত। ইউপি নেতারা হতে পারে যৌতুকের বিরুদ্ধে বা নারীদের ল্যাট্রিনের প্রয়োজনের কথা বলছেন, কিন্তু মূল বিষয় হলো প্রয়োজনগুলো মেটানো হয় কি না বা গ্রামে জেন্ডার বৈষম্যমূলক কার্যকলাপ পরিবর্তনে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয় কি না। খোকশাবাড়ি ইউপি সচিব বলেন যে যেহেতু ওয়ার্ড সভায় এলিট বা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির নারীদের অংশগ্রহণ নেই, ইউপি নেতারা কদাচিৎ এসব ফোরামে উঠে আসা জেন্ডারবিষয়ক দাবি বাস্তবায়নে ব্যবস্থা নেন। অভ্যন্তরীণ এমন বিজ্ঞ একজন যখন এমন মন্তব্য করেন তখন বুঝতে হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও প্রক্রিয়ায় নারীদের অন্তর্ভুক্তি তাঁদের দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি করবে কিন্তু তার মানে এই নয় যে প্রভাবও বৃদ্ধি পাবে (তাদের স্বার্থ নিশ্চিত করার সামর্থ্য)। এনজিওগুলোর জন্য চ্যালেঞ্জ হলো নারীদের এসব ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তির মধ্যে সংযোগ তৈরি করা, যেন তা স্থানীয় পর্যায়ে জেন্ডার স্বার্থসংশ্লিষ্ট দর-কষাকষিতে প্রভাব রাখতে পারে।

এতৎসত্ত্বেও, ওয়ার্ড সভার মতো নির্দিষ্ট ফোরামে এসব জেন্ডার-বিষয়ক দাবি বৃদ্ধি পাওয়া মানে হলো ভবিষ্যতে স্থানীয় রাজনীতিতে নতুন ধারা তৈরি করবে। এটা দেখার বিষয় যে ভবিষ্যতে জেন্ডার রাজনীতির এই নতুন ধারাটি নারী ইউপি নেত্রীদের জন্য কী অবদান রাখতে পারে।

মোটামুটি, নতুন এই ফোরামগুলো থেকে সম্ভাবনা এবং জনপ্রতিনিধিদের থেকে বেশি পরিমাণে জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষমতা অনুমান করা যায়। প্রাথমিক গবেষণায় (নিচে দেখুন) মিশ্র ফলাফল দেখা যায় (ইউপি নেতাদের ওপর দৃশ্যমান ও বিশ্বাসযোগ্য চাপ, কিন্তু অপূর্ণ দাবি, ইউপি নেতাদের সাড়া না দেওয়া, এসব ফোরামে প্রভাব এবং এ সম্পর্কে নাগরিকদের সমালোচনা)। দেখা যায়, নির্দিষ্ট প্রকল্প সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা মানেই প্রকল্পের কার্যাবলি পরিবর্তনের সামর্থ্য বোঝায় না। ওয়ার্ড সভায় সক্রিয় হলে জনমতকে আমলে নেওয়া এবং তাদের কার্যাবলি পরিবর্তনের পরিবর্তে ইউপি নেতার উদ্বেগগুলোতে মনোযোগ দেওয়া এবং অস্থিরতা কমানোর পন্থা হিসেবে দেখে থাকে।

ইউপি নেতাদের সুবিধা

আগেই বলা হয়েছে যে ওয়ার্ড সভার সুবিধা ইউপি নেতারাও পেয়ে থাকেন। বতলাগাড়ি ইউপি চেয়ারম্যান তার উক্তির মাধ্যমে এটি স্বীকার করে বলেন যে 'ওয়ার্ড সভা হলো ইউপি সদস্য ও চেয়ারম্যানের সঙ্গে জনগণের একটি সংযোগের মাধ্যম'। ওয়ার্ড সভা ইউপি নেতাদের জনগণ, বিশেষ করে গরিবদের কাছ থেকে তথ্য পাওয়া ও তাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করার একটি চমৎকার সুযোগ। আমাদের সঙ্গে কথা বলেছে এমন বেশির ভাগ ইউপি নেতাই বলেছেন যে ওয়ার্ড সভা ও প্রাক/উন্মুক্ত বাজেট আলোচনার মতো ফোরামগুলো নেতা হিসেবে তাদের কাজের

গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া পেতে এবং এর ভিত্তিতে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সহায়তা করে। সবচেয়ে সাধারণ পর্যবেক্ষণ হলো সামাজিক জবাবদিহি ফোরামগুলো তাদের নির্বাচনী প্রতিজ্ঞা রাখতে না পারার কারণ কী তা ভোটারদের কাছে ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ দেয়, বিশেষ করে বিভিন্ন অপূর্ণ প্রতিজ্ঞার পেছনে বাজেট ঘাটতির ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে পারে। এই ধরনের যোগাযোগমূলক ব্যবস্থা নেতাদের এবং ভোটারদের মধ্যে অস্থিরতা কমায়। ইউপি নেতারাও কার্যকরী সিদ্ধান্ত প্রণয়নে প্রয়োজনীয় উপাদান পান এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো বাজেট প্রস্তুতির উপাদানের মাধ্যমে তাঁরা সুবিধা পেয়ে থাকেন। অনেক নেতা বলেন যে ইউপি বাজেটের বেশির ভাগ উপাদান আসে ওয়ার্ড সভা থেকে।

ইউপি নেতারা প্রাক বা উন্মুক্ত বাজেট আলোচনার মতো অন্যান্য সামাজিক জবাবদিহি ফোরাম থেকেও একই রকম কৌশলগত সুবিধা পেয়ে থাকেন। আগেই বলা হয়েছে, ইউএনও এবং উপজেলা চেয়ারম্যানও এসব অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন। আলোচনা-প্রক্রিয়ার সময় তাঁরা জানতে পারেন যে নির্দিষ্ট বড় অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলো শুধু স্থানীয় এলিটদের রাজনৈতিক বিবেচনায়ই হচ্ছে না, বরং এর পেছনে জনদাবিও রয়েছে। এসব তথ্য ইউপি নেতাদের বিশেষ অর্থ বরাদ্দ পেতে তাদের লবিংকে শক্তিশালী করে এবং উপজেলা পর্যায় থেকে কারিগরি সহায়তা পেতে সাহায্য করে, বিশেষ করে যেসব প্রকল্প অনেক ব্যয়বহুল এবং অনেক দিন ধরে ঝুলে আছে সেসব প্রকল্পের জন্য। উন্নয়ন বিষয়ে ব্যবহৃত শব্দ যেমন যৌথ উৎপাদনকে[৯] উন্মুক্ত বাজেট সহজতর করেছে, যদিও এমন কোনো প্রমাণাদি নেই যেখানে দেখা যায় যে ইউপি পর্যায়ে এসব যৌথ উৎপাদন প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ[১০] হয়েছে। এটা মূলত সরকারি কর্তৃপক্ষ ও ব্যক্তি বা নাগরিক কর্তৃক গৃহীত যৌথ উদ্যোগ। আমাদের গবেষণা ইউপিগুলোতে এই ধরনের যৌথ উৎপাদন হয়েছে উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশনে অগ্রাধিকার প্রকল্পগুলোর দর-কষাকষির মাধ্যমে। যখন কোনো ইউপি নেতা জনদাবিভিত্তিক কোনো প্রকল্পের জন্য বাজেটসংকটে ভোগেন তখন তিনি তা উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশনে পেশ করেন, যেন নাগরিকেরা তা বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারে (আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি এবং শ্রম দিয়ে)। যেমন খোকশাবাড়ি ইউনিয়নে নাগরিকদের সদয় অবদানের (অনেক মানুষের কাছ থেকে বাঁশ এবং আর্থিক সহায়তাও পাওয়া গিয়েছিল) মাধ্যমে একটি সেতু বানানো হয়েছিল।

ইউপি আইন ২০০৯-এর অনিচ্ছাকৃত প্রভাব

ইউপি শাসনব্যবস্থা প্রক্রিয়ায় ২০০৯ সালের ইউপি আইনের দুটি ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। এগুলো মূলত ভালো অর্থবহ নীতির পরিবর্তে অনিচ্ছাকৃত প্রভাব ফেলেছে। প্রথমত, এখানে অনাস্থা প্রস্তাবের বিধান রয়েছে। এই নীতিতে বলা আছে যে যদি ১২ জন সদস্যের মধ্যে ৯ জন কোনো বিষয়ে অনাস্থা প্রস্তাব আনে, তাহলে ইউপি চেয়ারম্যান কাজ করার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। বিধানটি অবশ্যই আনা হয়েছে যেন চেয়ারম্যানের যথেচ্ছ ব্যবহার ও সম্ভাব্য অপব্যবহার বন্ধ করা যায়। বাস্তবে এই আইনটি ইউপি সদস্যদের ইউপি চেয়ারম্যানের সঙ্গে অবৈধ বা অযথা সুবিধা আদায়ে দর-কষাকষি করতে সক্ষম করেছে। আমাদের গবেষণার একটি ইউনিয়নে দেখা গেছে, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির নিয়মের বাইরে যেখানে একজন ব্যক্তি ৩০ কেজি চাল পাওয়ার কথা সেখানে সদস্যরা এক ব্যক্তিকে ২৪ কেজি চাল দেওয়ার জন্য চেয়ারম্যানের কাছে দাবি জানান এবং বাদবাকি ছয় কেজি চাল অবৈধভাবে ইউপি সদস্যদের দিতে বলেন যেন পরে তা বাজারে বিক্রি করতে পারেন বা তাঁদের আত্মীয়-গোষ্ঠীর মধ্যে বণ্টন করে দিতে পারেন। সামষ্টিক চাপ এবং অনাস্থা প্রস্তাবের ভয়ে চেয়ারম্যানের এই দাবি মেনে না নিয়ে আর কোনো বিকল্প ছিল না। একইভাবে, ইউপি সদস্যরা রাজনৈতিকভাবে কৌশলগত স্থানে অবকাঠামো নির্মাণে চেয়ারম্যানকে চাপ দিয়েছেন। এলজিএসপি-সংক্রান্ত অর্থের ক্ষেত্রে সদস্যরা চেয়ারম্যানকে অনাস্থা প্রস্তাবের ভয় দেখিয়ে চাপ দিয়েছেন যেন তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। একজন ইউপি চেয়ারম্যান বলেন, ২০০৯ ইউপি আইন হওয়ার পর থেকে তিনি যা সহ্য করছেন তা ভালো আইন এবং নীতির অনিচ্ছাকৃত প্রভাব—'সরকার অবশ্যই জনগণের সুবিধার জন্য আইনটি প্রণয়ন করেছিল...কিন্তু মাঠ পর্যায়ে বাস্তবতা ভিন্ন।'

সরকারি পরিপত্রের ক্ষেত্রে একই রকম অনিচ্ছাকৃত প্রভাব পড়েছে। পরিপত্রে বলা আছে, যেকোনো প্রকল্পের জন্য কমিউনিটি থেকে বাছাইকৃত ব্যক্তিদের স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং ইউএনও কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। এটা অবশ্যই প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন বরাদ্দ-প্রক্রিয়ায় কমিউনিটির জ্ঞানটিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য করা হয়েছিল এবং ইউপির শাসনব্যবস্থা প্রক্রিয়া এবং কমিউনিটির কাছে ইউপির জবাবদিহির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে করা হয়েছিল। বাস্তবে যা ঘটে তা হলো ইউএনও চেয়ারম্যানকে এড়িয়ে স্থানীয় নেতাদের (ক্ষমতাসীন দলের) কাছে জিজ্ঞেস করে নাম পছন্দ করা হয়। আসলে ইউএনও স্থানীয় এমপির নির্দেশ অনুযায়ী স্থানীয় ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে নামগুলো তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন। তাই স্বচ্ছতা ও সামাজিক জবাবদিহি নিশ্চিতে ব্যর্থ হন এবং একটি অনিচ্ছাকৃত প্রভাব হিসেবে, এই নীতি ইউপি প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় এলিটদের নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করে ফেলে। আমরা যেসব ইউপি নেতাকে জিজ্ঞেস করেছি যে তাঁরা কাদের অন্তর্ভুক্ত করতেন, তখন তাঁরা বলেন যে তাঁদের বাছাই করার সুযোগ

থাকলে নেতৃত্ব গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তিদের স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করত। এটা সম্ভাব্যভাবে সময়ের আবর্তে ইউপি ব্যবস্থায় একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থার আশ্রয়স্থল খুলে দিতে পারত।

ইউপি আইন ২০০৯-এ নারীদের বেশি করে কমিটিগুলোতে অংশগ্রহণের বিধান আছে। এখানেও নারীদের বাছাই করার দায়িত্ব হলো ইউএনওর ওপর। ইউএনওর ওপর ক্ষমতাসীন দলের এলিটদের রাজনৈতিক প্রভাব মানে হলো নারীদের নাম বাছাই করা হবে রাজনৈতিক বিবেচনায়। ফলে যেসব নাম ইউপিতে পাঠানো হয় সেগুলো হয় স্থানীয় রাজনৈতিক এলিটদের স্ত্রী বা কমিউনিটির রাজনৈতিকভাব সুবিধা পাওয়া এলিট নারীরা। এসব নারী সাধারণত সার্বক্ষণিক গৃহবধূ। স্বাভাবিকভাবে ইউপি বিষয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণের খুব কম সময়ই তাঁদের আছে। কমিটিতে তাদের প্রকৃত ভূমিকা অনেকটা লোক দেখানো। এসব নারীকে কমিটিতে নিলে ইউপিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থা তৈরির ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটে। যদিও অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থা ছিল ইউপি আইন ২০০৯-এর মূল উদ্দেশ্য।

সামাজিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠানগুলো কি অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থা উন্নয়নে ইউপি নেতাদের প্রণোদনাকে পরিবর্তন করছে?

ইউপি পর্যায়ে সামাজিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠান ও নীতিগুলো কি অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থা উন্নয়নে ইউপি নেতাদের প্রণোদনাকে পরিবর্তন করছে? এ ক্ষেত্রে এনজিওগুলোর কি কোনো ভূমিকা আছে, থাকলে সেটা কী? আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে ইউপি নেতাদের ওয়ার্ড সভা বা উন্মুক্ত বাজেট আলোচনার মতো সামাজিক জবাবদিহি ফোরামগুলোকে সমর্থন করা এবং সক্রিয়ভাবে তাতে অংশগ্রহণ করার পেছনে কারণ রয়েছে। কিন্তু যে তিনটি ইউনিয়ন থেকে আমাদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, সেখানে দেখা যায় এসব ফোরামে অংশগ্রহণ করলে ইউপি নেতাদের লাভ ও লোকসান দুটোই হয়। রাজনৈতিক হিসাবের অংশ হিসেবে তারা লাভের চেয়ে লোকসানটা বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে।

সামাজিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে ইউপি নেতাদের লাভ হয়ে থাকে। ইউপি নেতাদের জন্য অনুমিত লোকসানগুলো হলো কর্মসক্ষমতা এবং অপূর্ণ নির্বাচনী প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে জনগণের তদন্তের মতো 'অপ্রয়োজনীয়' ঝামেলা; প্রকল্প বাছাই এবং উন্নয়ন বরাদ্দের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমঝোতা ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বিধান/নিরাপত্তাবেষ্টনী সম্পর্কিত সেবা প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি প্রকাশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য ঝুঁকি।[১১] মোটামুটি ইউপি নেতা এবং যেকোনো জনপ্রতিনিধিই জবাবদিহি

বাধ্যবাধকতার অধীনে যেতে অনিচ্ছুক, বিশেষ করে এসব সামাজিক জবাবদিহি ধরনের যেগুলো অনেক বেশি খোলামেলা এবং উচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছেও দুর্নীতি ধরা পড়তে পারে। এ ধরনের অনিচ্ছা তাদের প্রকৃত আচরণের এবং প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসক্ষমতায় প্রকাশ পায়। এগুলো নিচে আলোচনা করা হয়েছে।

সামাজিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠান/ফোরামগুলো সম্পর্কে প্রথম যে ব্যাপারটি মনে রাখা দরকার তা হলো তাদের কার্যত অকার্যকরী অবস্থা। ইউপি আইন ২০০৯ নাগরিকদের প্রতি ইউপির প্রত্যক্ষ জবাবদিহি এবং সাড়া প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র তৈরি করেছে। আমাদের গবেষণায় দেখা যায়, এসব প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিক ও আচারসর্বস্ব রয়ে গেছে। ওয়ার্ড সভা বা উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন ডাকা হয় আইনের আনুষ্ঠানিক নির্দেশ প্রতিপালন করার জন্য। আমাদের অনেক গরিব ও এলিট তথ্যদাতার মতে, এমন আইনের বাধ্যবাধকতা ছাড়া ইউপি নেতারা এই কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করতেন না। যদিও নাগরিকেরা, বিশেষ করে নারীরা, এসব কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছে, তবুও তারা অনেকটা আচারসর্বস্বভাবে কাজ করে। স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর মিটিং অনেক বেশি অনিয়মিত। যেহেতু রাজনৈতিক এলিটরা মূলত প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, অর্থ বরাদ্দ এবং বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, তাই স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো অনেক বেশি লোক দেখানো ভূমিকা পালন করে। এনজিও এবং এনজিও কর্তৃক সংঘবদ্ধ নাগরিক গ্রুপগুলোর চাপের মুখে কমিটি মিটিং হলেও সিদ্ধান্তগুলো খুব কমই বাস্তবায়ন হয়। আমাদের তথ্যদাতাদের (এলিট ও দরিদ্র উভয়ই) অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে যদি এনজিওগুলো কমিউনিটি ছেড়ে চলে যায় তাহলে এ ধরনের মিটিং অনুষ্ঠিতই হবে না এবং যদিও আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে হয় তাহলে এগুলো হবে অনেক বেশি প্রতীকী।

আমাদের গবেষণা ইউপিগুলোতে সামাজিক জবাবদিহি উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য (বা সীমাবদ্ধতা) হলো এগুলো গরিবদের শুধু নিরাপত্তাবেষ্টনী সংক্রান্ত ইউপি শাসনব্যবস্থা প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে। সম্পদ বরাদ্দ ও অবকাঠামো উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ-সংক্রান্ত শাসনব্যবস্থায় সামষ্টিক সামাজিক প্রহরী হিসেবে গরিব নাগরিকদের অংশগ্রহণ খুবই নগণ্য। ইউপি সদস্যরা রাজনৈতিক এলিটদের সঙ্গে সম্পদ বরাদ্দের জন্য আঁতাত/সহযোগিতা করে, যার ন্যূনতম আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক বাধা থাকে না, কারণ জবাবদিহি পদ্ধতি কার্যত অনুপস্থিত। সেটা হোক ওপর থেকে নিম্নমুখী আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহি (দলতন্ত্র এবং বহুলাংশে রাজনৈতিকীকৃত আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে ছাড় দেওয়া হয়ে থাকে) বা নিচ থেকে উর্ধ্বগামী সামাজিক জবাবদিহি (যেহেতু এনজিওগুলো খুব কমই গরিব নাগরিকদের এগুলোতে যুক্ত করে, তাই কার্যকরী নাগরিক সম্পৃক্ততা থাকে না)।

তিন ইউনিয়নের তুলনা

খোকশাবাড়ি ইউনিয়নের ইউপি সচিবের মন্তব্যে সামাজিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠানের অকার্যকর অবস্থা এবং এসব প্রতিষ্ঠানকে প্রতিপালন করার ক্ষেত্রে ইউপি নেতাদের প্রণোদনার অভাব স্পষ্টভাবে বোঝা যায় :

> ওয়ার্ড সভা পরিচালনা করে কী লাভ? ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা যা ইচ্ছা তাই করবে... [ওয়ার্ড সভায়] আমন্ত্রিত লোকজন কোনো মতৈক্যে পৌঁছাতে পারে না [নিরাপত্তাবেষ্টনী বরাদ্দের ব্যাপারে]। যেমন ধরুন ভিজিডি কার্ড। প্রত্যেক ইউনিয়নের ২০টি কার্ড পাওয়ার কথা। যখন কার্ড কারা পাবে সে বিষয়ে তালিকা তৈরির জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হলো [ওয়ার্ড সভায়], তারা ৫০টি নাম সুপারিশ করল...কোনো মতৈক্যেই পৌঁছা যাবে না...শেষ পর্যন্ত চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা প্রকৃত তালিকা প্রণয়ন করেছিল।

তার পর্যবেক্ষণটি এলিট নাগরিক, স্বভাব নেতা এবং অন্যান্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির শিক্ষিত নাগরিকদের সমন্বয়ে গঠিত আমাদের মূল তথ্যদাতাদের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়।

স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যত আচারসর্বস্ব/আনুষ্ঠানিক কাজের ধরন সম্পর্কে ইউপি সচিবের পর্যবেক্ষণটি নিম্নরূপ :

> যেহেতু স্ট্যান্ডিং কমিটি থাকা বাধ্যতামূলক, তাই আমাদের নামমাত্র এসব কমিটি রয়েছে। এগুলো সত্যিকার জনস্বার্থে কোনো কাজে আসে না...আমি ৬ বছর ধরে ইউপিতে কাজ করছি। সব মিলিয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটির ৬টি সভাও অনুষ্ঠিত হয়নি...আলাদাভাবে কোনো সভা হয় না (কমিটির)...কমিটির আলোচনাগুলো হয় ইউপির মাসিক সভার অংশ হিসেবে।

সামাজিক জবাবদিহি ফোরামে অংশগ্রহণের ধরন সম্পর্কে ইউপি সচিব বলেন :

> ধনী ও ক্ষমতাবান এলিটরা এগুলোতে আসেনই না। ইউপি নেতৃত্বের কাছে যেসব ব্যক্তি উপকারে আসেন বলে মনে হয় এবং যাঁরা মনে করেন তাঁদের আসা উচিত (নেতাদের প্রতি আনুগত্য দেখাতে) তাঁরাই আসছেন। তাঁরা আসেন তাঁদের নির্দিষ্ট স্বার্থের জন্য (সামষ্টিক স্বার্থের জন্য নয়)। এঁরা বেশির ভাগই দরিদ্র বা অতিদরিদ্র।

সচিব আরও বলেন যে ইউপি নেতারা আগেভাগে যাই পরিকল্পনা করুক না কেন (তালিকা প্রণয়ন, বরাদ্দের স্থান ইত্যাদি), তা এসব ফোরামে অনুমোদিত হয়ে যায়। এটি সারপুকুর ইউনিয়নের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সারপুকুরে আমাদের বেশির ভাগ মূল তথ্যদাতা সামাজিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়াগুলোকে আনুষ্ঠানিক আচারসর্বস্ব বলে চিহ্নিত করেছে। তাঁরা বলেন, ইউপি নেতাদের সামাজিক জবাবদিহি প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রণোদনা নেই বললেই চলে। ইউপি আইন ২০০৯ ভিত্তিক বিধি ও নীতি এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের অভাবের জন্য দায়ী। আগের ইউপি জবাবদিহি পদ্ধতিগুলোকে কমবেশি কাজে লাগাত, কিন্তু বর্তমান পরিষদ এটা করে না বললেই চলে। এসব ফোরামে ইউপি সদস্যদের অংশগ্রহণও অনেক কম। আমাদের একজন মূল তথ্যদাতার বর্ণনা শুনলে এসব ফোরামের ব্যবহারের পরিধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কায়দা মেনে নেওয়ার আচারসর্বস্ব প্রকৃতি বোঝা যাবে (এই তথ্যদাতা একজন স্বভাব নেতা এবং ১৩টি স্ট্যান্ডিং কমিটির মধ্যে একটির সদস্য) :

> এক বছর আগে আমার প্রতিবেশী ও একজন নারী ইউপি সদস্যের কাছ থেকে শুনলাম যে আমাকে স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য করা হয়েছে। আমি জানি যে আমি ট্যাক্স কমিটির সদস্য। এই পর্যন্ত আমাকে ৩ বার সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমাকে সাধারণত শেষ মুহূর্তে আমন্ত্রণ জানানো হয়, যখন সভায় অংশগ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে তিনটি সভার মধ্যে আমি একটিতে যোগ দিতে পেরেছিলাম। সভায় দেখলাম অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আলোচনা করার কোনো আগ্রহই নেই। আচারসর্বস্বভাবে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে দস্তখত নিয়ে সভা শেষ হয়ে গেল। যদিও আমি সভায় যোগ দিয়েছি একবার, কিন্তু অন্য সভার জন্যও (সম্ভবত মিথ্যা সাজানো সভা) সভার উপস্থিতি খাতায় দস্তখত করেছি। নারী ইউপি সদস্যরা আমার বাড়িতে এসে নিয়মিত দস্তখত সংগ্রহ করে।

আরেকজন কমিটি সদস্য বলেছেন তিনি আগের ইউপি পরিষদের সভায় দুবার যোগ দিয়েছিলেন। একবার তিনি গিয়েই চলে এসেছিলেন, কারণ আর কেউ সেখানে যাননি। আমাদের আরও দুজন তথ্যদাতা রয়েছেন যাঁরা সারপুকুরে স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য (একজন ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এবং অন্যজন অর্থ কমিটিতে)। তাঁরা নিজেদের নামেই কমিটির সদস্য ভাবেন, কারণ এই পর্যন্ত কখনোই তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তাঁদের দুজনকেই কেয়ারের SETU ও PRODUCE প্রকল্পের মাধ্যমে অ্যাডভোকেসি করায় কমিটিতে সদস্য করা হয়েছিল। এটা প্রমাণ করে স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় এনজিওগুলোকে কোন ধরনের এবং কী পরিমাণ রাজনৈতিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

ইউপি সদস্যদের অনিচ্ছা থেকেও বোঝা যায় যে তাঁরা সামাজিক জবাবদিহি ফোরামগুলোতে মানুষকে আমন্ত্রণ জানাতে উদ্যোগ নেন না। এনজিও কর্মকর্তারা এবং এনজিওর সঙ্গে সম্পৃক্ত (বিশেষ করে কেয়ারের কর্মসূচি) স্বভাব নেতারা আমন্ত্রণের কাজটি করেন। অন্য দুটি ইউপির একই অবস্থা। আমাদের মূল তথ্যদাতারা মনে করেন, ইউপি নেতারা উদ্যোগ নিলে ফোরামগুলোতে আরও বেশি মানুষ আসত।

অন্য দুই ইউপির তুলনায় বতলাগাড়ি ইউনিয়নে সামাজিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠানগুলো ভালো করছে। গণফোরামগুলোতে এগুলো বিশেষভাবে সত্যি (ওয়ার্ড সভা, প্রাক-বাজেট ও উন্মুক্ত বাজেট আলোচনা), কিন্তু স্ট্যান্ডিং কমিটির (যেগুলো রাজনৈতিক এলিট ও ইউপি চেয়ারম্যানের ছাড় দেওয়ার ধরনের ক্ষেত্রে কমিটির স্বাধীনতা বিচারে অন্য দুই ইউপির থেকে আলাদা নয়) তা সত্য নয়। যেমন যদিও বতলাগাড়িতে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর কাজের অবস্থা তুলনামূলক অন্য দুই ইউনিয়নের চেয়ে ভালো, তবুও এটাকে মধ্যম মানের বলা যায়। এই ইউনিয়নের ইউপি সচিবের

মতে, ১৩টি স্ট্যান্ডিং কমিটির মধ্যে ৭টি বর্তমানে কার্যকর। বতলাগাড়ি ইউপিতে গণসামাজিক জবাবদিহি ফোরামের সভা নিয়মিত বিরতিতে অনুষ্ঠিত হয় এবং এগুলোতে স্বভাব নেতারা, গরিব নাগরিক ও কিছু এলিটও সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়।

দুষ্ট ও শুভচক্র

ইউনিয়ন পরিষদের জোগানের দিকটি দেখলে ইউপি নেতার (ইউপি চেয়ারম্যান) গতিশীল ভূমিকাটি দেখা যায়। বতলাগাড়ি ইউপি সেবা প্রদান কর্মসক্ষমতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে অনেকটা ভিন্ন হওয়ার এটাও বড় কারণ। ইউপির সুনাম বজায় রাখার পেছনে চেয়ারম্যানের জোরালো প্রণোদনা রয়েছে। মূলত সরকার ও এনজিওসহ গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে তার ইউপিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দরিদ্রবান্ধব শাসনব্যবস্থার রোল মডেল হিসেবে দেখাতে চায়। তার অর্জনগুলো শুধু প্রতীকী বা ব্যক্তিগত নয় (রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যে মর্যাদা, অহমের সন্তুষ্টি), বস্তুগত ও রাজনৈতিকও বটে। সরকার ও এনজিওর কাছে সুনাম থাকায় বছরের পর বছর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা পেয়ে আসছে। এটা তার রাজনৈতিক মূলধনও বৃদ্ধি করেছে। আমাদের মূল তথ্যদাতাদের মতে, তার ভবিষ্যৎ নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। স্থানীয় ও বৃহত্তর রাজনৈতিক সমঝোতার নির্দিষ্ট ধরন ইউপি চেয়ারম্যানকে পেট্রন-ক্লায়েন্ট রাজনীতির দুর্বলীকরণ প্রভাব, আত্মীয়-গোষ্ঠীর রাজনীতি এবং সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী বরাদ্দের ক্ষেত্রে দুর্নীতি থেকে সামাজিক জবাবদিহির গণফোরামগুলোকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্র প্রদান করে (আমাদের মূল তথ্যদাতাদের মতে, বতলাগাড়িতে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কার্ড খুব কমই বিক্রি হয়।[১২] কিন্তু এই চর্চা অন্য দুই ইউপিতে ব্যাপকভাবে ঘটে)।

বতলাগাড়িতে পার্থক্য করে দেওয়া আরেকটি বিষয় হলো (জোগানের দিক থেকে) এই ইউপিতে ব্যাপক হারে এনজিও নেতৃত্বাধীন শাসনব্যবস্থা কার্যক্রম। আমাদের বেশির ভাগ মূল তথ্যদাতা, চেয়ারম্যানসহ সবাই বতলাগাড়িতে সামাজিক জবাবদিহি পদ্ধতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে এনজিওগুলোর (বিশেষ করে কেয়ার) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেন। এনজিওর ভূমিকা শুধু ইউপির ব্যবস্থাপনা/লজিস্টিক সহায়তায় সীমাবদ্ধ নয়। নাগরিকদের একত্র করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এনজিওগুলো নাগরিকদের নিচ থেকে উঠে আসা চাপগুলো তুলে ধরেছে। বতলাগাড়ি ইউপি সচিব বলেন, এই ইউপির শাসনব্যবস্থা ভালো হওয়ার কারণ হলো সামাজিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠান যেমন স্বভাব নেতাদের সমিতি, প্রতিবেশী উন্নয়ন কমিটি এবং গ্রাম উন্নয়ন কমিটি থেকে সত্যিকার চাপ থাকার পাশাপাশি এনজিওগুলোর চাপ। এনজিওর মূল অবদান হলো নাগরিকদের ইউনিয়ন পরিষদমুখী

করতে সংঘবদ্ধ করা। অন্য দুই ইউনিয়নে যেখানে নাগরিকেরা ইউপি সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় ও সমালোচনামুখর, বতলাগাড়িতে নাগরিকেরা তাদের সামষ্টিক জীবনে ইউপির ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে বেশ আশাবাদী। ইউপির সঙ্গে তাদের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ (এনজিওর প্রবল প্রচেষ্টায়) ইউপিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উপায়ে সেবা প্রদানে সর্বদা চাপে রেখেছে। এই ব্যাপারটি বতলাগাড়ি ইউপি সচিব বেশ জোর দিয়ে বলেন।

অন্যদিকে অন্য দুই ইউনিয়নে সামাজিক জবাবদিহি ফোরামগুলোতে উঠে আসা দাবিগুলোর প্রতি ইউপি নেতাদের নিষ্ক্রিয়তা ইউপির প্রতি মানুষের সমালোচনা ও অবিশ্বাস তৈরি করেছে। প্রতিজ্ঞা যা করা হতো তা পূরণ হতো না এবং ইউপি নেতাদের সততা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে রাগান্বিত ইউপি নেতারা (যেমন সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর কার্ড বিতরণে দুর্নীতি) তা নিরুৎসাহিত করত। নেতাদের এসব দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের এই ধরনের গণফোরামগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলেছে। এসব কারণে দেখা যায়, মানুষজন সামষ্টিক ফোরামকে এড়িয়ে ব্যক্তিবিশেষ ইউপি নেতাদের সঙ্গে সুবিধা আদায়ে আঁতাত গড়তে চায়। যেমন যখন মানুষ দেখত যে অবাস্তব নামের তালিকা করা হয়েছে ওয়ার্ড সভাতে, তখন তারা বুঝত যে কিছু নাম গোপনে বাদ পড়ে যাবে। এই ধারণার কারণে অনেকেই গোপনে ইউপি নেতাদের কাছে যায়, যেন তাদের নাম তালিকায় থাকে। তখন আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে নাম রাখা হয়। এসব গোপন লেনদেনের খবর মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়লে তারা সামাজিক জবাবদিহি ফোরাম সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে এবং এদের বৈধতাও নষ্ট হয়ে যায়। খোকশাবাড়ি ও সারপুকুর ইউনিয়নের মানুষ এভাবে প্রাতিষ্ঠানিক অদক্ষতার এক দুষ্টচক্রে আটকে পড়েছে এবং সততার অভাব আস্থার সংকট তৈরি করেছে, যা এসব প্রতিষ্ঠানের পতনকে ত্বরান্বিত করছে।

কিন্তু বতলাগাড়ি ইউপি এই দুষ্টচক্র থেকে রক্ষা পেয়েছে বলে মনে হয়। দক্ষ নেতৃত্ব, সুবিধাজনক এলিট রাজনৈতিক সমঝোতা, ইউপি ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে লাভজনক আঁতাত এবং উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি সময়ের জন্য সামাজিক জবাবদিহির অবকাঠামো তৈরি করতে ব্যাপক এনজিও হস্তক্ষেপ সম্ভবত এ ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। সৌভাগ্যজনক অবস্থা, নেতাদের রাজনৈতিক সুচিন্তা এবং বাইরের এজেন্সিগুলোর সহায়তায় সুস্থ সমন্বয় বতলাগাড়িতে একটি শুভচক্র তৈরি করেছে।

উপসংহারমূলক বিশ্লেষণ এবং নীতি সুপারিশ

নিচের টেবিলে সংক্ষেপে ইউপি নেতাদের প্রণোদনার রাজনৈতিক নির্ধারকগুলো এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক সমঝোতা, ক্লায়েন্টভিত্তিক জবাবদিহি এবং দরিদ্রবান্ধব শাসনব্যবস্থায় সামাজিক জবাবদিহি পদ্ধতির ওপর আগের অধ্যায়গুলোর আলোচনা দেওয়া হয়েছে।

টেবিল ৩ : রাজনৈতিক নির্ধারকসমূহ, ইউপি নেতাদের প্রণোদনার ধরন এবং দরিদ্রবান্ধব শাসনব্যবস্থা

রাজনৈতিক নির্ধারকসমূহ	ফলে ইউপি নেতাদের প্রণোদনা	দারিদ্র্যবান্ধব শাসনব্যবস্থায় প্রভাব
স্থানীয় এলিট রাজনৈতিক সমঝোতা	ইউপি নেতাদের স্থিতিশীল রাজনৈতিক সমঝোতা বজায় রাখার জোরালো আগ্রহ সব সংশ্লিষ্ট এলিট অ্যাক্টরদের প্রণোদনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ	● স্থিতিশীল পিএস ইউপি নেতাদের উপজেলা চেয়ারম্যান ও এমপির কাছ থেকে অধিক সম্পদ আহরণ নিশ্চিত করে। বেশি সম্পদ থাকলে গরিবদের সম্পদ পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় ● বেশি সম্পদ থাকলে ইউপি নেতারা নেতিবাচক স্থানীয় এলিট রাজনীতির প্রভাব থেকে সেবা প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াকে গরিবদের কাজে লাগাতে পারে ● স্থিতিশীল রাজনৈতিক সমঝোতা থাকলে সুষ্ঠু ও ন্যায্য উপায়ে দ্বন্দ্ব মেটানো যায়, যার মাধ্যমে গরিবদের ওপর কল্যাণমূলক প্রভাব পড়ে
বৃহত্তর এলিট রাজনৈতিক সমঝোতা	● যখন জাতীয় রাজনৈতিক অ্যাক্টরদের (মূলত এমপি) সঙ্গে ইউপি নেতৃত্বের রাজনৈতিক মিল থাকে তখন ইউপি নেতৃত্ব রাজনৈতিক এলিটদের ইউপির উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচিকে রাজনৈতিক এলিটদের হাতে দিয়ে দেয়। কিন্তু যদি তা না থাকে তাহলে ইউপি নেতারা উন্নয়ন কার্যক্রমকে সম্ভাবনাময়ভাবে বাহ্যিক রাজনৈতিক প্রভাব থেকে আলাদা করতে পারে। এটা ইউপি নেতাদের গরিবদের স্বার্থ অগ্রসরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রটি কাজে লাগানোর জন্য দরিদ্রবান্ধব প্রণোদনার ওপর নির্ভর করে (রাজনৈতিকভাবে এবং কমিউনিটিতে আদর্শগতভাবে লাভবান হওয়া এবং প্রশাসনের উচ্চ স্তর থেকে বেশি পরিমাণে সম্পদ নিশ্চিত করার প্রত্যাশার ভিত্তিতে)	● বৃহত্তর পর্যায়ে এলিট রাজনৈতিক সমঝোতার ক্ষেত্র রাজনৈতিক সাদৃশ্য দরিদ্রবান্ধব শাসনব্যবস্থাকে সহায়তা করে না ● ইউপি প্রতিষ্ঠানগুলোতে (স্ট্যান্ডিং কমিটি, উন্মুক্ত বাজেট ইত্যাদি) গরিবদের অংশগ্রহণের জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্র ক্ষমতাসীন দলের এলিটদের প্রভাবের কারণে হারিয়ে যেতে পারে ● এসব রাজনৈতিক ক্ষেত্র গরিবদের অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিক করার ক্ষেত্রে ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়, যদি নেতারা স্থানীয় এলিটদের থেকে স্বাধীন থাকতে পারে এবং দরিদ্রবান্ধব শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় প্রণোদনা

রাজনৈতিক নির্ধারকসমূহ	ফলে ইউপি নেতাদের প্রণোদনা	দরিদ্রবান্ধব শাসনব্যবস্থায় প্রভাব
অনানুষ্ঠানিক/ ক্লায়েন্টভিত্তিক জবাবদিহি	● এটা ইউপি নেতাদের তাঁদের বৈধতা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে আত্মীয়তা এবং অন্যান্য বংশ পরিচয়ভিত্তিক নির্বাচনী এলাকার ওপর নির্ভর করতে উৎসাহিত করে	● যেসব গরিব বংশপরিচয়ভিত্তিক পৃষ্ঠপোষকতা নেটওয়ার্কের অংশ নয় তাদের বঞ্চিত করা হয়। ● এটা বাইরের এজেন্সিগুলোর (এনজিও, নাগরিক সমাজ) জন্যও কর্মসূচিভিত্তিক রাজনীতি এবং নাগরিক হিসেবে গরিবদের অধিকারের দাবি আদায়ে গরিবদের সংঘবদ্ধ করাটা কঠিন করে ফেলে
সামাজিক জবাবদিহি ফোরামের সূচনা	● বাধা দেওয়া বা নষ্ট করার পরিবর্তে, ইউপি নেতাদের প্রণোদনা হলো সামাজিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠান ও ফোরামগুলোকে সহযোগিতা/প্রভাবিত করা, যা ফসল পাওয়া দিয়ে শুরু হয়। ● ইউপি নেতাদের এসব ফোরামকে কাজে লাগানোর আরেকটি অন্যতম প্রণোদনা হলো নির্দিষ্ট কৌশলগত সুবিধা আদায় (কেন নির্দিষ্ট কিছু প্রতিজ্ঞা পূরণ করা যায়নি তা ব্যাখ্যা করা, বাজেট সীমাবদ্ধতা, প্রকল্পের পেছনে গণদাবি দেখিয়ে সমর্থন আদায় করা, সহ-উৎপাদন ইত্যাদি)	● গরিব ও ইউপি নেতাদের মধ্যে তথ্যগত অসমতা দূর করা ● সামাজিক জবাবদিহি ফোরামগুলো প্রত্যক্ষভাবে নেতাদের দায়বদ্ধতা শুধরাতে ভূমিকা রাখে ● ওয়ার্ড সভার মতো ফোরামগুলো গরিব নাগরিকদের নাগরিক হিসেবে দাবি তোলা এবং অধিকার আদায়ে সহায়তা করে ● স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো গরিবদের ইউপি নীতি প্রক্রিয়ায় তাদের বক্তব্য তুলে ধরতে সম্ভাব্য ক্ষেত্র তৈরি করে ● নারীরা জেন্ডারবিষয়ক দাবি পেশ করতে পারে

সূত্র : লেখকদ্বয়

তিনটি ইউপিতে আমাদের গবেষণা ফলাফল অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নীতি পর্যবেক্ষণ ও বাংলাদেশের স্থানীয় শাসনব্যবস্থার ওপর একাডেমিক গবেষণার সঙ্গে বৃহত্তর ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা আগে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সমঝোতার ওপর কিছু কাজের কথা উল্লেখ করেছি। স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক বাধ্যবাধকতার ওপর করা গবেষণায় কীভাবে ক্লায়েন্টভিত্তিক রাজনীতি দরিদ্রদের সম্পদ বিতরণে স্থানীয় এলিট প্রণোদনা গঠন করে তার একই ঝোঁক দেখায়। কিছু গবেষণায় পাওয়া যায়,

কীভাবে স্থানীয় পর্যায়ে প্রকৃত এলিট বহুলাংশে স্থানীয় প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর শাসনব্যবস্থা প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে (CGS and BRAC RED 2006; Hossain and Osman, 2007; Hossain 2007; BDI, BRAC, NFPCSP 2009; Alim and Sulieman 2009; Ahmad 2007; MacLoughlin and Bately 2012)। নির্বাচনী পৃষ্ঠপোষকতা নেটওয়ার্কের বাইরে যোগ্য গরিবদের জন্য সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখা সামাজিক বাধ্যবাধকতাভিত্তিক জবাবদিহির ওপর গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণ অন্য গবেষণাতেও পাওয়া যায় :

প্রতিযোগিতামূলক ক্লায়েন্টভিত্তিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক এলিটদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থাকলেও মূলত পৃষ্ঠপোষকদের বাধ্যবাধকতাই (সামাজিক, প্রথাগত, নৈতিক) সীমিত জবাবদিহি নির্ধারণ করে, যা সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে গরিবেরা স্থানীয় রাজনৈতিক এলিটদের কাছ থেকে আদায় করতে সক্ষম (বিদ্যমান গবেষণার বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন (হোসেন ২০১২, পৃ.৩৪)। এই গবেষণায় বর্ণিত স্থানীয় ও বৃহত্তর এলিট-রাজনৈতিক সমঝোতার ধারণা অন্য আরেকটি পর্যায়ের (জাতীয় নীতি পর্যায়ের) এলিট-রাজনৈতিক সমঝোতার মধ্যে প্রোথিত। জাতীয় পর্যায়ের সমঝোতাটি দরিদ্রবান্ধব উন্নয়ন কৌশলের ওপর জাতীয় রাজনৈতিক এলিটদের স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি মতৈক্য। সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে এই এলিট সমঝোতার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

স্বৈরতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক উভয় প্রকার ধারাবাহিক সরকারগুলোই নীতি ও তৎপরবর্তী বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে নির্দিষ্টকৃত গরিবদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর ব্যবস্থার প্রতি প্রতিশ্রুত ছিল।

এই খাতের জোরালো নীতি ধারাবাহিকতা সব সরকারের আমলেই ছিল, যা অন্য খাতে দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে আগের সরকারের আমলে আসা কর্মসূচি শুধু অব্যাহতই রাখা নয় তা বাড়ানোও হয়েছে।

কিছু নীতিকে রাজনৈতিকভাবে খুবই সংবেদশীল মনে করা হয় এবং সব সরকারের জন্যই বৈধতার গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক মনে করা হয়। যেমন সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থার দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পাওয়া (হাসান ২০১২, পৃ.৩৩)।

জাতীয় পর্যায়ে এ ধরনের এলিট-রাজনৈতিক সমঝোতা গ্রামীণ এলাকায় সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী সম্পর্কিত কার্যাবলিতে ব্যাপক বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করেছে। ক্ষমতায় কোন ধরনের শাসকগোষ্ঠী রয়েছে তা বিবেচ্য বিষয় ছিল না। যা হোক, এই গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, জাতীয় পর্যায়ে দরিদ্রবান্ধব উন্নয়নে এলিট সমঝোতার প্রকৃত সফলতার (নীতি বাস্তবায়নে) অনুরূপ অদম্য দরিদ্রবান্ধব প্রতিশ্রুতি স্থানীয় পর্যায়ে ছিল না। এই গবেষণায় প্রমাণসহ দেখানো হয়েছে কেন

এমন জাতীয় পর্যায় এলিট প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় এলিটদের প্রণোদনাকে প্রভাবিত করতে পারে না। স্থানীয় রাজনৈতিক সমঝোতার কঠিন অবস্থা মানে হলো দরিদ্রবান্ধব উন্নয়ননীতি ও শাসনব্যবস্থা প্রক্রিয়ার প্রকৃত ধরন জাতীয় পর্যায়ের নীতি বাস্তবায়নকারী এলিটদের প্রত্যাশিত আদর্শ চেহারা থেকে অনিবার্যভাবে উল্লেখযোগ্য হারে বিচ্যুত হবে। স্পষ্টতই 'ব্যষ্টিক রাজনীতির' (ম্যাকলাফলিন ও বেটলি ২০১২) ধারণা প্রয়োজনীয়, যা সেবা প্রদান পর্যায়ে অ্যাক্টরদের প্রণোদনা নির্ধারণ করে (দেখুন টেবিল ৩ এবং পূর্ব আলোচনা)।

'ত্রুটিপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার' বিশ্লেষণী মাধ্যম দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, কীভাবে স্থানীয় ইউপি নেতাদের প্রণোদনা কাঠামো গঠিত হয় এবং দরিদ্রবান্ধব ও অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থার বিবর্তনে এর প্রভাব কী। 'কর্মসূচিভিত্তিক রাজনীতি' না থাকায় রাজনীতিবিদেরা (এখানে ইউপি নেতৃত্ব), যারা একটা প্রতিযোগিতামূলক ক্লায়েন্টভিত্তিক বিন্যাসে চলছে, তাদের জোরালো দাবিহীন ভোটারদের প্রতি বিশেষ করে বৃহৎ দরিদ্র গোষ্ঠীর প্রতি বিশ্বাসযোগ্য প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ক্ষেত্রে তুলানামূলক কম তাগিদ থাকে। মূল নির্বাচক, যারা ভোট ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করে তাদের বিশেষ সুবিধা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে তাদের আনুগত্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভোট নিশ্চিত করা হয়। ফলাফলে দেখা যায়, এটা ইউপি চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে বেশি সত্য এবং বিভিন্ন কারণে ইউপি সদস্যদের ক্ষেত্রে ততটা সত্য নয়।

রাজনীতিবিদ ও নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে তথ্যগত অসমতা থাকার ফলেও রাজনৈতিক বাজার ত্রুটিপূর্ণ বলা যায়। তথ্যগত অসমতার ক্ষেত্রে বৃহৎ দরিদ্র জনগোষ্ঠী এলিটদের চেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়ে। যদিও গরিবেরা কম জ্ঞাত থাকে। আমাদের গবেষণায় দেখা যায়, তারা এখন আগের চেয়ে তাদের ইউপি প্রতিনিধিদের কর্মসক্ষমতার ব্যাপারে বেশি জানে। এর মূল কারণ হলো নতুন তৈরি হওয়া সামাজিক জবাবদিহি ফোরামগুলো এবং বাহ্যিক এজেন্সিগুলোর (এনজিও) অ্যাডভোকেসি বাংলাদেশের গ্রামীণ শাসনব্যবস্থার চাহিদার দিকটি এখন বহুলাংশে 'হাত-ধরা নাগরিকদের' দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। গরিবদের জন্য যত কম তথ্যগত বৈষম্য থাকবে ততই তারা সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী বরাদ্দ প্রক্রিয়ায় শাসনব্যবস্থায় অর্ধবহভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে। এর মানে হলো বণ্টন-প্রক্রিয়ায় কম দুর্নীতি হবে। বতলাগাড়িতে এই রকম একটি প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। অন্য দুই ইউনিয়নে ক্লায়েন্টভিত্তিক রাজনীতির ব্যাপকতার মানে হলো সামাজিক জবাবদিহি অবকাঠামো এবং এনজিও নেতৃত্বাধীন সংঘবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার প্রভাব স্বচ্ছ, দরিদ্রবান্ধব, অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা প্রদানে ইউপি নেতৃত্বের প্রণোদনায় খুব সীমিত।

ভোটারদের মধ্যে সামাজিক বিভক্তি ও বিভাজনও ত্রুটিপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা তৈরি করে। আমাদের ইউপিগুলোতে কমিউনিটি বিভিন্ন পরিচয়ে বিভক্ত (আত্মীয়তা, আঞ্চলিকতা, স্থানিকতা) এবং ভোটের ধরন বহুলাংশে প্রাচীন আনুগত্যের দ্বারা প্রভাবিত। এই বিভক্তির ফলে ইউপি নেতারা খারাপ কাজ করলে শাস্তি দেওয়ার যে নির্বাচনী জবাবদিহি পদ্ধতি রয়েছে, তা দুর্বল করে ফেলেছে। ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক কর্মসক্ষমতার চেয়ে বংশগত বিষয়গুলোই নেতৃত্ব বিচারে গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হয়ে গেছে। ফলে, ভোটারদের বিভক্তি নেতাদের ভোটারদের পরিচয়ের ভিত্তিতে সম্পদ বণ্টনে রাজনৈতিক প্রণোদনা প্রদান করে।

নিচে টেবিল ৪-এ 'ত্রুটিপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার' দিক থেকে নির্বাচনী জবাবদিহির গতিপ্রকৃতি সংক্ষেপণ করা হয়েছে এবং নীতি ও কর্মসূচিমূলক কৌশল ও প্রভাব চিহ্নিত করা হয়েছে।

টেবিল ৪ : নির্বাচনী জবাবদিহির গতিপ্রকৃতি

রাজনৈতিক নির্ধারকসমূহ	এলিট নাগরিকেরা	দরিদ্র নাগরিকগণ	দরিদ্রবান্ধব শাসনব্যবস্থার প্রভাব
ইউপি নেতাদের করা প্রতিজ্ঞার বিশ্বাসযোগ্যতার মাত্রা	এলিটদের জন্য অনেক বেশি	দরিদ্রদের জন্য কম থেকে মাঝারি ● ইউপি চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে কম ● ইউপি সদস্যদের ক্ষেত্রে মাঝারি	বহুলাংশে নেতিবাচক : ● ইউপি শাসনব্যবস্থায় দরিদ্রদের অর্থবহ অংশগ্রহণ এগিয়ে নেওয়া/সহজ করার ক্ষেত্রে ইউপি নেতাদের প্রণোদনা কম
ইউপি নেতা ও ভোটারদের মধ্যে তথ্যগত অসমতার মাত্রা	কম	ইউপি চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে বেশি। ইউপি সদস্যদের ক্ষেত্রে মাঝারি	শাসনব্যবস্থার ওপর মিশ্র প্রভাব
ভোটার বিভক্তির ফলে যারা সুবিধা পায়	এলিটদের জন্য বেশি সুবিধা	যেসব গরিবের প্রভাবশালী পৃষ্ঠপোষক রয়েছে তাদের জন্য মাঝারি ধরনের সুবিধা। আর যেসব গরিবের কোনো পৃষ্ঠপোষক নেটওয়ার্ক নেই তাদের জন্য কম সুবিধা	শাসনব্যবস্থার ওপর মিশ্র প্রভাব

সূত্র : লেখকদ্বয়

টেবিল ৪-এ দেখা যায় যে ইউপি নেতাদের নির্বাচনী প্রতিজ্ঞাকে গরিবদের চেয়ে এলিটদের কাছে বেশি বিশ্বাসযোগ্য। এই পার্থক্যটি নির্বাচনী জবাবদিহির পরিপ্রেক্ষিতে উভয় অ্যাক্টরদেরই কৌশলগত গুরুত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যাবে। এই বিষয়ে আমাদের আলোচনা থেকে দেখা যায়, ইউপি নেতাদের এলিট ভোটব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রয়োজন এবং ইউপির উন্নয়ন কার্যক্রমের সুন্দর বাস্তবায়নের জন্যও এলিট মতৈক্য প্রয়োজন। যে জন্য এসব এলিটের কাছে করা প্রতিজ্ঞা ভাঙাটা বেশ অসম্ভব বলা যায়। অন্যদিকে, কোনো ধরনের জোরালো ভূমিকাহীন গরিব ভোটারদের ক্লায়েন্টভিত্তিক রাজনীতিতে কম গুরুত্বপূর্ণ ধরা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইউপি চেয়ারম্যান গরিবদের কাছ থেকে 'ব্লক' ভোট আদায়ে এলিটদের ওপর নির্ভর করতে পারে। তাই গরিবদের কাছে করা প্রতিজ্ঞা ভাঙাটা রাজনৈতিকভাবে বাস্তবসম্মত। এই ব্যাখ্যাটা সম্ভবত ইউপি চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য, যদিও ইউপি সদস্যদের ক্ষেত্রে ততটা প্রযোজ্য নয়। ইউপি সদস্যদের নির্বাচনী প্রতিজ্ঞার ব্যাপারে অনেক সংবেদনশীল হতে হয়, কারণ তারা কাজ করে বেশির ভাগ বস্তুগত সেবা নিয়ে (যেমন নিরাপত্তাবেষ্টনী)। গরিবেরা তাদের নির্বাচনী প্রতিজ্ঞা সব সময় মূল্যায়ন করতে পারে। এই নির্বাচনী হিসাব-নিকাশের কারণে ইউপি নেতাদের অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় প্রণোদনা কম। নেতাদের এই প্রণোদনা কাঠামোকে ধরে নিলে একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডভোকেসি কৌশল (এনজিওগুলোর জন্য) হতে পারে নীতি প্রণয়ন ও সম্পদ বরাদ্দ-প্রক্রিয়ায় ইউপি নেতা ও গরিবদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগকে উন্নত করা ও এগিয়ে নেওয়া।

এলিটদের ক্ষেত্রে তথ্যগত অসমতা এত বেশি নয়, কারণ তারা ইউপির তত্ত্বাবধানের সংশ্লিষ্ট আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যুক্ত। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো ইউপি নেতারা অনানুষ্ঠানিকভাবে এলিটদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। অন্যদিকে গরিবদের ইউপির তদারকি ব্যবস্থায় এই ধরনের কোনো আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ নেই এবং ইউপি নেতারাও তাদের অনানুষ্ঠানিক পরামর্শের জন্য আমন্ত্রণ করেন না বললেই চলে। তবে বলা চলে, নতুন আইন এবং এনজিও নেতৃত্বাধীন সংঘবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত সামাজিক জবাবদিহি পদ্ধতি কিছুটা তথ্যগত অসমতা কমিয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, গরিবেরা শুধু নীতি প্রণয়নের সময়ই কিছু বিষয় জোগান দিতে পারে (প্রাক ও উন্মুক্ত বাজেট আলোচনা), কিন্তু বাস্তবায়নের সময় আর সম্ভব হয় না। যে কারণে নেতাদের কর্মসক্ষমতার সঙ্গে সম্পৃক্ত তথ্য তাদের আওতার বাইরে থেকে যায়। আগেই বলা হয়েছে যে গরিবেরা আগের চেয়ে ইউপি সদস্যদের কর্মসক্ষমতার ব্যাপারে অনেক বেশি জ্ঞাত থাকে। তথ্যগত অসমতা ইউপির উন্নয়নমূলক কার্যাবলির সঙ্গে সম্পৃক্ত

তথ্য শিক্ষা যোগাযোগ (আইইসি) কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে দূর করা যেতে পারে (অথবা এখন যেখানে এই কর্মসূচি রয়েছে সেখানে এর মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে)। আইইসি শুধু নীতি প্রণয়ন ও সম্পদ বরাদ্দ-প্রক্রিয়াতেই আলোকপাত করলে চলবে না, তা বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়াতেও করতে হবে।

টেবিল ৩-এ দেখানো হয়েছে যে ভোটার বিভক্তি এলিট এবং দরিদ্রদের ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। মনে রাখতে হবে যে গরিবেরাও কিন্তু সবাই একইভাবে ভোগান্তির শিকার হয় না। যেসব গরিব এলিট নেটওয়ার্কের আওতায় থাকে তারা কম ভোগে, কিন্তু যারা এসব কোনো নেটওয়ার্কের মধ্যে নেই তাদেরই বেশি ভোগান্তি সহ্য করতে হয়। এর কিছুটা সমাধান করা সম্ভব যদি ক্লায়েন্টভিত্তিক রাজনীতির ধরন রূপান্তর করা যায়। এ ধরনের রূপান্তর সম্ভবত দীর্ঘমেয়াদে ঘটবে যখন দেশের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। কিন্তু অন্তর্বর্তী এই সময়ে কর্মসূচিভিত্তিক রাজনীতির মাধ্যমে ক্লায়েন্টভিত্তিক রাজনীতিকে, কমপক্ষে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে, দমিয়ে রাখতে স্বল্প বা মধ্যমেয়াদি কৌশল নিতে হবে।

সবচেয়ে কঠিন এবং কৌশলী বিষয় হলো কীভাবে বৃহত্তর রাজনৈতিক সমঝোতাকে দেখা হবে। এখানে জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ের রাজনৈতিক অ্যাক্টররা এবং রাষ্ট্র-সমাজ সম্পর্কযুক্ত। রাষ্ট্র-সমাজ সম্পর্কটা মূলত দলীয় রাজনীতির ওপর নির্ভরশীল। উন্নয়ন এনজিওগুলোর জন্য এই বৃহত্তর রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা ক্ষেত্রটি নীতি ক্ষেত্রে মারাত্মক উভয়সংকট তৈরি করে। এই গবেষণায় দেখা যায়, একদিকে ইউপি নেতাদের প্রণোদনাকে দরিদ্রবান্ধব করতে হলে যেকোনো কৌশলকেই বৃহত্তর রাজনৈতিক সমঝোতাটা বুঝতে হবে। বাহ্যিক অ্যাক্টর হিসেবে এনজিওগুলোকে ইউপি নেতাদের জন্য একটি রাজনৈতিক ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে, যেন নেতারা এই সমঝোতার মধ্যে প্রভাব ফেলার সামর্থ্য অর্জন করতে পারেন। এই সামর্থ্য ইউপি নেতাদের সেবা প্রদান ব্যবস্থাপনায় স্থানীয়/জাতীয় রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব এড়াতে সহায়তা করবে, যা সম্পূর্ণ দলীয় বিবেচনায় হবে না। অন্যদিকে, এনজিওগুলোর এসব কাজ তাদের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে ফেলে দেবে এবং সম্ভবত 'রাজনৈতিক সমাজের' নৈতিকভাবে অস্পষ্ট ও নোংরা রাজনীতিতে গভীরভাবে যুক্ত করে ফেলবে (করব্রিজ ও অন্যান্য ২০০৫)। বাস্তবে, এনজিওগুলো এসব রাজনীতি এড়িয়ে চলে এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক সমাজের ক্লায়েন্টভিত্তিক রাজনীতিতে কৌশলগত সহাবস্থান করতে চায়। এসব কৌশল যদিও স্বল্পমেয়াদে গরিবদের সংঘবদ্ধ করতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এনজিওগুলো গরিবদের জন্য এমন স্থায়ী রাজনৈতিক ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে না, যার ভিত্তিতে গরিব নাগরিকেরা স্বাধীন সামষ্টিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

প্রত্যাশিত ব্যাপারটি হলো, রাজনৈতিকভাবে অর্থবহ এনজিও কৌশল মানে হলো গ্রামীণ সমাজে কর্মসূচিভিত্তিক রাজনীতি সৃষ্টি করার জন্য সামাজিক ভিত্তি তৈরি করার উদ্দেশ্যে গরিব নাগরিকদের সংঘবদ্ধ করা (এভাবে ত্রুটিপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রভাব কমানো)। এই ধরনের 'বড়' রূপান্তরিত রাজনীতি সম্ভবত বাস্তবে তৈরি করা কঠিন। এনজিও, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর এ ধরনের প্রয়োজনীয় বিশেষ ক্ষমতা মনে হয় নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সম্প্রতি এনজিওগুলো যেসব সামাজিক জবাবদিহি কৌশল নিচ্ছে, কর্মসূচিভিত্তিক রাজনীতির মৌলিক ভিত্তি তৈরির ক্ষেত্রে তার কার্যকর প্রভাব রয়েছে। যেমন তথ্যগত অসমতা কমিয়েছে এবং গরিব নাগরিকদের সামষ্টিক ব্যবস্থা প্রতিপালন করা হচ্ছে, যা শুধু গরিবদের সামষ্টিক দাবি প্রকাশেই সাহায্য করছে না, বরং বংশগত ধরনের ভিত্তিতে গরিবদের সামাজিক বিভক্তিগুলোর মধ্যে সংঘবদ্ধ করছে। এমন 'ছোট', বর্ধমান ও কম বিবদমান রূপান্তরিত রাজনীতি রাজনৈতিক এলিটদের ভীতিগ্রস্ত না করে অনুসরণ করা যেতে পারে। গরিবদের জন্য রূপান্তরমূলক রাজনীতি অনুসরণের এমন স্বল্প সংস্কার কৌশল পজিটিভ-সাম হবে (ইতিবাচক ফলাফল নিয়ে আসবে)। এর দুটি কারণ : প্রথমত, স্বল্প সংস্কার কৌশলের লক্ষ্য থাকে গরিবদের জন্য আকাঙ্ক্ষিত সেবাপ্রাপ্তি, যা গরিবদের সামষ্টিক ব্যবস্থায় যুক্ত হতে প্রণোদনা সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত, এই কৌশল গরিবদের মধ্যে নাগরিকত্বের মূল্যবোধ সৃষ্টি করে (অধিকারের ভিত্তিতে সম্পদপ্রাপ্তির প্রণোদনা)। দীর্ঘমেয়াদে এগুলো রাজনীতির ধরনে উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটাবে।

অনুবাদ : খলিলউল্লাহ্

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. এই প্রবন্ধটি কেয়ার বাংলাদেশের জন্য গবেষণা প্রতিবেদন আকারে প্রণয়ন করা হয়েছিল। সেটিকেই লেখকদ্বয় প্রবন্ধ আকারে *প্রতিচিন্তার* জন্য প্রস্তুত করেছেন।

২. প্রণোদনা বলতে 'মানুষ তার নিজের বা অন্যের কাজের জন্য যে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হয়' তা বোঝায় (Ostrom 2002, cited in Mcloughlin and Bately 2012, p. 6)

৩. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যখন 'রাজনৈতিক দলগুলো আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে একচেটিয়াকরণ করে ফেলে এবং সমাজকে দলীয় বিচারে রাজনৈতিকীকরণ করে', তখন এটাকে দলতন্ত্র (partyarchy) বলে (কপেজ ১৯৯৪, পৃ.১৯)। বাংলাদেশে দলতন্ত্রের বিস্তৃত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, হাসান (২০১২)।

৪. গ্রাম্য আদালত ইউনিয়ন পরিষদভিত্তিক একটি সীমিত এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত; সালিশি পরিষদ শুধু পারিবারিক আইন নিয়ে বিচারকাজ করে।

৫. অনানুষ্ঠানিক কমিউনিটি/গ্রাম পর্যায়ের মধ্যস্থতা।

৬. ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সামাজিক নেটওয়ার্ক ও যোগাযোগ।

৭. কোনো নেটওয়ার্কের বাইরে বা বিরোধী এলিটদের নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত এবং অধিবাসী, এমন একজন বলেন, 'আমি বর্তমান নেতাকে ভোট দিইনি তাই আমি কিছু পাই না'।

৮. এ ক্ষেত্রে একজন চেয়ারম্যান তাঁর কঠিন অবস্থার কথা জানান এভাবে : 'সাত দিনের মধ্যে আমাদের একটি পূর্ণাঙ্গ ভিজিডি কার্ডের তালিকা দরকার, দলীয় লোকেরা বলছেন যে তাদের পছন্দের লোকদের রাখতে হবে...এমনকি বিরোধী দলও এটার অংশ...আমি তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারি না'।

৯. 'সরকারি প্রতিনিধিদের' উন্নয়ন বরাদ্দের ওপর প্রভাব বোঝা যায় এটা থেকেই যে বতলাগাড়ি ইউপি এ বছর মোট ১৯ টন গমের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতাদেরই দিয়েছে ৩ টন (টিআর কর্মসূচির সঙ্গে সম্পর্কিত, ইউপি সচিবের মতে)। ইউপি ও রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য থাকায় বতলাগাড়ি ইউনিয়নের একটা সুনাম রয়েছে। এতেই বোঝা যায় অন্য দুই ইউপিতে কী অবস্থা যেখানে এলিট-রাজনৈতিক সমঝোতা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ন্ত্রণে।

১০. 'যৌথ উৎপাদন হলো সেবার ক্ষেত্রে সরকারি এজেন্ট ও ব্যক্তিগত নাগরিক উভয়েরই যৌথ ও প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা' (Macloughlin and Bately 2012, p. 42)

১১. সরকারি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত যৌথ উৎপাদন হয় রাষ্ট্রীয় এজেন্সিগুলো এবং নাগরিকদের সংগঠিত সামাজিক গ্রুপগুলোর মধ্যে নিয়মিত, দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের মাধ্যমে, যেখানে উভয়ই উল্লেখযোগ্য সম্পদ প্রদান করে।

১২. এলিট এবং দরিদ্র উভয় শ্রেণির তথ্যদাতারাই বলেন যে ইউপি নেতারা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতিতে যুক্ত হয়—বিশেষ করে ভিজিডি ও ভিজিএফ কার্ড বিক্রি করা এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প থেকে উল্লেখযোগ্য 'কমিশন' আদায় করা।

গ্রন্থপঞ্জি

Ahmad, S. (2007), *Social Safety Nets in Bangladesh,* World Bank, Dhaka

Alim, A and Sulaiman, M. (2009), *Polli Shomaj and 100-day Employment Generation Programme: Measuring the Targeting Effectiveness in Beneficiary Selection*, BRAC RED

BDI, BRAC and NFPCSP. (2009), *Study on the First Phase of the 100-Day Employment Generation Program,* Dhaka, www.bracdevelopmentinstutute.org/publications

CGS and BRAC RED. (2006), *The State of Governance in Bangladesh*, BRAC University

Coppedge, M. (1993),*Strong Parties and Lame Ducks*, Stanford University Press, Stanford, California

Corbridge, S., Williams, G., Srivastava, S. and Veron, R. (2005) .*Seeing the State: Governance and Governmentality in India*. Cambridge

Di John, J. and Putzel, J. (2009), 'Political Settlements Issues Paper', June, Governance and Social Development Resource Centre (GSDRC), International Development Department, University of Birmingham, http://www.gsdrc.org/docs/open/EIRS7.pdf.

Frankl, E. (2004) 'Quotas and Empowerment: The Use of Reserved Seats in Union Parishad as an Instrument for Women's Political Empowerment in Bangladesh', *Working Paper Series* No. 4*,* Department of Political Science, University of Stockholm, www.statsvet.su.se/quotas

Hassan, M. (2012), Dynamics of Political Settlements in a Semi Mature Limited Access Order

The Case of Bangladesh, Draft (forthcoming as an ESID working paper from University of Manchester)

Hinton, R. (2010) Promoting Inclusive Governance in Bangladesh: Empowering the Extreme Poor, CARE-Bangladesh

Hossain, N. (2007), The Politics of What Works: the Case of the Vulnerable Group Development Programme in Bangladesh, *CPRC Working Paper 92*, BRAC

Hossain, N. and Osman, F. (2007), *Politics and Governance in the Social Sectors in Bangladesh, 1991-2006*, RED, BRAC

Khan, M. (2010) 'Political Settlements and the Governance of Growth-Enhancing Institutions'.Mimeo.

Khan, M. R. and Ara, F. (2006) 'Women, Participation and Empowerment in Local Government: The Bangladesh Union Parishad Perspective', *Asian Affairs*, Vol. 29, No. 1, pp. 73-92.

Khan, Z. R. and Mohsin, A. (2008) 'Women's Empowerment through Local Governance: Emerging Issues and Debates', paper presented at Pathways of Women's Empowerment Research Programme Consortium Mid Term Review Conference, Cairo, 20-24 January. www.parthways-of-empowerment.org

Mansbridge, J. (1999) 'Should Blacks represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent "Yes"', *The Journal of Politics*, Vol. 61, No. 3, pp. 628-57.

McLoughlin, C. and Bately, R. (2012) The Politics of What Works in Service Delivery: An Evidence-based Review, *Effective States and Inclusive Development research center (ESID) Working Paper 6*, University of Manchester, http://www.effectivestates.org/_assets/documents/esid_wp_06_mcloughlin-bately.pdf

Nazneen, S. and Tasneem, S., 2010, 'A Silver Lining: Women in Reserved Seats in Local Government in Bangladesh,' *IDS Bulletin,* Vol 41, no 5, pp 35-42

Nazneen, S. And Mahmud, S. (2012) 'Gendered Politics of Securing Inclusive Development', *Effective States and Inclusive Development*

Research Centre (ESID) Working Paper No. 13, University of Manchester.

http://www.effective-states.org/_assets/documents/esid_wp_13_nazneen-mahmud.pdf

Nazneen, S., Ehsan, I., and Hasan, B. (Forthcoming), 'Exceptional Women?: Reserved Councillors in Municipal Corporations in Bangladesh,' in M. Tadros, ed., *Negotiating Women's Pathways of Political Power*, Zed Books: London

শিক্ষা

দারিদ্র্য দূরীকরণে শিক্ষাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ

এম এম আকাশ

সারসংক্ষেপ

শিক্ষা ও দারিদ্র্যের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বিরাজমান। প্রজন্মের পর প্রজন্ম দরিদ্র জনগোষ্ঠী কি অশিক্ষিতই থাকবে? দারিদ্র্য দূর করার জন্য চাই শিক্ষা। এই প্রবন্ধে বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে আর্থিক ও মানসিক দারিদ্র্য দূর করার জন্য আনুষ্ঠানিক বা অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রকৃত ফলপ্রসূ সম্মিলন প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষাপরবর্তী স্তরে মানসম্মত কারিগরি শিক্ষার প্রচলন ও সমন্বয় সম্ভব হলে দেশকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা সম্ভব। বিশ্বায়ন এই ক্ষেত্রে বিশাল সুবিধা হিসেবে কাজ করার কথা থাকলেও, নানা কাঠামোগত বাধার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে উপযুক্ত কাজ এবং উপযুক্ত শ্রমিক একে অপরের নাগাল না পাওয়ায় তৈরি হচ্ছে একধরনের প্যারাডক্স বা কূটাভাসের। এই সমস্যা সমাধানের পথগুলো এই প্রবন্ধে খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে, দেশীয় ধনিকদের হাতে প্রচুর সম্পদ থাকলেও তা উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ হচ্ছে না। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে মানব উন্নয়নে জোর দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে পূর্ব এশিয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগাতে হবে। যেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, শিক্ষা খাতে বর্ধিত বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদে কীভাবে রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নে সুফল বয়ে আনতে পারে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

শিক্ষা, দারিদ্র্য, অর্থনীতি, বিপ্লব, বিশ্বায়ন, মধ্য আয়, সমাজতন্ত্র, বিনিয়োগ।

ভূমিকা

দারিদ্র্যের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক বিপরীতধর্মী ও দ্বান্দ্বিক। সাধারণভাবে চারদিকে তাকালেই এর সত্যতা চোখে পড়ে। আমরা দেখতে পাই, যে মানুষেরা দরিদ্র তারা অধিকাংশই হয় নিরক্ষর না হয় স্বল্পশিক্ষিত। শিক্ষা যত কম দারিদ্র্য তত বেশি। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে আমরা স্বল্পশিক্ষিত কিছু ধনী লোককেও দেখতে পাব, যারা

দরিদ্র নয়। কিন্তু তাদের এই প্রাচুর্যের পেছনেও তাদের কোনো না কোনো মানসিক শিক্ষা সক্রিয় ছিল। হাবাগোবা বা মানসিকভাবে দরিদ্র মানুষ উত্তরাধিকারী সূত্রে বা লটারির মাধ্যমে ধনী হতে পারে কিন্তু সেটা ব্যতিক্রম নিয়ম নয়। আবার এসব ব্যতিক্রমী অশিক্ষিত ধনী সমাজের জন্য সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি বয়ে আনে। তাই শিক্ষা বলতে আমি এই প্রবন্ধে শুধু স্কুল-কলেজের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বোঝাচ্ছি না। বোঝাচ্ছি প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের বিদ্যাশিক্ষা। এর জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কোনো আবশ্যকীয় শর্ত নয়, যথেষ্ট শর্তও নয়। একজন মুখস্থ করে এম এ পাস করলেন, কিন্তু ওই বিদ্যা কাজে লাগাতে তিনি অক্ষম, তাহলে তাঁর শিক্ষা বৃথা গেল। তিনি শিক্ষিত বেকার ও সমাজের জন্য বোঝা হয়েই থাকবেন। আরেকজন বিদ্যালয়ে কোনো দিন গেলেন না কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতার পাঠ নিয়ে সফলতার সঙ্গে সমাজে অবদান রাখছেন, তাঁকে আমি অশিক্ষিত বলব কি? সুতরাং আনুষ্ঠানিক শিক্ষাসহ বা ছাড়া দুইভাবেই মানুষ 'শিক্ষিত' হতে পারে, সমাজে অবদান রাখতে পারে। সাধারণভাবে এই প্রবন্ধে দাবি করা হচ্ছে যে আর্থিক দারিদ্র্য ও মানসিক দারিদ্র্য ঘোচানোর জন্য আমাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা কোনো না কোনো ধরনের প্রকৃত ফলপ্রসূ শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

শিক্ষা ও দারিদ্র্যের সম্পর্ক

প্রবন্ধের শিরোনামে প্রস্তাব করা হয়েছে 'দারিদ্র্যকে দূর করার জন্য শিক্ষাই হোক প্রধান বিনিয়োগ'। এই প্রস্তাবের তাৎপর্য বিশ্লেষণের জন্য প্রথমে নজর দিচ্ছি অনুমাত্রিক স্তরে ব্যক্তির আর্থিক ও শিক্ষা বিকাশের প্রক্রিয়ার ওপর। আমরা সবাই একসময় শিশু ছিলাম। তখন আমাদের শারীরিক ক্ষমতা ও মানসিক ক্ষমতা ছিল সংকুচিত। পিতা-মাতা আমাদের যে পরিমাণ পুষ্টি ও শিক্ষা দিয়েছেন আমরা সে পরিমাণে আমাদের শরীর ও মস্তিষ্কের বিকাশ সাধন করতে সক্ষম হয়েছি। পিতা-মাতা যে মাত্রায় আমাদের আনুষ্ঠানিক ও অ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন সে মাত্রায় আমরা একেকজন শিক্ষিত মানুষ হয়ে গড়ে উঠেছি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রথম এবং প্রধান বাধা ছিল আমাদের অভিভাবকদেরই নিজস্ব দারিদ্র্য এবং শিক্ষার অভাব। অশিক্ষিত ও দরিদ্র বাবা-মায়ের রোজগার কম ও শিক্ষাও কম এবং নিজের সন্তানদের উপযুক্ত ভরণপোষণও তাঁদের পক্ষে তাই অসম্ভব। তাই মা-বাবার অশিক্ষা ও দারিদ্র্য থেকেই সন্তানের অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের প্রাথমিক উদ্ভব ঘটে থাকে। আমরা দেখি দরিদ্রের সন্তান অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষাবঞ্চিত হন, তাদের আয়-উপার্জনও কম হয়, ফলে তাঁরা দরিদ্রই থেকে যান। আবার এ দরিদ্র ছেলে বা মেয়েরাও দরিদ্রই থেকে যায়। এই অর্থে অশিক্ষা ও দারিদ্র্য পরস্পর পরিপূরক

এবং তা অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের ফাঁদের মধ্যেই প্রজন্মের পর প্রজন্মকে আবদ্ধ করে রাখে। এটা আমরা পারিবারিক ব্যক্তি পর্যায়ের অসংখ্য অভিজ্ঞতার মধ্যেই প্রতিফলিত হতে দেখি। গুনার মিরডালের দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর চক্র তত্ত্ব এ ধরনের বাস্তবতার ভিত্তিতেই নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের অনুধাবন করতে হবে যে দারিদ্র্য ও অশিক্ষার এই মেলবন্ধন ভাঙতে না পারলে আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম দরিদ্র ও অশিক্ষিতই থেকে যাব। তাই এই বিষয়ে গভীর মনোযোগ দিতে হবে।

এই নিষ্ঠুর চক্র থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। দুভাবেই হতে পারে। কখনো কখনো কেউ আগে দারিদ্র্যমুক্ত হয়ে পরবর্তী সময়ে শিক্ষা অর্জন করে শিক্ষিত হতে পারেন। আবার কেউ প্রথমে শিক্ষিত হয়ে উচ্চতর উপার্জনক্ষমতা অর্জন করে দারিদ্র্যমুক্ত হতে পারেন। দুই-ই যে সম্ভব তার উদাহরণ আমাদের সমাজে আছে।

বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে দুটি অনুমাত্রিক দৃষ্টান্ত

আমি আমার নিজের জীবনের একটি অভিজ্ঞতা বলতে পারি। আমার বাসায় এক দরিদ্র বালক পাচক হিসেবে ঢুকেছিল। আমার মা প্রতি সন্ধ্যায় তাকে অক্ষরজ্ঞান দিতেন এবং ক্রমে ক্রমে সে নাম লিখতে, খবরের কাগজ পড়তে এবং চিঠি লিখতে শিখে গেল। এভাবে প্রাথমিক বিদ্যার্জন তার দরিদ্র অবস্থাতেই সম্ভব হলো। কিন্তু আরও বাড়তি লেখাপড়ায় তার কোনো আগ্রহ ছিল না। তবে সে প্রবল উৎসাহে আমার মায়ের কাছ থেকে বিশেষ এক বিদ্যা হিসেবে রান্না শিখতে শুরু করে। এভাবে একদিন সে পাকা বাবুর্চিতে পরিণত হলো। পরে যখন সে বিয়ে করল তখন সে একটি হোটেলে বাবুর্চির চাকরি নিয়ে চলে যায়। আরও বহুদিন পর মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমি একদিন হঠাৎ তার ফোন পেলাম। সে সেখানে এখন একজন ধনাঢ্য বাবুর্চির পেশায় কাজ করছে। এটা কোনো অলীক গল্প নয়, এ অত্যন্ত বাস্তব সত্য ঘটনা। আমার এই অনুমাত্রিক উদাহরণ উপস্থাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি বৃহৎ সত্যের প্রতিষ্ঠা, তা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে বিশেষ পেশাগত শিক্ষার মিলন (এ ক্ষেত্রে বাবুর্চিবিদ্যা!) সম্ভব হলে একটি দেশের দরিদ্র জনগণকে দ্রুত দারিদ্র্যমুক্ত করা সম্ভব।

আধুনিক বিশ্বায়নের ফলে মানুষের অবাধ গতি বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে পুঁজি ও পণ্যের পাশাপাশি শ্রমেরও আদান-প্রদান বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা যদি আরও অবাধ হতো, সত্য সত্যই যদি আমরা একটি ভিসামুক্ত পৃথিবী পেতাম তাহলে জনসংখ্যা কোথাও কোনো সমস্যা হিসেবে বিরাজ করত না। জনাকীর্ণ দেশ থেকে জনহীন

দেশে সহজেই বহির্গমন সম্ভব হতো। পুঁজিঘন দেশ থেকে শ্রমঘন দেশে পুঁজি যেমন অবাধে চলে আসছে, তেমনি শ্রমঘন দেশ থেকে শ্রমও অবাধে পুঁজিঘন দেশে চলে যেত। ফলে উভয়েরই লাভ হতো—অব্যবহৃত পুঁজি ও অলস শ্রম উভয়ই ফলপ্রসূভাবে ব্যবহারের সুযোগ মিলত। কিন্তু বিষয়টি এত সহজ নয়। বিশ্বায়নের ফলে এই স্বতঃস্ফূর্ত সমাধানের পথে অনেকগুলো কাঠামোগত বাধা বর্তমানে গড়ে উঠছে। যেমন :

১. জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে শ্রম-পণ্য-পুঁজির গতিবিধির অবাধ নিয়মগুলো সুষম নয়। পুঁজি ও পণ্য যত অবাধে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আসতে পারে, শ্রম তত অবাধে উন্নত দেশগুলোতে প্রবেশ করতে পারে না।

২. প্রযুক্তি, পুঁজি ও জ্ঞানের অসম বিকাশের কারণে সব পুঁজি বা সব মানুষ সব জায়গায় সমানভাবে খাপ খাওয়াতেও পারে না। যেমন অতীতে অটোমেটিক তাঁত ভারতবর্ষে যখন ইংল্যান্ড থেকে রপ্তানি শুরু করেছিল বা অটোমেটিক তাঁতটাই ভারতে আমদানি হয়েছিল তখন অসংখ্য ভারতীয় তাঁতি প্রতিযোগিতায় হেরে যান ও মৃত্যুবরণ করেন। মার্ক্সের ভাষায়, 'ভারতীয় তাঁতির হাড়গোড়ের ওপর ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।' আবার বর্তমানে উল্টোদিক থেকে আমাদের অশিক্ষিত লোকেরা যখন ইংল্যান্ড যাচ্ছেন তখনো সেখানে সবচেয়ে নিচু কাজগুলোই তাঁদের ভাগ্যে জুটছে! তাই অসম সম্পর্কের ফাঁদের কারণে বিশ্বায়নের প্রকৃত সুফল সুষমভাবে বণ্টিত হচ্ছে না।

তাহলে আমাদের উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেওয়ার উপায় কী? এ কথা সত্য যে আপেক্ষিকভাবে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা যত দিন বেকার থাকবে তত দিন তাদের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি অসম্ভব। সুতরাং, তাদের জন্য উপযুক্ত কাজ সৃষ্টিই দারিদ্র্য থেকে মুক্তির প্রাথমিক পূর্বশর্ত। এটা দুভাবে হতে পারে। এক. যদি পুঁজি ও প্রযুক্তি তাদের নাগালে পৌঁছে দেওয়া যায় অথবা দুই. যদি পুঁজি ও প্রযুক্তির কাছে তাদের পৌঁছে দেওয়া যায়। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, পুঁজি ও প্রযুক্তির বিকাশ যদি উঁচুতে থাকে তাহলে তার সঙ্গে নিচুতে থাকা শ্রমের মেলবন্ধন সম্ভব নয়। সে জন্য নিচুতে থাকা শ্রমকে উন্নত প্রযুক্তি ও উচ্চতর পুঁজি ব্যবহারে সক্ষম করে গড়ে তোলাটা জরুরি হয়ে উঠেছে। এ জন্য আবার শেষ বিচারে উপযুক্ত ধরনের শিক্ষাই হচ্ছে প্রধান হাতিয়ার। আমরা সবাই জানি শ্রম সরবরাহ ও শ্রম চাহিদার মিলন ছাড়া কর্মনিয়োজন সম্ভব নয় আর এই মিলনের বিষয়টা শুধু পরিমাণের দিক থেকে সমান হলে হবে না। গুণের দিক থেকেও হতে হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই শ্রমের গুণগত দিক ও শিক্ষাটাও কর্মসংস্থানের জন্য উপযুক্ত হতে হবে। তা না হলে আমরা একটি

অদ্ভুত প্যারাডক্স বা কূটাভাসের সম্মুখীন হব। বিশেষ করে অপরিকল্পিত বাজার অর্থনীতিতে এটি প্রায়ই ঘটে থাকে।

এখন আমি দ্বিতীয় একটি সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমাদের দেশে অসংখ্য পোশাকশিল্পের মালিক আছেন যাঁরা প্রায়ই অভিযোগ করে থাকেন যে 'কাজ নিয়ে বসে আছি কিন্তু উপযুক্ত শ্রমিক পাচ্ছি না।' তাঁরা দাবি করেন, 'শ্রীলঙ্কা থেকে ম্যানেজার ভাড়া করছি, ভারত থেকে ফ্যাশন ডিজাইনার আনছি, চীন থেকে মাস্টার টেইলর আনছি। ওরা উচ্চ বেতন ও ডলার এ দেশ থেকে বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে অথচ দেশের ভেতরে উপযুক্ত লোক পাচ্ছি না।' অন্যদিকে আমাদের কাছে বহু শ্রমিক অভিযোগ করেন, 'আমরা কাজই পাচ্ছি না অথবা পেলেও তার মজুরি এতই নিম্ন যে মানুষের মতো বাঁচা তা দিয়ে সম্ভব নয়।' তাহলে এই 'কাজ আছে কিন্তু কাজ নেই' সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে?

কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধান—শিক্ষা একটি চাবিকাঠি

অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন দুভাবে এই উল্লেখিত কর্মসংস্থান-সংক্রান্ত 'কূটাভাসের' বাস্তব মীমাংসা সম্ভব। একটি হচ্ছে কর্ম নিয়োগকারীরা তাঁদের মুনাফা কমিয়ে যদি কিছু টাকা শিক্ষার জন্য ব্যবহার করেন। তার কাছে চাকরিপ্রার্থী বা চাকরিরতদের জন্য ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেন, তাহলে শ্রমিকদের প্রয়োজনমতো ফলপ্রসূ শিক্ষা দিয়ে এ সমস্যা থেকে তিনি নিজ উদ্যোগেই মুক্ত হতে পারেন। তবে এখানে যৌথ স্বার্থ ও ব্যক্তিস্বার্থের একটি দ্বন্দ্ব থেকে যাবে। ধরা যাক কোনো ধনাঢ্য পুঁজিপতি আগ্রহী হয়ে একটি পোশাকশিল্পের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট তৈরি করলেন। কিন্তু ব্যাপারটি এ রকম হতে পারে তাঁর প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের পাস করা ছাত্রকে অন্য কোনো মালিক বেশি বেতনের লোভ দেখিয়ে ভাগিয়ে নিতে পারেন। এই সমস্যাকে অর্থনীতির পরিভাষায় বলে বাহ্যিক সাশ্রয়। অর্থাৎ কাজ করলাম আমি কিন্তু ফল পাচ্ছে অন্যজন। ফলে এ অবস্থায় কাজটি কেউই করতে আগ্রহী হচ্ছে না। এই সমস্যা পরস্পরবিচ্ছিন্ন উদ্যোক্তানির্ভর বাজার অর্থনীতিতে অনিবার্য।

তাই এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সমাধানের দিকে যাওয়া যেতে পারে। ধরা যাক বিজিএমইএ বা পোশাক মালিকদের যৌথ সংগঠন যৌথ স্বার্থে সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলে একটি সাধারণ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গড়ে তুললেন। তাহলে সেখান থেকে প্রতিবছর উপযুক্ত সংখ্যক প্রশিক্ষিত কর্মী বের হয়ে প্রয়োজনমতো বিভিন্ন কারখানায় ছড়িয়ে যেতে পারেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সমস্যা হচ্ছে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবেন কে? উদ্যোক্তাদের মধ্যে কি এই আলোকিত যৌথ স্বার্থের বাহক পাওয়া যাবে? আসলে চূড়ান্ত বিচারে এ কাজটি শেষ পর্যন্ত সরকারকেই

করতে হবে এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ তাকে ধনীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

এতক্ষণ পরে আমরা যে সমাধানে উপনীত হলাম তাকে ইংরেজিতে বলে 'Public Goods' এর 'Public Supply' অর্থাৎ 'শিক্ষা যেহেতু একটি সর্বজনভোগ্য দ্রব্য' সে জন্য তার সরবরাহের দায়িত্বও বর্তায় 'সার্বজনীন কর্তৃত্বের' কাঁধে অর্থাৎ সরকার বা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব হচ্ছে অর্থনীতির প্রয়োজনমতো একটি ফলপ্রসূ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলে সবার জন্য শিক্ষা ও সেই অনুযায়ী কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করা ও দারিদ্র্য দূর করা। আর সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার রাষ্ট্রকে যথাসময়ে যথাযথ মাত্রায় জোগান দেওয়া। অবশ্য এই ফাঁকে এ কথাটিও বলে রাখি যে পরিকল্পিত কর্মসংস্থান, পরিকল্পিত শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হলেও যদি শিক্ষার গুণগত মান ও উৎপাদশীলতা যথেষ্ট না হয় তাহলে উপার্জিত আয় দ্বারা দারিদ্র্য দূরীভূত হবে না, আরও খারাপও হতে পারে। অর্থাৎ কম উৎপাদনশীল কম আয়ের ভারসাম্য ফাঁদেই আমরা দীর্ঘকাল আটকে থাকতে পারি। রাষ্ট্র চাকরি সৃষ্টি করে বেকারত্ব দূর করার নামে শূন্য উৎপাদনশীল অতিরিক্ত ছদ্মবেশী বেকারও তৈরি করতে পারে। সুতরাং শিক্ষাকে যদি সত্যিই দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমাদের একই সঙ্গে শিক্ষার পরিমাণগত মাত্রা, শিক্ষার বিশেষ ধরন এবং শিক্ষার গুণগত মান—এই তিনটি দিকেরই ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন অর্জন করতে হবে। প্রথমত, কয়েকটি মৌলিক শিক্ষাকে আপামর জনগণের নাগালের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ পড়তে পারা, লিখতে পারা ও গুনতে পারা—এই ক্ষমতাগুলোকে সবার জন্য বাধ্যতামূলক ও গ্রহণযোগ্য করতে হবে। এই সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান এমন হতে হবে যাতে যেটাকে বলা হয় Basic Competence বা মৌলিক দক্ষতা, সেটা অল্প বয়সেই নাগরিকেরা প্রত্যেকেই অর্জনে সক্ষম হন। তারপর যে পরবর্তী ধাপের শিক্ষা হবে সে শিক্ষার ধরনটি হবে কর্মমুখী এবং অর্থনীতির ও সমাজের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তার মানটিও হতে হবে বিশ্বমানের বা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড। তাহলে দেশে-বিদেশে যুগপৎ কর্মসংস্থানে কোনো বাধা থাকবে না এবং আমরা সামগ্রিকভাবে একটি ন্যূনতম শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী উপহার পাব, শিক্ষিত হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকার দুঃসহ অভিশাপ থেকে রক্ষা পাব এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় সক্ষম একটি জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হব। মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের যে স্ট্র্যাটেজির কথা এখন অহরহ আমরা শুনতে পাই তা এই যৌক্তিক ভিত্তির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য শিক্ষা : সামষ্টিক কার্যকারণ চক্র

আমাদের আগের অধ্যায়ের আলোচনার সূত্র অনুসরণ করে আমরা দেখাতে পারি কীভাবে শিক্ষাহীনতা দারিদ্র্যকে দীর্ঘায়িত করে (দেখুন চিত্র-এক) এবং শিক্ষার অগ্রগতি কীভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক হয় (দেখুন চিত্র-দুই)।

চিত্র : ১

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের ফলাফল : দারিদ্র্য চক্র

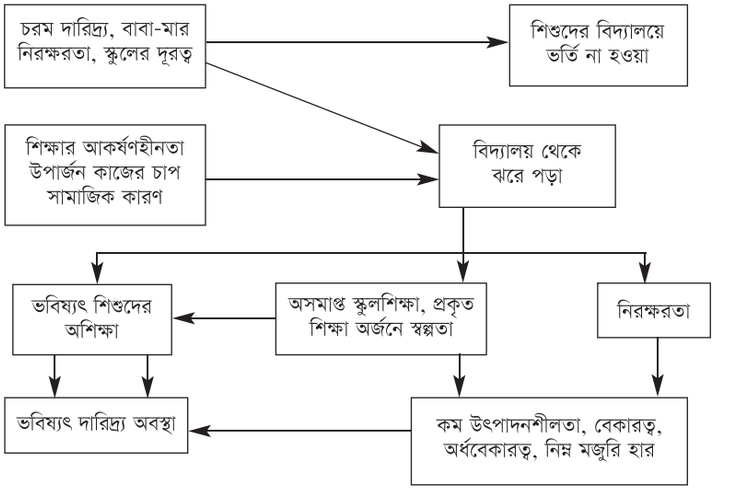

উৎস : রুশিদান ইসলাম (২০১২), *বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়ন : স্বাধীনতার পর ৪০ বৎসর* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা। পৃ. ২০১ (চিত্র : ৯.২)

এক নম্বর চিত্র থেকে আমরা দরিদ্র পরিবারের শিক্ষা ঘাটতির কারণগুলো সুনির্দিষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারি। সেগুলো হচ্ছে :

ক. শিশু বয়সেই বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়ার সমস্যা। শুধু আর্থিক কারণে নয়, কাছাকাছি কোনো বিদ্যালয় না থাকাও এর কারণ হতে পারে। এর ফলে নিরক্ষর মানুষ তৈরি হচ্ছে।

খ. দরিদ্রদের পরিবারের যারা অবশেষে ভর্তি হতে পারে তাদের মধ্যেও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে পাঁচ বছর পর্যন্ত সময় ব্যয় করতে হয় সেটুকু সময় উপার্জনহীনভাবে ব্যয় করার বিলাসিতা সম্ভব নয়। ফলে সৃষ্টি হয় মাঝপথে ঝরে পড়া অসমাপ্ত শিক্ষার সমস্যা। এই স্বল্প বা অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তিদের আর

কখনোই পরবর্তী সময়ে শিক্ষালাভের সুযোগ তৈরি হয় না।

গ. এই নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিতরা হয় বেকার অথবা অর্ধবেকার থাকে অথবা কাজ পেলেও তাদের কাজের উৎপাদনশীলতা ও মজুরি কম থাকে। ফলে দারিদ্র্য জমা হতে থাকে ও টিকে থাকে।

চিত্র : ২

শিক্ষা, প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য

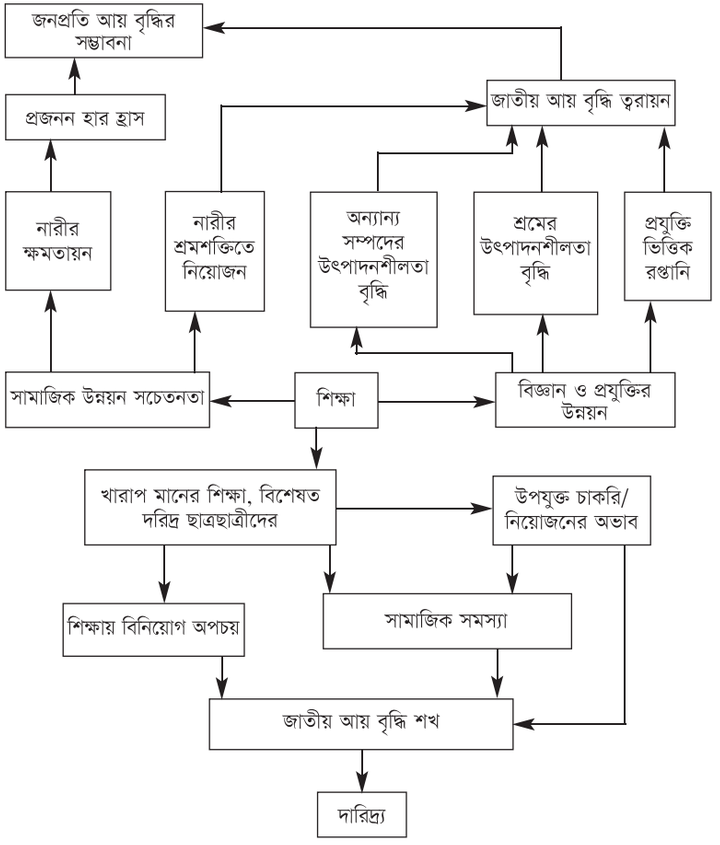

উৎস : রুশিদান ইসলাম (২০১২), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪ (চিত্র : ৯.১)

তবে সুখবর হচ্ছে যে বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ডের আইন পাস করেছে। এটি কার্যকর হলে ঝরে পড়া লোকদেরও নতুন করে লেখাপড়ার সুযোগ তৈরি হবে।

মধ্য আয়ের দেশ প্রসঙ্গ ও শিক্ষার গুরুত্ব

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করা হবে। এ সম্পর্কে দুধরনের আপত্তির কথা শোনা যায়। প্রথমত, কেউ কেউ বলেন, 'সাত মণ তেলও পুড়বে না রাধাও নাচবে না।' এই মতাবস্থানের অন্যতম কারণ হিসেবে তাঁরা বলেন যে অধুনা দুই প্রধান যে রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রক্ষমতায় পালাক্রমে আসীন হচ্ছে তাদের উন্নয়ন কৌশলে উৎপাদনশীল বুর্জোয়াদের তুলনায় লুটেরা বুর্জোয়াদের প্রাধান্যই বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। লুটেরা বুর্জোয়ারা প্রচুর সম্পদের মালিক হয়েছে বটে কিন্তু পূর্ব এশিয়ার বুর্জোয়াদের মতো তা উৎপাদনশীলভাবে ব্যবহার করে দেশে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত করতে তাদের আগ্রহ কম। কিন্তু এই সুস্পষ্ট ও সরল বক্তব্যের সমস্যা হচ্ছে বক্তব্যটিকে আরেকটু গভীরে নিয়ে গিয়ে নতুন কিছু প্রশ্ন না করার সমস্যা। আসলে আমাদের যে মৌলিক প্রশ্নটি করতে হবে তা হচ্ছে বাংলাদেশে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সঞ্চয় কেন উৎপাদনশীলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না অথচ অন্যত্র কেন তা হয়েছিল? খুঁজে দেখতে হবে, এটা কি বাংলাদেশের বাঙালিদের চারিত্রিক ত্রুটি, নাকি বর্তমান বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধস্তন অবস্থানে থাকার জন্য দেশের ভেতরে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ অসম্ভব হয়ে পড়েছে, নাকি এটা বুর্জোয়া শাসক রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতা, নাকি এটা রাষ্ট্রেরই এক সামগ্রিক ব্যর্থতা। আসলে এসব প্রশ্নই হয়তো আমাদের নিয়ে যাবে সমস্যার মূলে এবং তখনই হয়তো আমরা প্রকৃত সমাধানের চাবিকাঠিটি খুঁজে পাব।

বাংলাদেশের অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ এখন মনে করেন যে বাংলাদেশে সঞ্চিত ধনের উৎপাদনশীল বিনিয়োগের অনুকূল বাস্তব পরিস্থিতি নেই। হয়তো সে জন্যই এ দেশের ধনী ব্যক্তিরা এবং উদ্বৃত্ত পুঁজির মালিক বিদেশি ধনী ব্যক্তিরাও এখানে সস্তা শ্রম পাওয়া সত্ত্বেও বিনিয়োগে ততটা আগ্রহী হচ্ছেন না। উৎপাদনশীল বিনিয়োগের পথে এ দেশে প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে সস্তা শ্রম কিন্তু তার বিপরীতে যে অন্য প্রতিবন্ধকতাগুলো এ যাবৎ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে সেগুলোর শক্তিও কম নয়। এর তালিকাটি নিচে তুলে ধরা হলো।

১. প্রয়োজনীয় ভৌত কাঠামোর অভাব অর্থাৎ সাশ্রয়ী দামে গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানি-বন্দর-যোগাযোগব্যবস্থা ইত্যাদির অভাব। এসব ছাড়া নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ার সাহস কেউ করবেন না।

২. প্রয়োজনীয় আইনশৃঙ্খলার অভাব এবং সম্পত্তির নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা। অদৃশ্য সেলামি বা চাঁদা/ঘুষ প্রদানের বোঝা। অর্থাৎ উৎপাদন খরচের ওপর এসব বাড়তি ঝামেলা ও খরচ থাকলে নতুন প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক ও নিরাপদ নাও হতে পারে।

৩. পরিবর্তনশীল পুঁজির অভাব এবং ব্যাংক থেকে সস্তায় বা কম সুদে অর্থ পাওয়া যাচ্ছে না। পুরো 'ইকুয়িটি' পুঁজি নিয়ে এখন কম লোকই মাঠে নামেন। তাই দক্ষ ব্যাংকিং সেবা ছাড়া মূল 'ইকুয়িটি' পুঁজি সক্রিয় নাও হতে পারে।

৪. বাজারের অভাব বা কোথায় উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করা যাবে তা খুঁজে বের করে সেখানে তা দ্রুত সস্তায় প্রেরণ করার বাধাসমূহ। এটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে পণ্যের দাম সস্তা কি না এবং মান ভালো কি না সেই প্রশ্ন। দাম সস্তা ও মান ভালো না হলে বাজারজাতকরণের প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া যাবে না।

৫. কিন্তু সস্তা দাম ও উন্নত মান অর্জন করতে হলে উন্নত প্রযুক্তি, দক্ষ শ্রমিক, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। সুতরাং দক্ষ শ্রমের এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নত প্রযুক্তির অভাব হলে ওপরের চার নম্বর শর্তটি পূরণ হবে না। আবার দক্ষ শ্রমিককে সন্তুষ্ট রাখতে হলে তাকে উপযুক্ত বেতন/মজুরি এবং অবিচ্ছিন্ন উৎপাদনকর্মের প্রণোদনাও দিতে হবে।

মনে রাখা দরকার উপরিউক্ত পাঁচটি উপাদান পরস্পরবিচ্ছিন্ন পৃথক পৃথক উপাদান নয়। এগুলোর একটি নিশ্চিত হলো, অপরটি নিশ্চিত হলো না, সে অবস্থায় কিন্তু অর্থনীতির চাকা মধ্য আয় অভিমুখে মসৃণ ও অব্যাহতভাবে চালু থাকবে না। যদি মোটামুটি মসৃণ ও অব্যাহতভাবে আমরা মধ্য আয়ের দিকে এগোতে চাই তাহলে এই বাধাগুলোকে চারদিক থেকে একসঙ্গে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং তার সম্মিলিত সমাধান করতে হবে বা অন্তত সেদিকে যে আমরা অগ্রসর হচ্ছি শাসকশ্রেণিকে তার বিশ্বাসযোগ্য সিগন্যাল সমাজকে দিতে হবে। এই সম্মিলিত সমাধানের জন্য অর্থনীতির ভাষায় Big Push বা 'বড় ধাক্কার' প্রয়োজন দেখা দেবে। বর্তমান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন দল, বাইরে অবস্থিত 'ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের' অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং প্রশাসনের (সামরিক-বেসামরিক) নির্বাহী ক্ষমতা, এই ত্রয়ীর সম্মিলিত (Orchestrated) অঙ্গীকার ও প্রচেষ্টা ছাড়া এই Big Push প্রদান অসম্ভব। কিন্তু এই ত্রিভুজ ক্ষমতার তিনটি বাহুই যদি পুঁজির আদিম সঞ্চয়েই অধিকতর আগ্রহী ও ব্যস্ত থাকে তাহলে এই অতি প্রয়োজনীয় Big Push কি সংগঠিত করা সম্ভব হবে? নিশ্চয়ই তখন তা

সম্ভব হবে না। আমরা হয়তো তখন অন্যান্য অনুন্নত দেশের মতোই একটি অসম্পূর্ণ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ট্র্যাজেডির মধ্যেই আটকে পড়ে থাকব। প্রশ্ন হলো, এই 'ত্রিভুজকে' ভাঙার জন্য কোনো কার্যকর উদ্যোক্তা শক্তি সমাজে দৃশ্যমান হচ্ছে না কেন?

বামপন্থী বা সমাজতন্ত্রীরা বর্তমানে এই অসমাপ্ত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যন্ত্রণাগুলোর সমাধান করতে চাচ্ছে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক একটি বিপ্লবের মাধ্যমে, যার বিষয়ীগত ও বিষয়গত শর্ত দুই-ই বর্তমানে অনুপস্থিত। মনে রাখা প্রয়োজন মার্ক্সের তত্ত্ব অনুসারে সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ আধুনিক শ্রমিকশ্রেণি এবং বৃহদায়তন সামাজিক চরিত্রের শিল্পায়ন ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তা ছাড়া বিশ্ব ইতিহাসের ধারায় অতীতে কোনো দুর্বল গ্রন্থিতে এককভাবে বিপ্লবের পর শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার অধীনে কোথাও কোথাও ভিন্নপথে শিল্পায়ন সম্ভব করা গেলেও তা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের অধীনে সুড়ঙ্গ করা যায়নি এবং ইদানীং চীন, ভিয়েতনাম ও কিউবাতে তা এখনো টিকলেও সেখানে তা টিকানোর জন্য ইতিমধ্যেই পুঁজিবাদী পথে নানা সংস্কারের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। এসব অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে উৎপাদনমুখী উদ্যোক্তাদের কিছুটা সহযোগিতা ছাড়া আমাদের দেশকেও আমরা শিল্পায়নের মাধ্যমে মধ্য বা উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত করতে পারব না।

উল্লিখিত বিষয়গুলোর সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক কোথায়? কেউ বলতে পারেন যে আমি 'ধান ভানতে শিবের গীত' গাইছি। কিন্তু মধ্য আয়ের অন্য দেশগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে ন্যূনতম আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা ছাড়া কোনো দেশই আধুনিক শিল্পায়ন সম্পন্ন করতে পারেনি। মাত্র গুটি কতক ব্যতিক্রমী দেশ আছে কিন্তু তারা হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের আশীর্বাদধন্য অল্প কয়েকটি তেলসমৃদ্ধ দেশ। তাদের জন্য শিক্ষা ও আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু আমাদের মতো দেশে শিল্পায়নের পথে যে বহুমুখী বাধা রয়েছে তা দূর করার জন্য আসলে যে বহুমুখী উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা ওপরের আলোচনায় তুলে ধরা হলো যাকে কেতাবি অর্থনীতিবিদেরা Big Push বলে অভিহিত করেছেন এবং চিরায়ত বিপ্লবীরা 'বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন, জাতীয়তাবাদীরা যাকে 'নবজাগৃতি' বলে নামকরণ করেছেন এবং নাগরিক সমাজ যাকে সম্প্রতি 'সুশাসন' বলে চিহ্নিত করেছেন তার সূচনাবিন্দুটি কী হবে, সেটি আমাদের আজ প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে। যদি আমরা ব্যাপকার্থে এবং সঠিক অর্থে এই সূচনাবিন্দুটিকে আজ চিহ্নিত করতে চাই তাহলে তাকে আমাদের নাম দিতে হবে 'শিক্ষা'। উপযুক্ত 'শিক্ষাই' পারে নবচেতনার ভিত্তিতে একটি নবশক্তিকে তৈরি করতে, যারা হবে আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির এজেন্ট। এই অর্থে শিক্ষাই আমাদের বর্তমান, শিক্ষাই আমাদের

ভবিষ্যৎ।

ধরুন আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন নেহেরু, মাহাথির, লেনিন বা মাওয়ের মতো সুশিক্ষিত নেতারা। বা ধরুন তাজউদ্দীনের মতো ধীশক্তিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি। বা ধরুন বঙ্গবন্ধুর মতো কোনো বিশাল হৃদয়ের অধিকারী আবেগপ্রবণ ব্যক্তি, যাঁর জনগণের প্রতি অঙ্গীকারের পাশাপাশি রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে এক ধরনের Intuitive জ্ঞান আছে, আছে বিপুল বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং যিনি বাকি প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল জ্ঞানটুকু অন্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছ থেকে পরামর্শ হিসেবে গ্রহণ করার মতো বিনয়ের অধিকারী, তাহলে বাংলাদেশে কি আমরা একটি উৎপাদনশীল-সৃজনশীল শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাক্ষাৎ পেতাম না? হয়তো পেতাম এবং সফল হতাম অথবা পেয়েও হয়তো সফল হতাম না (কারণ অন্য উপাদানগুলো থাকাটাও জরুরি)। উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের পাশাপাশি অন্য উপাদানগুলো যথাযথ মাত্রায় না থাকলে আমাদের কী করুণ পরিণতির সম্মুখীন হতে হয় তার উদাহরণ তো আমাদের সামনেই আছে। ১৯৭৫-এর বিয়োগান্ত ঘটনাটি স্মরণ করুন। কীভাবে প্রগতির ধারাটি এত সহজে ১৮০ ডিগ্রি উল্টে গেল!

যদি সেই 'উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব' খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তাঁকেও খুবই সতর্কতার সঙ্গে এ দেশের 'ধনাঢ্য বুর্জোয়া' শ্রেণির মধ্যে উৎপাদনশীল বিনিয়োগের প্রবণতা সৃষ্টির ব্যবস্থাটি ধাপে ধাপে ক্রমশ নির্মাণ করতে হবে। কিন্তু সেটি করতে হলে শুধু বুর্জোয়াদের চাহিদাগুলো পূরণই যথেষ্ট নয়। পাশাপাশি তাঁদের কাউকে কাউকে কঠোর শাস্তি এবং বাকিদের মধ্যে একটি জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক সমাজমনস্ক মানসিক পরিবর্তনও সূচিত করতে হবে। যেমনটি আজকাল অমর্ত্য সেন, স্টিগলিৎজ থেকে শুরু করে সব সামাজিক গণতন্ত্রী তাত্ত্বিক বোঝানোর চেষ্টা করছেন এবং স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলোতে বা কল্যাণ পুঁজিবাদে যেটি অনেকখানি সফলতার সঙ্গে কার্যকরও হয়েছে। কিছুটা পরিমাণে সামাজিক ও আইনি বাধ্যতা ও কিছুটা সম্মতির ভিত্তিতে সেখানে গড়ে উঠেছে এক সুনিয়ন্ত্রিত পুঁজিপতি গোষ্ঠী, যারা নিজ প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত মূল্যের বর্ধিত পুনরুৎপাদন অব্যাহত রাখার পাশাপাশি গড়ে প্রায় ৪০ শতাংশ উদ্বৃত্তমূল্য কর হিসেবে রাষ্ট্রের হাতে নিয়মিত তুলে দিচ্ছে। রাষ্ট্র আবার সেটি দিয়ে সব নাগরিকের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সর্বজনভোগ্য দ্রব্য ও সেবা সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করছে। এ ধরনের একটা কিছু বাংলাদেশে কার্যকর করার জন্য দরকার হবে এ দেশের মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়াদের উৎপাদনশীল শাখাটির মধ্যে বিশাল এক মানসিক বিপ্লবের, একটি বাঙালি জাতীয়তাবাদী রেনেসাঁর, যাকে আমরা বর্তমানে নাম দিতে পারি আমাদের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পুনরুজ্জীবন ও নবায়ন। এই চেতনার আলো

শুধু ওই 'ধনাঢ্য বুর্জোয়াদের' অংশবিশেষকে স্পর্শ করলেই চলবে না, তাকে ছড়িয়ে পড়তে হবে পেটিবুর্জোয়া মধ্যবিত্তের মধ্যে, নিচের তলার দরিদ্র মানুষদের মধ্যে। ওপরের নেতৃত্বের সমানুপাতে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে তাদের নিচে অবস্থিত অধস্তন শ্রেণিগুলোকেও। যাতে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এক আলোকিত স্বচ্ছতা ও পারস্পরিক জবাবদিহি।

সর্বশেষে আসুন আমাদের সামরিক-বেসামরিক নির্বাহী প্রশাসনের আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতাকে সংশোধনের বিষয়টিতে। তাদের আত্মসেবার পরিবর্তে জনসেবায় নিয়োজিত করার জন্য কী করতে হবে এবং সেখানে শিক্ষার ভূমিকাটি কী হবে সেটিই আমাদের মূল প্রশ্ন। এখানেও 'পূর্ব এশিয়ার' আমলাদের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা আমাদের শেখায় যে Meritocracy এবং Hard State ছাড়া রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রের সুষ্ঠু ভূমিকা নিশ্চিত করা যায় না। অর্থাৎ আমাদের আমলাদেরও হতে হবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে জ্ঞানী, দক্ষ এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাদের নৈর্ব্যক্তিকভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে গৃহীত আইন ও নীতিমালা কার্যকর করতে হবে। এই শেষের বিষয়টি আত্মীয়তাভিত্তিক বা ব্যক্তিগত সম্পর্কভিত্তিক ব্যবস্থার বদলে নীতি ও আইনভিত্তিক সমাজে উত্তরণের বিষয়। এ জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনিবার্য। তবে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কার্যকর হয় না বা সীমিতভাবে ফলপ্রসূ হয় যদি আগের দুটি সংস্কার অর্থাৎ নেতৃত্ব ও চেতনার সংস্কার বাস্তবায়িত না হয়।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে আমাদের অর্ধসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য দেশের বিভিন্ন শ্রেণিকে নিজ নিজ ভূমিকা সম্পর্কে আত্মসচেতন ও সুশিক্ষিত করে না তুলতে পারলে আমরা সত্যিকার অর্থে মধ্য আয় এবং পরবর্তী সময়ে উন্নত আয়ের দেশে পরিণত হতে পারব না। আমি যে অর্থে এখানে চেতনা পরিবর্তনকে সংজ্ঞায়িত করেছি সে ধরনের চেতনা পরিবর্তনের জন্য বস্তুত দরকার হবে একটি ব্যাপক শিক্ষাবিপ্লবের। এটা না পারলে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা বিদ্যমান ছয় শতাংশ প্রবৃদ্ধির আশপাশেই মার্কটাইম করতে থাকবে, সামনে এগোতে পারবে না, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বনাম পশ্চাৎপদ মধ্যযুগীয় চেতনার দ্বন্দ্বেরও মীমাংসা হবে না, মধ্য আয়ের মাত্রাতেও আমরা যথাসময়ে পৌঁছাতে পারব না।

শিক্ষা বিনিয়োগের ম্যাজিক

আমরা যখন উন্নয়নের কথা বলি তখন প্রায়ই ভুলে যাই যে বস্তুগত উন্নয়নই একমাত্র উন্নয়ন নয়। বস্তুগত উন্নয়ন শেষ বিচারে মানবিক উন্নয়নে কতটুকু পরিণত হলো তা দিয়েই বস্তুগত উন্নয়নের সার্থকতা পরিমিত হয়। এ জন্যই

বর্তমান বিশ্বে বিশ্বব্যাংকের নিম্ন আয়, মধ্যম আয়, উন্নত আয় ইত্যাদি অভিধার পাশাপাশি প্রতিযোগী আরেকটি 'র‍্যাঙ্কিং' ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে, যার ভিত্তি মানব উন্নয়ন সূচক। এই সূচকের একটি অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে 'শিক্ষা'। এ কথা সত্য যে বাংলাদেশ সম্প্রতি তার আপেক্ষিক নিম্ন মাথাপিছু আয় সত্ত্বেও কতিপয় মানব উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করেছে। এগুলো হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা, নারী শিক্ষা, মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস ইত্যাদি। এসব বাড়তি সাফল্যের ব্যাখ্যা কী?

অধ্যাপক ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদের মতে, বাংলাদেশের একটি বাড়তি সুবিধা হচ্ছে এর জনসংখ্যার ঘনত্ব। এখানে অল্প জায়গায় অনেক লোক জড়াজড়ি করে বাস করে। তার ফলে এখানে যেকোনো কথা, যেকোনো জ্ঞান দ্রুত বিদ্যুতের বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এখানে প্রায় ১১ কোটি মোবাইল এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে বহু কম্পিউটার সেন্টার তৈরি হয়েছে। ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে বাংলাদেশে আইসিডিডিআর কর্তৃক আবিষ্কৃত 'ওরাল স্যালাইন' জ্ঞানটি এ দেশে শিশুমৃত্যুর হার অতি দ্রুত কমিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল! তাই বলা হয়ে থাকে যে বাংলাদেশের সামাজিক খাতে আপেক্ষিকভাবে অধিকতর অগ্রগতি অর্জন করার পেছনে বাংলাদেশের বিস্তৃত সামাজিক নেটওয়ার্ক বা 'সামাজিক পুঁজির' একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

এই বিস্তৃত সামাজিক নেটওয়ার্কে যদি আপনি বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও মহৎ চিন্তার বীজ বপন করতে শুরু করেন তাহলে কল্পনা করুন তা কত দ্রুত এ দেশে নতুন নতুন সৃজনের অঙ্কুর সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এখনই জ্ঞান বিচ্ছুরণের যে প্রক্রিয়া চালু রয়েছে, যে প্রাণশক্তির বলে বাংলাদেশের কৃষিতে, পোশাকশিল্পে, নানা ধরনের বিচিত্র ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের মধ্যে এবং প্রবাসী শ্রমিকের শ্রমের মধ্যে উৎপাদন ও সৃজনের বিশাল একটি সক্রিয় প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে তা আরও কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে, যদি রাষ্ট্র এই সমস্ত ক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে আরও বেশি শিক্ষা ও সম্পদের প্রবাহ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। স্বতঃস্ফূর্ততা ও পরিকল্পনা পরস্পর পরিপূরক হলে কি অসাধ্য যে সাধন করা যায় তার উজ্জ্বল উদাহরণ হচ্ছে চীনের তথাকথিত 'বাজার সমাজতন্ত্রের নীতি'। এর ফলে চীনে অবশ্য বৈষম্যের (আঞ্চলিক ও শ্রেণিগত) তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশে এ ক্ষেত্রে সে জন্য একটু ভারসাম্যপূর্ণ এবং আঞ্চলিকভাবে অধিকতর সুষম নীতি গ্রহণ করতে হবে ।

আমরা জানি বিশেষ করে 'শিক্ষা' হচ্ছে এমন একটি সম্পদ যার মালিকানা, মালিকের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। শিক্ষা এমন একটি সম্পদ যা

ব্যবহার করলে তার দক্ষতা ও দীপ্তি আরও বৃদ্ধি পায়। জ্ঞান বা শিক্ষা অর্জনের খরচ ক্রমশ কমছে। ইন্টারনেটের কল্যাণে শিক্ষা এখন নখাগ্রে এসে উপস্থিত হয়েছে। অন্য সব সম্পদের উৎপাদনশীলতা তাদের ক্রমপুঞ্জীভবনের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায়। অথচ শিক্ষা যত ব্যবহার করা হবে তত তার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। তাই অন্যান্য সম্পদের তুলনায় শিক্ষার নিম্নমুখী, মধ্যমুখী সম্প্রসারণ আমাদের জন্য বৈষম্য কমানোর বিষয়েও সহায়ক হতে পারে। যেহেতু দরিদ্রের জ্ঞানসম্পদকে ধনী ব্যবহার করতে পারে কিন্তু দখল বা লুট করে নিতে পারে না। বিশেষত ইস্ট এশিয়ার মডেলে শিক্ষা ও সম্পদপ্রবাহকে বাজার ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের যুগপৎ ব্যবহারে দরিদ্র ও ধনী উৎপাদনশীল খাত অভিমুখে এমনভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছিল যে সেখানে একই সঙ্গে সমতা ও প্রবৃদ্ধি দুই-ই অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। তবে 'শিক্ষার' বৈষম্যহীন বিকাশকে থামানোর জন্য আমাদের দেশে শিক্ষাকে শাসককুল প্রথমে সুযোগে পরিণত করে ফেলেছে। তারপর আর্থিক বাধ্যবাধকতার দরুন বেশির ভাগ জনগণের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে এক বিশেষ ধরনের নিম্নমানের শিক্ষা বা/এবং ধর্মীয় শিক্ষা। শিক্ষার মধ্যে এই বিভাজন, সমাজের মধ্যেও বিভাজন, বৈষম্যকে ত্বরান্বিত করছে।

কিন্তু এরপরও সারা পৃথিবীতে আজ স্বীকৃত হয়েছে যে প্রত্যেক শিশুকে উন্নতমানের একটি ন্যূনতম সাধারণ শিক্ষা দিতে হবে, যাতে সে পড়তে পারে, নিজের ভাষায় লিখতে পারে এবং সব রকম সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব—যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ সঠিকভাবে করতে ও বুঝতে পারে। যদি এটুকু ঠিকভাবে করা যায়, বাকিটুকু সে নিজেই করে নিতে পারবে। সর্বপ্রথম এ সুযোগটি ভবিষ্যৎ ও বর্তমান প্রজন্মের সবার জন্য রাষ্ট্রকেই নিশ্চিত করতে হবে। আর আর্থসামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার চাহিদারও উন্নতি হবে এবং ধাপে ধাপে আমাদেরও মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা এবং স্নাতক ডিগ্রিকে সর্বজনীন অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সে জন্য যদি রাষ্ট্র তার বাজেট থেকে যথাযথ তহবিল নিয়ে এগিয়ে আসে তাহলে বাংলাদেশেও আমরা শিক্ষার একটি বহুমুখী ম্যাজিক ফলাফল দেখতে পাব। এখন যে জিডিপির ২ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় হচ্ছে, তাকে ৮ শতাংশে উন্নীত করার কথা বর্তমান সরকারের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টেই আছে। প্রতিবছর জিডিপির ১ শতাংশ করে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার একটি প্রতিশ্রুতিও এখন ঘোষিত আছে। কিন্তু কবে থেকে তা সত্যে পরিণত হতে শুরু করবে, তা আমরা জানি না! কিন্তু এ কথা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি শিক্ষা বিনিয়োগ বৃদ্ধিই হচ্ছে আমাদের সেই জাদুর কাঠি, যা আমাদের সমাজের মনোজগতের আঁধার দূর করে বস্তুজগতের আঁধারও ত্বরান্বিত হারে দূর করার

শুভসূচনা ঘটাতে সক্ষম হবে।

এখনো যাদের এ বিষয়ে সন্দেহ রয়ে গেছে তাদের বলব 'ইস্ট এশিয়ার' উন্নয়ন মডেলের দিকে তাকাতে। বেশ আগে ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বনামধন্য গভর্নর ড. আতিউর রহমান সিঙ্গাপুরে ভিজিটিং ফেলো হিসেবে কাজ করার সময় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যার শিরোনাম ছিল, Education For Development: Lessons from East Asia for Bangladesh. ওই প্রবন্ধে ব্যবহৃত একটি তালিকাকে কিছুটা পরিবর্তিত করে আমি পরিশিষ্ট দুইয়ে তুলে ধরেছি। যেকোনো পাঠক সেখানে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে পারবেন যে ১৯৯৮ সালের Snapshot তথ্যানুসারে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষা সূচকের দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার চারটি দেশের (নেপাল, বাংলাদেশ, ভুটান ও ভারত) তুলনায় পূর্ব এশিয়ার চারটি দেশ সেই বছরে গড়ে প্রায় দ্বিগুণ (১০৪ শতাংশ) বেশি এগিয়ে ছিল। একইভাবে তাদের শিক্ষা খাতে ব্যয়ের হার দক্ষিণ এশিয়ার তুলনায় গড়ে জিডিপির দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ১ শতাংশ বেশি ছিল। এই দুই অগ্রসর চলকের প্রভাবে পূর্ব এশিয়ার মানুষের গড় আয়ু দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের গড় আয়ুর তুলনায় তখনই ২৯ শতাংশ বেশি ছিল। এ ছাড়া গড়ে তাদের ক্যালরি গ্রহণমাত্রাও ছিল ২৬ শতাংশ বেশি। এতসব ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সামনে থাকার পরও কি আমরা শিক্ষা সূচকের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা বিনিয়োগ বৃদ্ধির অপরিহার্যতা অনুধাবন করব না?

পরিশিষ্ট-১

দৃঢ় এবং কোমল রাষ্ট্রের ওপর করা প্রামাণিক জরিপ (দক্ষিণ কোরিয়া)
প্রশ্ন : যখন বর্তমান সরকার (পার্ক) কোন সিদ্ধান্ত নেয়, যা ব্যবসাকে প্রভাবিত

উত্তরের ধরন	পার্ক সরকার	রি সরকার
সব সময়ই বাস্তবায়িত হয়, মেনে না চলা অসম্ভব	৭৮.২	৩.২
প্রায় সব সময়ই বাস্তবায়িত হয়, মাঝে মাঝে না মানলেও হয়	১৬.৬	১৭.২
পরিবর্তিত আকারে বাস্তবায়িত হয়	১.৭	৫০.৫
খুব কম সময়ই পুরোদস্তর বাস্তবায়িত হয়	৩.৫	২৯.৫
মোট	১০০	১০০

করে; তা মেনে চলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ? রি সরকারের ক্ষেত্রে কি বলবেন?
উৎস : Jones and Sokong, *Govt., Business and Entrepreneurs in Economic Development: The Korean Case,* Harvard University Press, Cambridge, 1980.

পরিশিষ্ট-২

১৯৯৫ সালে শিক্ষা সূচক, শিক্ষা ব্যয়ের হার এবং বিভিন্ন সামাজিক সূচক। দক্ষিণ

দেশের নাম	শিক্ষা সূচক	শিক্ষা ব্যয় (জিডিপির শতাংশ)	আয়ু আশা	মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণমাত্রা
নেপাল	.৩৭	২.৯	৫৫.৯	২৩৬৭
বাংলাদেশ	.৩৮	২.৩	৫৬.৯	২০০১
ভুটান	.৩৯	-	৫২.০	-
ভারত	.৫৩	৩.৫	৬১.৬	২৩৮২
গড় দক্ষিণ এশিয়া	.৪১	২.৯	৫৬.৬	২২৫০
চীন	.৭৬	২.৩	৬৯.২	২৭০৮
শ্রীলঙ্কা	.৮৩	৩.১	৭২.৫	২৩০২
হংকং	.৮৪	২.৮	৭৯	৩১৮৭
দক্ষিণ এশিয়া	.৯৩	৩.৭	৭১.৭	৩১৫৯
গড় পূর্ব এশিয়া	.৮৪ (১০৪ শতাংশ বেশি)	২.৯৭ (.০৭ শতাংশ বেশি)	৭৩.১ (২৯% বেশি)	২৮৩৯ (২৬% বেশি)

উৎস : আতিউর রহমান (১৯৯৯)

এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার নির্বাচিত কতিপয় দেশের তুলনা।

তথ্যপুঞ্জি

১. রুশিদান ইসলাম (২০১২), *বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়ন স্বাধীনতার পর ৪০ বৎসর,* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

২. সম্পাদনায় রুশিদান ইসলাম রহমান (২০০৭), *আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশ : শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য এবং সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা, বিআইডিএস (বিশেষ প্রকাশনা-৯),* আগারগাঁও, ঢাকা।

৩. জোসেফ ই. স্টিগলিৎজ (১৯৯৬), *সাম লেসনস ফ্রম দ্য ইস্ট এশিয়ন মিরাকল, দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রিসার্চ অবজারভার,* ভল্যুম-১১, নম্বর-২, (আগস্ট, ১৯৬৬), পৃ. ১৫১-১৭৭।

৪. সমীর রঞ্জন নাথ (২০০৯), *শিক্ষা-আশা-বাস্তবতা-নবআশা,* একাডেমিক প্রেস, ঢাকা।

৫. World Bank (2012), (East Asia and Pacific Regional Report), *Putting Higher Education for Work: Skills and Research for Growth in East Asia,* Washington, 2012.

৬. Wahid Uddin Mahmud (2013), 'Bangladesh's Development Surprise: Will it Endure?' A paper presented in the International Conference titled Development Ideas-Linking Research and Policies, organized by International Growth Center, held in Dhaka, December 27, 2013.

৭. আতিউর রহমান (১৯৯৯), 'এডুকেশন ফর ডেভেলপমেন্ট লেসনস ফ্রম ইস্ট এশিয়া ফর বাংলাদেশ, ইনস্টিটিউট অব সাউথইস্ট এশিয়ান স্টাডিজ, সিঙ্গাপুর।

খাতি
শিক্ষা
চিন্তা

দক্ষিণ এশিয়ায় মাদ্রাসাশিক্ষা : প্রাক-ঔপনিবেশিক এবং ঔপনিবেশিক আমল

আলী রীয়াজ

সারসংক্ষেপ

এই প্রবন্ধে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসন শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে দক্ষিণ এশিয়ায় মাদ্রাসার (ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে দক্ষিণ এশিয়ায় মোগলরাসহ (১৫২৬-১৮৫৭) অনেক প্রাক-ঔপনিবেশিক শাসকই নানান ধরনের শিক্ষার প্রসার এবং মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের নীতি (১৭৫৭-১৯৪৭) মাদ্রাসাশিক্ষার ওপর সবচেয়ে স্থায়ী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। প্রত্যক্ষভাবে তাদের নীতিসমূহ মাদ্রাসাগুলোর কাঠামো, কার্যক্রম এবং পাঠ্যসূচির ওপর প্রভাব ফেলেছিল এবং পরোক্ষভাবে, ওলামা ও মুসলিম সম্প্রদায়কে সাড়া দেওয়ার জন্য প্ররোচনা দিয়ে মাদ্রাসাশিক্ষার বহিরাবয়ব এবং উপাদান নির্ধারণ করে দিয়েছিল। এই প্রবন্ধে বিভিন্ন ধারার মাদ্রাসাশিক্ষার ভূমিকা এবং বিভিন্ন প্রধান মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি ও রাজনীতির মধ্যকার আন্তসম্পর্ক যাচাই করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে প্রতিষ্ঠান এবং ধারণা হিসেবে মাদ্রাসা অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছে, মাদ্রাসাগুলোর বহিরাবয়ব এবং আধেয়সমূহ নানান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদ্রাসাগুলো এখনো সমাজের সঙ্গে অনেকাংশে সম্পৃক্ত আছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

শিক্ষা, পরিচয়, মাদ্রাসা, দক্ষিণ এশিয়া।

ভূমিকা

যদিও অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে এবং নানান নামে (যেমন ইন্দোনেশিয়ায় পেসানট্রেন) ইসলামিক শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান লক্ষ করা যায়, তবে দক্ষিণ এশিয়া,

মাদ্রাসাশিক্ষার দীর্ঘ ঐতিহ্যসহ যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মুসলিম জনসংখ্যার বাস, সাম্প্রতিক সময়ে অন্য যেকোনো অঞ্চলের চেয়ে বেশি নজর কেড়েছে। আরবি ভাষাভাষি অঞ্চলে মাদ্রাসা শব্দটি দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ করা হয় না, বরং নানান পর্যায়ের বিদ্যালয়কে মাদ্রাসা নামে অভিহিত করা হয়। তবে আরবি ভাষাভাষি না এ রকম সমাজে এই শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং প্রায়ই ওলামাদের (শাব্দিক অর্থে পণ্ডিত, একবচনে আলিম) প্রশিক্ষণের জন্য এক বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ করে। দক্ষিণ এশিয়ায় মাদ্রাসা বলতে এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয় যেখানে কোরআন, হাদিস (মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী), ফিকাহ্ (আইনশাস্ত্র) এবং আইনের ওপর পাঠদান করা হয়। অর্থাৎ, যেসব বিদ্যালয় ইসলামিক পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে, সে বিদ্যালয়গুলোকে মাদ্রাসা বলা হয়। যদিও মাদ্রাসা শব্দটি বর্গীয় অর্থে প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা পর্যন্ত সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তবে মুসলিম বিশেষজ্ঞদের কাছে মাদ্রাসা দ্বারা প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের অর্থাৎ দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বোঝায়। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির সমমানের পাঠ্যক্রম প্রদান করে, সেগুলোকে দারুল উলুম (শাব্দিক অর্থে জ্ঞানের আবাস) বলা হয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানের পাঠ্যক্রম প্রদানকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে জামেয়া বলা হয়। এই প্রবন্ধে আমি মাদ্রাসা দ্বারা ওপরে উল্লেখিত সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করব।

এই প্রবন্ধে প্রাক-ঔপনিবেশিক এবং ঔপনিবেশিক আমলে দক্ষিণ এশিয়ায় (ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) মাদ্রাসার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার মাদ্রাসাশিক্ষার ইতিহাস এই অঞ্চলের বাইরে ঘটা অনেক ঘটনার সঙ্গে নানাভাবে সংযুক্ত, কিন্তু মাদ্রাসাগুলোর বিকাশ এবং ভূমিকা এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক ও সামাজিক অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় মোগলরাসহ (১৫২৬-১৮৫৭) অনেক প্রাক-ঔপনিবেশিক শাসকই শিক্ষার প্রসার এবং মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের নীতি (১৭৫৭-১৯৪৭) মাদ্রাসাশিক্ষার ওপর সবচেয়ে স্থায়ী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। প্রত্যক্ষভাবে তাদের নীতিসমূহ মাদ্রাসাগুলোর কাঠামো, কার্যক্রম এবং পাঠ্যসূচির ওপর প্রভাব ফেলেছিল এবং পরোক্ষভাবে ওলামা ও মুসলিম সম্প্রদায়কে সাড়া দেওয়ার জন্য প্ররোচনা দিয়ে মাদ্রাসাশিক্ষার বহিরাবয়ব এবং উপাদান নির্ধারণ করে দিয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব প্রতিক্রিয়া মুসলিম পরিচয় ধারণাকেন্দ্রিক ছিল, ফলে প্রতিক্রিয়াগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক সক্রিয়তা মেশানো ছিল।

এই প্রবন্ধে চারটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে ভারতে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে কীভাবে এই প্রতিষ্ঠান দানা বেঁধে উঠছিল তা দেখা হয়েছে। এরপরের অংশে মোগল শাসনামলে এই প্রতিষ্ঠানের বিকাশ আলোচিত হয়েছে। এরপর আমি দেখিয়েছি যে ব্রিটিশ উপনিবেশাধীন ভারতে মাদ্রাসাশিক্ষার ইতিহাস রাষ্ট্রের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির, বিশেষত ১৯ শতকের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমি মনে করি, ঔপনিবেশিক শাসনামলে মাদ্রাসা সম্পর্কে বোঝার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের শিক্ষানীতি, মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক কাঠামোয় নিজেদের অবস্থান নির্ণয়ে মুসলমানদের প্রচেষ্টা এবং ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিচয়ের রাজনীতির উত্থান—এই তিনটি প্রধান ফ্যাক্টর বিবেচনায় নিতে হবে।

গোড়াপত্তন

১৫২৮ সালে ভারতে মোগল শাসন শুরুর পূর্ব পর্যন্ত ভারতে মাদ্রাসাসহ ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রচলিত থাকলেও সেগুলোর সুনির্দিষ্ট কোনো ধরন ছিল না। যেহেতু ব্যবসা, অভিবাসন, ধর্মপ্রচার ও সামরিক আক্রমণের মতো নানা পন্থায় ইসলাম ভারতে এসেছে তাই, মাদ্রাসাগুলোর প্রকৃতি, ক্ষেত্র এবং ভূমিকা অঞ্চলভেদে ভিন্ন ছিল এবং তা মুসলিম ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ধরনের ওপর নির্ভর করত। যেমন ৭১১ সালে মুহাম্মদ বিন কাশিম এবং একাদশ শতাব্দীতে গজনির মাহমুদ উপমহাদেশের উত্তরাংশে আক্রমণ করেন। দস্যুদের দ্বারা আরব বাণিজ্য জাহাজ আক্রান্ত হলে বিন কাশিম সিন্ধ আক্রমণে প্ররোচিত হন, এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে সামরিক সংঘর্ষের বহু পূর্ব থেকেই বাণিজ্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। অন্যদিকে, ভারতের পূর্বাংশে; বিশেষত বাংলায় সপ্তম শতকের শুরু থেকেই সুফি, দরবেশ এবং পুণ্যাত্মাদের আগমন শুরু হয়েছিল (সাকলাইন, ১৯৯৩ : ৩)।[১]

কিছু ঐতিহাসিকের মতে, বিন কাশিমের আক্রমণের পর আরব বিশেষজ্ঞরা সিন্ধের বিখ্যাত শহরে—যেমন দেবাল এবং নতুন শহরে যেমন মনসুরা, যা ৭২৮ থেকে ৭৩৮-এর মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল—আসেন।[২] কিছু মতানুসারে যেখানে 'বিশেষজ্ঞরা দামেস্কের মতো হাদিস, তাফসির (কোরআনের ব্যাখ্যা) এবং ফিকাহ্ সাহিত্যের ওপর বক্তৃতা দিতেন সেখানেই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল' (কাউর, ১৯৯০ : ১৭)। কিন্তু এই দাবিকে সমর্থন করে এমন খুব কম প্রমাণই আছে। মুহাম্মদ ঘুরি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাংশে ভারতে তুর্কি শাসনের সূত্রপাত করেন। এই ঘুরিকেই প্রথম ১১৯১ সালে আজমিরে মাদ্রাসা স্থাপনের কৃতিত্ব দেওয়া হয় এবং এই মাদ্রাসাকে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক মাদ্রাসা হিসেবে বিবেচনা করা হয় (কাউর, ১৯৯০ : ১৮; সিকান্দ, ২০০৫ : ৩৩)।

১১৫৩-১১৫৪ সালে যখন তুর্কিরা গজনি দখল করে, তখন অনেক অভিজাত গজনি ও খুরাসান থেকে পালিয়ে লাহোর শহরে চলে যান। এই শরণার্থীদের মধ্যে

বিশেষজ্ঞরাও ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতি স্থানীয় সংস্কৃতি এবং শিক্ষাকে প্রভাবিত করেছিল (সিদ্দিকি, ২০০৫ : ৮)।

দিল্লি সালতানাতের, যা ১২০১ থেকে ১৫২৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল, অনেক শাসকই শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষণের প্রতি প্রশংসা প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মসজিদ ও ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন এবং কেউ কেউ রাজধানী দিল্লিসহ তাঁদের শাসনাধীন এলাকায় মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। তাঁর শাসনের প্রথম দিকে শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ (বা আলতামাস ১২১১-১২৩৬) দিল্লিতে প্রথম মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং মাদ্রাসা-ই-মুয়িজ্জি নামকরণ করেন। তুঘলক সাম্রাজ্যের (১২৯০-১৩০২) শাসকদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১) মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কাজে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছিলেন। তাঁর শাসনামলে দিল্লিতে প্রায় ১,০০০ মাদ্রাসা ছিল (আহমদ, ১৯৬৪ : ৪৪; কাউর, ১৯৯০ : ২১; সিকান্দ, ২০০৫ : ৩৩)।

যদিও এই মাদ্রাসাগুলো শুধু একজন শাসক দ্বারা স্থাপিত হয়নি, তবে মাদ্রাসাগুলো একই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ছিল—রাষ্ট্রীয় চাকরির জন্য মানুষকে শিক্ষিত করা—এবং এসব মাদ্রাসা মুসলিম বিশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলোর প্যাটার্ন সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করত।

বৃহত্তর অর্থে পড়াশোনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ছিল : ১. ব্যাকরণ, ২. সাহিত্য, ৩. যুক্তিবিদ্যা, ৪. ইসলামিক আইন এবং এর মূলনীতিসমূহ, ৫. কোরআনের ব্যাখ্যা, ৬. হাদিস, ৭. অতীন্দ্রিয়বাদ, ৮. স্কলাস্টিসিজম (ধর্মীয় দর্শন)। পাঠ্যবইয়ের অনেক টেক্সটই বাগদাদের মূল বিদ্যালয়ের টেক্সটের অনুরূপ ছিল, তবে পরবর্তী সময়ে বুখারা এবং মধ্য এশিয়ার খোয়ারিজমের বিশেষজ্ঞদের টেক্সটও বইগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল (নায়ার, ২০০৩ :২০১)।[৩]

এসব মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি, বিশেষত যেসব মাদ্রাসা উত্তরে অবস্থিত ছিল; আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে আগত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এ সময় মোগলরা এই ইসলামি শাসনের মূল কেন্দ্র এবং মাদ্রাসাগুলো লুণ্ঠন করেছিল। এই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অংশ হানাফি মাজহাব অনুসরণ করত। এর ফলে অনেকগুলো মাদ্রাসাও হানাফি মাজহাব অনুসরণ করছিল (সিকান্দ, ২০০৫ : ৩৩)। কিন্তু গোটা ভারতের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নয়, কারণ, যেমনটি আগে বলা হয়েছে, মাদ্রাসাগুলোর প্রকৃতি অঞ্চলভেদে বেশ ভিন্ন ছিল।

সময়ের পরিক্রমায় দিল্লিভিত্তিক শাসন দুর্বল হতে শুরু করলে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসংবলিত বেশ কিছু আঞ্চলিক সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটেছিল। দক্ষিণে, স্বাধীন মুসলিম রাজ্য দক্ষিণাপথ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দক্ষিণাপথের দক্ষিণাংশে অবস্থিত বাহমনি সালতানাত (বা বাহমনি সাম্রাজ্য) ১৩৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রায় ২০০

বছর স্থায়ী হয়েছিল এবং বেশ কয়েকটি মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য পরিচিত ছিল। এসব মাদ্রাসার প্রথমটি মাহমুদ শাহ ১৩৭৮ সালে নির্মাণ করেছিলেন (কাউর, ১৯৯০ : ২৪)। সবচেয়ে বিখ্যাত মাদ্রাসাটি শামসুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ বাহমনির (যিনি মুহাম্মদ শাহ তৃতীয় লাস্কারি নামেও পরিচিত, ১৪৬৩-১৪৮২) প্রধানমন্ত্রী খাজা মাহমুদ গাওয়ানের নির্দেশনায় বিদারে ১৪৭২ সালে নির্মিত হয়েছিল। এই মাদ্রাসার সুনাম সবচেয়ে বিখ্যাত ধর্মতাত্ত্বিক, দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীদের আকর্ষণ করেছিল। এই মাদ্রাসার একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, যা ভারতের অন্যান্য মাদ্রাসা থেকে ভিন্ন, এটি শিয়া মতবাদ সংহত করার প্রত্যাশায় নির্মিত হয়েছিল এবং এটি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। মাহমুদ গাওয়ানের নামানুসারে নামাঙ্কিত এই মাদ্রাসা পারস্যের স্থাপত্যকলার এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন ছিল। নানান বর্ণনা অনুসারে দক্ষিণে মাদ্রাসাগুলোর পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয় এবং সেক্যুলার উভয় ধরনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাধারণত এর একটি বড় কারণ হচ্ছে শিক্ষা খাতে শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা। উদাহরণস্বরূপ, মাহমুদ শাহ প্রতিষ্ঠিত প্রথম মাদ্রাসায় এতিমদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, থাকা এবং খাবারের খরচ রাষ্ট্র বহন করত এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারি ভর্তুকি দেওয়া হতো।

বাংলায় দিল্লির সালতানাতের সময় ইসলামি শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ শুরু হয়, কিন্তু এর ভিত্তি পূর্ববর্তী সময়ে সুফি ও দরবেশদের আগমনের সময়েই নির্মিত হয়েছিল। সাধারণত সুফি এবং দরবেশরা এই অঞ্চলের বাইরে থেকে আসতেন এবং তাদের খানকা হতে (তাদের বসবাস এবং প্রার্থনার স্থান) সমন্বিত শিক্ষা কেন্দ্র তৈরি করতেন (ল, ১৯১৬ : ১৯)। এসব জমায়েত, যা আরবে ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় হলখার সদৃশ ছিল, প্রাথমিকভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ছিল এবং নির্দিষ্টভাবে কোরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা আলোচিত হতো। এসব জমায়েত কোনো ভাষায় অক্ষরজ্ঞান বা প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তে পরিচালিত হতো না। শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় এসব খানকা সুফি ও দরবেশদের এবং তাদের স্থানীয় অনুসারীদের পৃষ্ঠপোষকতার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। ফলে কোনো সুফি বা দরবেশ কোনো স্থান ত্যাগ করলে, তাঁর সঙ্গে তাঁর খানকা, বিশেষত শিক্ষার উদ্দেশ্যে হওয়া জমায়েতও বন্ধ হয়ে যেত এবং তাঁর নতুন গন্তব্য আরেকটি খানকা বা শিক্ষা জমায়েত শুরু হতো। সময়ের পরিক্রমায় এসব খানকার কিছু কিছু প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়, তখন এগুলোর নাম হয় মক্তব। মসজিদে এবং যেসব মুসলিম নিজেদের ঘরে জায়গা দিতে পারতেন, সেখানেও মক্তব তৈরি হতো।

এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মক্তবগুলো চালু হওয়ার আগে বাংলায় একটি দেশজ শিক্ষাপদ্ধতি বিকশিত হচ্ছিল। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ছিল টোল, প্রাথমিকভাবে এখানে হিন্দুধর্মীয় রীতিনীতি শেখানো হতো। এসব প্রতিষ্ঠান

ছিল শিশুদের স্বাক্ষরতা এবং ধর্মীয় শিক্ষাদানের সামাজিক উদ্যোগ। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত এবং এই ব্যক্তিকে বলা হতো গুরু (সংস্কৃত ভাষায় এর অর্থ শিক্ষক)। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত ভাষা শেখার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় করত। বাংলায় দ্বাদশ শতাব্দীর পর বিকাশ লাভ করা আরেক ধরনের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পাঠশালা। পাঠশালার পাঠ্যসূচি তুলনামূলক সেক্যুলার ছিল। ভাষা, মৌলিক গণিত, কৃষি ও নৌকা নির্মাণ দক্ষতা এবং এ রকম বিষয়গুলো দিয়ে পাঠ্যক্রম সাজানো হতো। ফলে দেখা যাচ্ছে, বাংলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বেশ আগেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রথমে মক্তব এবং পরে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১১৯৭ সালে ইখতিয়ার বিন বখতিয়ার খিলজির সামরিক অভিযান বাংলায় পৌঁছার আগে পর্যন্ত মক্তব এবং মাদ্রাসাগুলো সম্প্রদায়ভিত্তিক এবং সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতানির্ভর প্রতিষ্ঠান ছিল। বখতিয়ার খিলজি বাংলায় তাঁর শাসন বিস্তার করার পর রংপুরা নামে নতুন একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেখানে অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকটি মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন (কাউর, ১৯৯০ : ৩০)। তাঁর উত্তরসূরিরা তাঁকে অনুসরণ করেন এবং আরও অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন মক্তবে তাঁদের সাহায্যও বৃদ্ধি করেছিলেন (রহিম, ১৯৮২ : ১৬৪)।

এরপরের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে দিল্লির সালতানাতের অধীনে ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যে বিস্তার শুরু হয়েছিল, তা সালতানাতের ক্রমদুর্বলতা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কাঠামোর উত্থান সত্ত্বেও অব্যাহত ছিল। এই বিস্তারের একটি কারণ ছিল আঞ্চলিক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা, তবে তা একমাত্র কারণ ছিল না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধর্মপ্রচারকদের উপস্থিতির কারণে এবং অন্য ক্ষেত্রে শিশুদের শিক্ষাদানের নিমিত্তে সামাজিক উদ্যোগ হিসেবে মাদ্রাসার উত্থান ঘটে।

এটা উল্লেখযোগ্য যে এসব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনো একক আদর্শ কাঠামো অনুসরণ করা হয়নি এবং এসব মাদ্রাসা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত। পাঠ্যসূচি নির্ধারণে মাদ্রাসাগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। উপরন্তু, 'প্রেরিত' এবং 'যৌক্তিক' উভয় ধরনের বিজ্ঞানই এসব মাদ্রাসায় শেখানো হতো। এ ক্ষেত্রে যুক্তি ছিল, এই দুটি বিজ্ঞান কোনো না কোনোভাবে পরস্পরের বিরোধী বা সমকালীন অন্যান্য মুসলিম সমাজের মতো মধ্যযুগের ভারতীয় মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় এবং সেক্যুলার বিশ্বের মধ্যকার বিদ্যমান স্পষ্ট পার্থক্য অনুপস্থিত ছিল (সিকান্দ, ২০০৫ : ৩৪)।

উভয় ধরনের বিজ্ঞানশিক্ষা মাদ্রাসা স্নাতকদের রাজসভা এবং প্রশাসনের নানান বিভাগে চাকরি লাভের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল। মাদ্রাসা ছাড়াও মক্তব স্থাপনও আলোচিত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান বাল্যশিক্ষা বা কিন্ডারগার্টেনের সমমানের ছিল, কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে শুধু কোরআন মুখস্থ করা শেখানো হতো।

মোগল সাম্রাজ্যের (১৫৫৬-১৮৫৮) অধীনে মাদ্রাসা

মোগল সাম্রাজ্যের (১৫৫৬-১৮৫৮) সময় মাদ্রাসার সংখ্যা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মোগল সাম্রাজ্য প্রায় ২০০ বছর উৎকর্ষের শিখরে ছিল এবং এর বিস্তৃতি একটি মহাদেশের চেয়ে কম ছিল না। এর প্রাথমিক কারণ ছিল শাসক নিরপেক্ষভাবে রাজসভার সমর্থন প্রদান। মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে, বিশেষত ১৬০০ শতাব্দীতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার পেছনে আরও দুটি বিষয়ের ভূমিকা রয়েছে। প্রথমত, ক্ষমতার এককেন্দ্রিক সংহতকরণ এবং ফলে কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের ফলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা; দ্বিতীয়ত, প্রভাবশালী ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে একই সঙ্গে সুফি এবং ওলামাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব। সার্বিকভাবে মাদ্রাসাগুলো সম্রাট এবং সাধারণ মানুষ সবার কাছ থেকেই পৃষ্ঠপোষকতা ও শ্রদ্ধা পেত।

মোগল আমল দুটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল : শিক্ষাক্ষেত্রে দুটি পরস্পরবিরোধী ধারার উপস্থিতি এবং একটি ঐতিহ্যকে মাদ্রাসা পাঠ্যসূচির সঙ্গে একত্রীকরণ। শিক্ষাক্ষেত্রে একটি ধারা সমাজের একটি বড় অংশকে শিক্ষার সুযোগ দিতে নিয়োজিত ছিল এবং অন্য একটি ধারা ওই একই জনগোষ্ঠীকে সমকালীন অন্যান্য অঞ্চলে, বিশেষত ইউরোপে ঘটে যাওয়া প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জ্ঞান থেকে বিরত রাখত। মাদ্রাসাশিক্ষার ক্ষেত্রে মাকুলাত (যৌক্তিক বিজ্ঞান) ঐতিহ্যকে অবহেলা করে বারবার মানকুলাত (প্রকাশিত/প্রেরিত জ্ঞান) ঐতিহ্যকে সংহত করা হয়েছিল। মজার বিষয় হচ্ছে, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে মাকুলাতের অধ্যয়নই ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছিল।

প্রভাবশালী ঐতিহাসিক বয়ান অনুসারে শিক্ষা বিস্তার মোগল শাসকদের অন্যতম প্রাধান্যপ্রাপ্ত বিষয় ছিল। নরেন্দ্র নাথ ল, মুসলিম শাসনাধীন ভারতে শিক্ষার ওপর তাঁর বীজগর্ভ কাজের উপসংহারে বলেন, 'প্রায় সব মোগল শাসকই মানুষের শিক্ষা এবং জ্ঞানের বিস্তারের বিষয়ে খুবই আগ্রহী ছিলেন' (ল, ১৯১৬ : ১৯০)। শাসকেরা নানান স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। বাবরের (১৫২৬-১৫৩০) রাজকীয় নথি থেকে দেখা যায় যে শিক্ষাকে প্রজাদের প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো। অনেক মানুষের কাছে শিক্ষাকে সহজলভ্য করতে আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি একটি 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পরিবেশন দপ্তর' স্থাপন করেছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কার কার্যক্রম চালু করেছিলেন (ইকরাম, ১৯৬৪ : ১৫৪)।

জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭) একটি আইন প্রবর্তন করেছিলেন। এই আইন অনুসারে কোনো ধনী ব্যক্তি বা ধনী পরিব্রাজক যদি উত্তরাধিকারী না রেখে মৃত্যুবরণ করতেন, তবে তাঁর সব সম্পত্তি রাজকোষে জমা করা হতো এবং তা মাদ্রাসা ও

আশ্রম নির্মাণ এবং মেরামতের কাজে ব্যবহার করা হতো। জান জাহান খান তাঁর তারিখই-জান-জাহানু-এ বর্ণনা করেছেন যে 'জাহাঙ্গীর ৩০ বছর পাখি এবং জন্তু বাস করত এমন মাদ্রাসাও মেরামত করেছিলেন এবং সেগুলোকে ছাত্র ও শিক্ষকে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন'।[৪] শিক্ষাক্ষেত্রে সম্রাট শাহজাহানের (১৬২৭-১৬৫৮) সবচেয়ে প্রশংসিত কাজ হচ্ছে ১৬৫০ সাল নাগাদ দিল্লিতে ইম্পেরিয়াল কলেজ স্থাপন (ল, ১৯১৬ : ১৯০)। মোগল আমলে রাজকীয় সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অভিজাত ও ধনী ব্যক্তিরাও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করত। ফলে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বিস্ময়কর বিকাশ ঘটে এবং রাজসভায় ওলামারা একটি সম্মানজনক স্থান দখল করে। প্রায়ই সামরিক অভিযানের সময় রাজারা পণ্ডিতদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন।[৫]

রাষ্ট্র এবং ওলামাদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মোগল সাম্রাজ্যের একক কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না, অটোমান এবং সাফাভিদ সাম্রাজ্যেও এই একই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এবং তা শুধু রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতার প্রতি ঝোঁকের ফসলও ছিল না। নিজ পেশায় সফলতা লাভ এবং নিজের ধর্মীয় ধারণা ও মতামতের বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করতেও ওলামারা রাষ্ট্রের অংশ হতে আগ্রহী ছিলেন (মেটকাফ, ১৯৮২ : ২১-২২)। তবে এই সম্পর্ক সব সময় অনুকূল ছিল না, আসলে মাঝে মাঝে সম্রাট এবং ওলামাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিত।

যদিও শিক্ষা, শিল্পকলা, সংগীত এবং স্থাপত্যকলার পৃষ্ঠপোষকতা করা মোগল শাসকদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল, তবে তাঁরা নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি রপ্ত করতে উৎসাহী ছিলেন না এবং সমকালীন আবিষ্কারগুলো ব্যবহারে পিছিয়ে ছিলেন। সাইয়্যিদ নাকি হুসেইন জাফরির মতে, 'নতুন ধারণা এবং প্রযুক্তি গ্রহণের বিষয়ে বলতে গেলে, মোগলরা...অত বেশি আগ্রহী ছিলেন না' (জাফরি, ২০০৬ : ৪৬)। জাফরি তার যুক্তির সমর্থনে যে উদাহরণগুলো দিয়েছেন সেগুলো হলো পর্তুগিজ মিশনারিদের একটি প্রতিনিধিদল যখন আকবরকে ছাপানো কাগজ উপহার দিয়েছিল, তখন আকবর ছাপাখানা স্থাপনে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং ফরাসি রাজকীয় প্রতিনিধিদল যখন জাহাঙ্গীরকে যান্ত্রিক ঘড়ি উপহার দিয়েছিল, তিনি তখন এই ঘড়ির প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়েছিলেন। 'এই দুটি উদাহরণ শুধু এ জন্য দেওয়া হলো যে যাতে বোঝা যায় শাসক এবং ক্ষমতা একটি জাতির অগ্রাধিকারের তালিকা কীভাবে পরিচালিত এবং প্রভাবিত করে' (জাফরি, ২০০৬ : ৪৭)। জাফরি আরও বিশ্বাস করেন যে অন্যান্য অঞ্চলের পূর্বেকার মুসলিম শাসকদের সঙ্গে তুলনা করলে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যত্যয় ছিল (জাফরি, ২০০৬ : ৪৭)।

সুতরাং, মোগল শাসনামলে শিক্ষার বিস্তার সত্ত্বেও, শিক্ষার উপকরণসমূহে হালনাগাদ জ্ঞান, বিশেষত প্রযুক্তিগত জ্ঞান, প্রতিফলিত হতো না। এর প্রাথমিক

কারণ ছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ইউরোপীয় ভাষাগুলো শিক্ষা দিতে অসম্মত ছিল।

মোগল সাম্রাজ্যের প্রাথমিক দিনগুলোতে সবার জন্য শিক্ষার প্রসারে যে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার ধারা ছিল তা সময়ের বিবর্তনে পাল্টে যায় এবং মোগল আমলের শেষ দিকে তা সহধর্ম বিশ্বাসীদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিবর্তিত হয়। '[ভারতীয়] ইতিহাসে সম্ভবত প্রথমবার, আমরা আকবরের মতো একজন মুসলিম শাসক দেখতে পাই, যিনি অকপটে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই শিক্ষা বিস্তারের বিষয়ে উদগ্রীব ছিলেন' (ল, ১৯১৬ : ১৬০)। আকবর মাদ্রাসাসহ নানান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, যেখানে হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করত। হিন্দু শিশু এবং যুবরা যাতে তাদের ধর্ম এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে শিখতে পারে, সেটা নিশ্চিত করতে রাজসভা নিয়মানুগ নীতিমালা অনুসরণ করত। মুসলিম পণ্ডিতদের মতো হিন্দু পণ্ডিতেরাও প্রায় সমান রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন। এই কাজগুলো আকবরের অন্য নীতিমালা এবং অন্য ধর্মের প্রতি তাঁর আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। যেমন হিন্দু তীর্থযাত্রীদের ওপর কর এবং জিজিয়া (অমুসলিমদের ওপর মাথাপিছু কর) মওকুফ। তিনি যেসব ইবাদতখানা (প্রার্থনার স্থান) নির্মাণ করেছিলেন সেগুলোতে বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ককে তিনি উৎসাহিত করতেন। আকবর দ্বিন-ই-ইলাহি (ঐশ্বরিক বিশ্বাস) নামে একটি নতুন ধর্ম প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন এবং এর পেছনে আকবরের, অন্যান্যের মধ্যে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যকার বিদ্যমান পার্থক্য কমানোর ইচ্ছাও প্রতিফলিত হয়। (আকবরের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ব্যাভেরিজ [১৯৭৭] অনূদিত আবুল ফজলের তিন খণ্ডের আকবরনামা দেখুন)।

জাহাঙ্গীরের শাসনামলে পাঠ্যসূচির পরিবর্তন হয়, বিশেষত যুক্তিবাদী শিক্ষাক্রমের ওপর জোর দেওয়া চলতে থাকে, কিন্তু তা গোঁড়া ওলামাদের বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। কিছু ওলামা, যেমন আকবরের শাসনামলে শাইখ আবদউল-হক মানকুলাত ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে শাইখ আবদউল-হক 'আকবরের রাজসভার অসংযত পরিবেশ থেকে বাঁচতে' হিজাজে পালিয়ে গিয়েছিলেন (রবিনসন, ২০০১ : ১৪)।

আকবর এবং জাহাঙ্গীরের বিপরীতে, আওরঙ্গজেবের শাসনামল মোগল সাম্রাজ্যের একটি কম সহিষ্ণু পর্বের প্রতিনিধিত্ব করে। আওরঙ্গজেব হিন্দুদের শিক্ষার বিষয়ে খুব একটা চিন্তিত ছিলেন না। ১৬৬৯ সালে তিনি হিন্দুদের বিদ্যালয় এবং মন্দির ধ্বংস করতে প্রাদেশিক গভর্নরদের আদেশ দিয়েছিলেন (ফারুকি, ১৯৩৫ :১১৭; উদ্ধৃত হয়েছে, ইকরাম, ১৯৬৪ : ১৯৯)। তিনি মুসলিম যুবকদের শিক্ষায় উৎসাহিত করতে এবং ইসলামিক শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে সাগ্রহে চেষ্টা করেছিলেন (লেইন-পোল, ১৯৯০)। মুসলিম শিক্ষার্থীরা বৃত্তি হিসেবে রাজকীয়

সাহায্য পেতেন। রাজা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য দিতেন এবং কোনো কোনো সময় প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ীভাবে সাহায্য করার জন্য জায়গির দেওয়া হতো। আওরঙ্গজেব, যিনি তাঁকে তাঁর শিক্ষকদের প্রদত্ত শিক্ষা নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁর শাসনামলে অসংখ্য মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন (বার্নিয়ার, ১৯১৪ : ১৫৬)।

আকবরের শাসনামলে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন এবং মীর ফতেউল্লাহ সিরাজির পৃষ্ঠপোষকতায় পাঠ্যসূচির সংস্কার। প্রথম উল্লেখিত পরিবর্তনের লক্ষ্য ছিল মক্তবের শিক্ষায় নিছক মুখস্থের পরিবর্তে অনুশীলনের মাধ্যমে শেখার চর্চা চালু করা। আকবর, তাঁর আইন-ই-আকবরিতে (১৯০৭) একটি পদ্ধতির প্রস্তাব করেছিলেন, যেখানে বোঝার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল : 'শিক্ষার্থীর এমনভাবে যত্ন নিতে হবে, যাতে সে নিজেই সবকিছু বুঝতে পারে; তবে শিক্ষক তাকে (শিক্ষার্থীকে) কিছুটা সাহায্য করতে পারে'। মাদ্রাসা পাঠ্যসূচির সংস্কার প্রধানত মীর ফতেউল্লাহ সিরাজির অবদান ছিল। সিরাজি একজন পণ্ডিত ছিলেন, যিনি প্রাথমিকভাবে ১৫০০ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইরানের সিরাজ শহর থেকে দক্ষিণাঞ্চলীয় এক মুসলিম সালতানাতে চলে এসেছিলেন। সংস্কারের পরে মাদ্রাসা পাঠ্যসূচিতে নীতিশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, কৃষি, ওষুধ, যুক্তিবিদ্যা এবং প্রশাসনের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বৈয়াকরণ (ব্যাকরণ), বিদায়ন্ত (দর্শন)সহ সংস্কৃতের অধ্যয়ন এবং পতান্‌জালির (যোগশাস্ত্র) শিক্ষা দেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল (ল, ১৯১৬ : ১৬১-১৬২; সুফি, ১৯৪১ : ৫৩)। অষ্টাদশ শতকের ঐতিহাসিক আলী আজাদ বিলগ্রামির ভাষ্যমতে, আকবরের রাজসভায় সিরাজির পৌঁছানোর পর 'মাকুলাতের অধ্যয়ন বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল' এবং ইকরামের মতে 'আকবরের শাসনামলে "মানসিক বিজ্ঞানসমূহ"—যুক্তিবিদ্যা, দর্শন এবং দার্শনিক ধর্মতত্ত্ব—এক নতুন গুরুত্ব ধারণ করেছিল' (বিলগ্রামি, উদ্ধৃত হয়েছে হুসেইন, ২০০৫ : ২৫; ইকরাম, ১৯৬৪ : ২৩৮)।

আকবর যে সমন্বয় প্রচেষ্টা এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, আওরঙ্গজেবের আমলে এসে তা পিছু হটে; কারণ তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম ঐতিহ্যবাহী ইসলামিক রীতিনীতি অনুসারে করার চেষ্টা করেছিলেন এবং 'উত্তরাধিকারের জন্য বিরোধের সময় তার লেখা কিছু চিঠিতে তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি যে কাজ করছেন তা "সত্য বিশ্বাস এবং রাজ্যের শান্তির জন্য"' (ইকরাম, ১৯৬৪ : ১৮৯)। তবে আওরঙ্গজেবের আমলের একটি ঘটনা যুক্তিবাদী বিজ্ঞান অধ্যয়নের ঐতিহ্যকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল : লক্ষ্ণৌতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ফারাঙ্গি মহল স্থাপন।[৬] যে ভবনে ফারাঙ্গি মহল অবস্থিত ছিল, তা ইতিপূর্বে এক ইউরোপীয় বণিকের মালিকানাধীন ছিল এবং আওরঙ্গজেব এই ভবনটি মোল্লা কুতুবুদ্দিন

সিহালবির পরিবারকে দান করেছিলেন। সিহালবি ছিলেন যুক্তিবাদী বিজ্ঞানের এক অগ্রগণ্য পণ্ডিত এবং অনেক বিষয়ে রাজসভা তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করত। ভূমিসংক্রান্ত দ্বন্দ্বে ১৭০০ শতকের শেষের দিকে তাঁর মৃত্যু হলে রাজা এই ভবনটি সিহালবির পরিবারকে দান করেন। সিহালবির তৃতীয় পুত্র মোল্লা নিজামুদ্দিন সিহালবি ১৮০০ শতকের শুরুর দিকে এই স্থানটিকে একটি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। মোল্লা নিজামুদ্দিন একটি পাঠ্যসূচির গোড়াপত্তন করেছিলেন, যা পরবর্তী সময়ে দারসে-নিজামি নাম ধারণ করেছিল। এই পাঠ্যসূচি যুক্তিবাদী বিজ্ঞানসমূহকে শিক্ষার মূল বিষয়ে পরিণত করেছিল। রবিনসন দারসে-নিজামির মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর জোর দিয়ে বলেন :

> নিছক মুখস্থ করে শেখার চেয়ে শিক্ষার্থীদের চিন্তা করতে উৎসাহিত করার মাধ্যমে এই পাঠ্যসূচি তাঁদের মাদ্রাসার সাধারণ শিক্ষা আরও দ্রুতগতিতে শেষ করতে সক্ষম করেছিল। একই সঙ্গে তাঁরা কোনো সমস্যার মূলে পৌঁছান, যুক্তি প্রদর্শন এবং আইনশাস্ত্র ব্যবহারে নমনীয়তার জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন (রবিনসন, ২০০১ : ১৪-১৫)।

দুটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, ফারাঙ্গি মহল কোনো সংগঠিত মাদ্রাসা ছিল না (১৯০৫ সাল পর্যন্ত), বরং ফারাঙ্গি মহল পরিবারের সদস্যরা তাঁদের কাছে যেসব শিক্ষার্থী আসত তাদের নিজেদের ঘরেই শিক্ষা দিতেন (রবিনসন, ২০০১ : ৭১)। দ্বিতীয়ত, পাঠ্যক্রম থেকে প্রকাশিত জ্ঞান, মানকুলাত, বাদ পড়ে যায়নি, কিন্তু 'পাঠ্যসূচির ধর্মীয় অংশটি ক্লাসিক্যাল টেক্সটের সমন্বয়ে গঠিত ছিল' (নায়ার, ২০০৩ : ২২৩)।

আওরঙ্গজেবের প্রকাশ্যে গোঁড়া ইসলাম অনুকরণকে বিবেচনায় নিলে, ফারাঙ্গি মহল স্থাপনে তাঁর সমর্থন, বলতে গেলে, কৌতূহলের বিষয়ই বটে। একই রকম উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আওয়াধের নবাবদের ভূমিকা; যারা ফারাঙ্গি মহলের অস্তিত্ব বজায় রাখা এবং দারসে-নিজামি পাঠ্যসূচি গৃহীত হওয়া সম্ভবপর করে তুলেছিল। এটা মনে রাখা ভালো যে নবাবরা শিয়া ছিলেন। এটাও অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে মাদ্রাসাগুলোতে প্রাণ সঞ্চারে আওরঙ্গজেবের প্রাথমিক সহযোগিতা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিল এবং যেসব শিক্ষার্থী ফারাঙ্গি মহলে পড়তে আসত, তাদের থাকার খরচ মোগল শাসকেরাই বহন করতেন।

১৮০০ শতকের প্রথম নাগাদ ফারাঙ্গি মহল ভারতের অন্যতম বড় শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয় এবং লক্ষ্ণৌর বাইরে থেকেও অনেক শিক্ষার্থী সেখানে পড়াশোনা করতে আসত। গোটা ১৮০০ শতক এবং ১৯০০ শতকের প্রথম ভাগে ফারাঙ্গি মহল থেকে শুরু হওয়া যুক্তিবাদী ঐতিহ্য বিস্তৃতি লাভ করে এবং দারসে-নিজামি মাদ্রাসাশিক্ষার কার্যত আদর্শ পাঠ্যসূচিতে পরিণত হয়। শুরু থেকেই নিজামি পাঠ্যসূচির ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার দুটি কারণ ছিল : প্রথমত, এটা শিক্ষার্থীদের চাকরি পেতে, বিশেষত

সরকারি চাকরি পেতে সক্ষম করেছিল। 'এটা [দারসে-নিজামি] যে দক্ষতাগুলো শিক্ষা দিত সেগুলোর, ১৭০০ এবং ১৮০০ শতকে ভারতের ক্রমবর্ধমান বাস্তবধর্মী ও জটিল আমলাতন্ত্রে চাহিদা ছিল'; দ্বিতীয়ত, ফারাঙ্গি মহল পরিবারের সদস্যরা গোটা ভারত 'রাজসভা থেকে রাজসভায়, এক পৃষ্ঠপোষকের কাছ থেকে অন্য পৃষ্ঠপোষকের কাছে শিক্ষাদানের সুযোগের খোঁজে' ভ্রমণ করতেন এবং নিজেদের শিক্ষাদানে নিয়োজিত রাখতেন। এভাবেই দ্রুতগতিতে শিক্ষার্থীসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল (রবিনসন, ২০০১ : ৫৩, ২৩)।[৭]

মোগল সাম্রাজ্যের পরবর্তী দিনগুলোতে যুক্তিবাদী বিজ্ঞান অধ্যয়নের জনপ্রিয়তা ক্ষয় হতে শুরু করে এবং ১৮০০ শতকে মানকুলাত ঐতিহ্য—যে ঐতিহ্যে প্রেরিত বিজ্ঞানের ওপর জোর দেওয়া হয়—যুক্তিবাদী বিজ্ঞানের জায়গা দখল করা শুরু করে। এটা অনেকাংশে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভির (১৭০৩-১৭৬২) চিন্তা এবং তিনি যেখানে ১২ বছরেরও বেশি সময় শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই মাদ্রাসা-ই-রাহিমিয়ার ভূমিকার ফলে সম্ভব হয়েছিল।[৮] তবে মাদ্রাসাটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যখন শাহ ওয়ালিউল্লাহর ছেলে শাহ আবদ আল-আজিজ (১৭৪৬-১৮২৩) এর প্রধান হন।

১৭১৯ সালে বাবার মৃত্যুর পর, ১৭ বছর বয়সে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মাদ্রাসার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সে নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়ার কারণেই, শাহ ওয়ালিউল্লাহ জীবনের এই পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান হতে পেরেছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর, ওয়ালিউল্লাহ তাঁর বাবার কাছ থেকে যুক্তিবিদ্যা, ফিকাহ, হাদিস, তিব (পূর্বাঞ্চলীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান), বীজগণিত, গণিত এবং বাগ্মিতার জ্ঞান নিয়েছিলেন (শাহ ওয়ালিউল্লাহর জীবন এবং কাজ সম্পর্কে জানতে দেখুন, জালবানি [১৯৬৭], রিজভি [১৯৮০] এবং গাজী [২০০৪]। সংক্ষিপ্ত বর্ণনার জন্য দেখুন, মেটকাফ [১৯৮২ : ৩৫-৪৩])। ১২ বছর শিক্ষকতা করার পর ১৭৩১ সালে তিনি আরবে গিয়েছিলেন; সেখানে তিনি আড়াই বছর অবস্থান করেন এবং মদিনার হাদিসবিষয়ক পণ্ডিত মুহাম্মদ হায়া আল-সিন্ধির (মৃত্যু ১৭৫০) অধীনে অধ্যয়ন করেন।[৯] ভারতে ফিরে আসার পর, লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করার আগে তিনি মাদ্রাসা-ই-রাহিমিয়াতে তিন বছর শিক্ষকতা করেছিলেন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মাদ্রাসা-ই-রাহিমিয়ার সৃষ্ট একজন মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর ধারণা অনুসারেই মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি গঠিত হয়েছিল। তিনি তাঁর সমকালীন এবং তারপরের মুসলিম জ্ঞানসাধনায় স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিলেন। তিনি অল্প কয়েকজন পণ্ডিতদের মধ্যে একজন, যাঁর ধারণাসমূহ এখনো ইসলামিক কর্মী এবং পণ্ডিতদের মধ্যকার বিতর্কের বিষয়। ওয়ালিউল্লাহর ভাবনার প্রাথমিক বিষয় ছিল সে সময়কার মুসলমানের নৈতিক এবং রাজনৈতিক অধঃপতন। ওয়ালিউল্লাহ আওরঙ্গজেবের পর মোগল সাম্রাজ্যের বিভেদ, ছোট রাজ্যগুলোর উত্থান, নাদির

শাহর আক্রমণ (১৭৩৯) এবং মুসলমানদের মধ্যে ধর্মপরায়ণতার অভাবকে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংকট হিসেবে দেখেছিলেন এবং এ অধঃপতনের কারণগুলো ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি আইনশাস্ত্র, সুফিজম, হাদিস গবেষণা এবং ওলামা ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্কের মতো বিষয়সহ অন্য আরও অনেক বিষয়ের ওপর বিস্তৃতভাবে লেখালেখি করেছিলেন (দাল্লাল, ১৯৯৩)। তিনি ফার্সিতে কোরআনের অনুবাদও করেছিলেন। ওয়ালিউল্লাহ হাদিস গবেষণার ওপর জোর প্রদান, মাকুলাতকে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি, ওলামাদের ওপর গ্রিক দার্শনিকদের প্রভাবের এবং মুসলমানদের স্থানীয় প্রথাগুলোকে বিদাত (অবৈধ প্রবর্তন) হিসেবে সমালোচনা, তাঁর অনুসারীদের মধ্যে এবং মাদ্রাসা-ই-রাহিমিয়াতে প্রকাশিত বিজ্ঞানসমূহের অধ্যয়নকে জোরদার করেছিলেন। এসব কাজের গুরুদায়িত্ব ছিল তাঁর ছেলে আবদ আল-আজিজের ওপর, যিনি ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতকে দারুল হরব (যুদ্ধকবলিত স্থান) ঘোষণা করেছিলেন।

ফলে, মোগল শাসনামলের শেষ নাগাদ মাদ্রাসাশিক্ষার পাঠ্যসূচিতে মানকুলাত ঐতিহ্য তার প্রভাবশালী অবস্থান আবার ফিরে পেয়েছিল। এটা বলা হচ্ছে না যে তত দিনে মাকুলাত ঐতিহ্য বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, কারণ তখনো ফারাঙ্গি মহল চালু ছিল এবং বিভিন্ন মাদ্রাসায় দারসে-নিজামি পাঠ্যসূচির বিভিন্ন সংস্করণ অনুসরণ করা হতো। তবে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শাহ ওয়ালিউল্লাহর ধারণাসমূহের অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যা হোক, এটা স্বীকার করা প্রয়োজন যে মোগল আমলে মাদ্রাসাগুলো এবং ওলামারা প্রকাশিত ধারার জ্ঞানের অধ্যয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন; 'তাদের অবদান এমনকি মুসলিম বিশ্বেও গুরুত্বপূর্ণ' (জাফরি, ২০০৬ : ৫১)।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে মাদ্রাসা

ঔপনিবেশিক প্রশাসনের শিক্ষানীতি, মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক কাঠামোয় নিজেদের অবস্থান নির্ণয়ে মুসলমানদের প্রচেষ্টা এবং ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিচয়ের রাজনীতির উত্থান, ঔপনিবেশিক ভারতে মাদ্রাসাগুলোর প্রকৃতি, প্রসার এবং ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছিল। ফলে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতে মাদ্রাসার ইতিহাস তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি; বিশেষত ঊনবিংশ শতকের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল এবং তা অবশ্যই ওপরে উল্লেখিত তিনটি ফ্যাক্টরকে বিবেচনায় রেখে আলোচিত হতে হবে।

পলাশীর যুদ্ধের নয় বছর পর, এ যুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনীর হাতে বাংলার নবাব পরাজিত হয়েছিলেন এবং ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের

সূচনা হয়েছিল, ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল।[১০] ১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, দিল্লিকেন্দ্রিক মোগল সাম্রাজ্য চরম অধঃপতনের মুখে পড়েছিল এবং রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বস্তুত অকার্যকর হয়ে গিয়েছিল। পরিণতিতে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নীতিগত পদক্ষেপগুলো, প্রাথমিকভাবে যা ভারতের পূর্বাংশের (বাংলা, বিহার এবং ওডিশা) জন্য কার্যকর ছিল, ভবিষ্যতে গোটা ভারত শাসন করার বুনিয়াদ নির্মাণ করেছিল।

যদিও ১৮১৩ সালের চার্টার অ্যাক্টের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সরাসরি এবং প্রলম্বিত হস্তক্ষেপ শুরু হয়, তবে তা রীতিমতো বিতর্কের পর এবং অন্য অনেক পদক্ষেপের ফলে সম্ভব হয়েছিল। শাসনভার গ্রহণের প্রাথমিক দিনগুলোতে কোম্পানি শিক্ষা খাতের সঙ্গে নিজেদের দূরত্ব বজায় রেখেছিল। এর ফলে রাষ্ট্রীয় সংশ্লিষ্টতার বাইরে সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সরাসরি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মোগল আমলে পাঠশালা, মক্তব বা মাদ্রাসার মতো যেসব ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল, সেগুলো কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারছিল। নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালুর উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল। এ উদ্যোগগুলো প্রধানত খ্রিষ্টান মিশনারিরা নিতেন। উদাহরণস্বরূপ, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সমীহ জাগানো রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত হওয়ার আগেই, ১৭০২ সালে কলকাতায় প্রথম মিশনারি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। পলাশীর যুদ্ধের পরপরই রবার্ট ক্লাইভ কলকাতায় স্কুল খোলার জন্য মাদ্রাজের এক মিশনারি কর্মীকে আমন্ত্রণ জানান। ১৭৫৯ সালে, দ্বিতীয় বছরে স্কুলটিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৭৪ জনে, যেখানে প্রথম বছর এই স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪৮ জন (ইসলাম, ২০০২ : ২৭)।

যা হোক, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মিশনারি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখত, ধর্মান্তরিতকরণের বিরোধিতা করত এবং কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের মধ্যেই মিশনারি কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ রেখেছিল (আলি, ১৯৬৫; লেয়ার্ড, ১৯৭২)। মিশনারি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে কোম্পানির অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন হতো এবং একই সঙ্গে নানা পন্থায় কোম্পানি মিশনারি কর্মকাণ্ডকে নিরুৎসাহিতও করত। এই নীতি অবশ্যই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিল :

> ধর্মীয় বিশ্বাসে অনধিকারচর্চা ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে—এই ভয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার প্রজা এবং ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের কাছে এটা পরিষ্কার করেছিল যে বিদ্যমান ধর্মীয় বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ বা খাটো করতে কোম্পানি ভারতে আসেনি (শেঠ, ২০০৭ : ২৭-২৮)।

তা সত্ত্বেও, পরবর্তী বছরগুলোতে মিশনারিরা শিক্ষানীতিকে প্রভাবিত করেছিল, বিশেষত শিক্ষাদানের মাধ্যম বিষয়ে। উপরন্তু, মিশনারিদের উপস্থিতি এবং কর্মকাণ্ড হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল এবং সংস্কার

আন্দোলনগুলোকে ত্বরান্বিত করেছিল।

কোম্পানির ধর্মীয়ভাবে নিরপেক্ষ থাকার ঘোষণা সত্ত্বেও, শিক্ষাক্ষেত্রে কোম্পানি সরাসরি সম্পৃক্ত হয় ১৭৮০ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের, বাংলার গভর্নর জেনারেল, পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপনের মধ্য দিয়ে। মাদ্রাসা স্থাপনের পেছনে যৌক্তিকতা বর্ণনা করে হেস্টিংসের দেওয়া বিবৃতিতে দেখা যায় যে এই সিদ্ধান্তের পেছনে রাজনৈতিক বিবেচনা চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। মাদ্রাসাটি স্থাপন করা হয়েছিল কলকাতার মুসলমানদের সন্তুষ্ট করতে...মুসলমান ভদ্রলোকদের ছেলেদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় চাকরির জন্য যোগ্য করে গড়ে তুলতে এবং কোর্ট অব জাস্টিসের জন্য দক্ষ কর্মকর্তা তৈরি করতে, যেখানে পদ খালি হলে যোগ্যতার সনদপত্র আছে এ রকম মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়োগ দেওয়া হবে (উদ্ধৃত হয়েছে, নায়েক এবং নুরুল্লাহ, ২০০০ : ৩০)।

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা আইন প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস এবং উইলিয়াম জোনস 'মুসলমানদের জন্য কোরআনের আইন এবং হিন্দুদের জন্য শাস্ত্রের আইন' প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন (উদ্ধৃত হয়েছে, রুডলফ এবং রুডলফ, ২০০১ : ৩৩-৩৬)।

কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় পাঠ্যসূচি হিসেবে দারসে-নিজামি গৃহীত হয় এবং ১৭৯০ সাল পর্যন্ত তা অনুসরণ করা হয়। কলকাতা মাদ্রাসার দারসে-নিজামি অনুসরণ করা ১৮০০ শতকে ফারাঙ্গি মহল কর্তৃক সূচিত এই পাঠ্যক্রমের উপযোগবাদিতারই নজির। তবে, ১৭৯১ সালে প্রথম প্রিন্সিপালের বরখাস্তের পর পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন আসে। কোম্পানি ১৭৯১ সালে বেনারসে সংস্কৃত কলেজ এবং ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনেও সহায়তা করে। এই পদক্ষেপগুলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক অবশ্যপালনীয় শর্ত ছিল না।

১৮১৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নবায়িত চার্টারে ভারতীয় প্রজাদের শিক্ষার দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই চার্টারে শর্ত রাখা হয় যে দেশজ ভাষাগুলোকে প্রতিস্থাপিত না করেও, ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। আশা করা হয়েছিল যে ইংরেজি নৈতিক আইনকে জোরদার করার পথ হিসেবে প্রাচ্যবিদ্যার সঙ্গে সহাবস্থানে থাকতে পারবে। ইংরেজির এই অন্তর্ভুক্তি ছিল চার্লস গ্রান্টের ১৭৯২ সালে করা একটি গবেষণার ফল। গবেষণাটির শিরোনাম ছিল : 'গ্রেট ব্রিটেনের এশিয়া মহাদেশীয় প্রজাদের মধ্যে সামাজিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ, বিশেষত নৈতিকতার নিরিখে এবং এটির উন্নয়নের উপায়সমূহ' (১৭৯৩ সালে প্রকাশিত)। তাঁর প্রতিবেদনে গ্রান্ট জোর দিয়ে বলেছিলেন যে ভারত অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে এবং তাদের দুর্দশার জন্য হিন্দুরাই (এর দ্বারা তিনি ভারতীয়দের

বুঝিয়েছিলেন) দায়ী। গ্রান্টের মতে, 'আমাদের আলো এবং জ্ঞান প্রদানই তদের বিশৃঙ্খলা নিরাময়ের সবচেয়ে ভালো পথ প্রমাণিত হতে পারে' (উদ্ধৃত হয়েছে, ম্যাককুলি, ১৯৬৬ : ১১)। 'আলো' দ্বারা গ্রান্ট খ্রিষ্টধর্ম এবং 'জ্ঞান' দ্বারা ইংরেজিকে বুঝিয়েছিলেন। ফলে, তাঁর পরামর্শগুলো ছিল শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষার প্রচলন; স্থানীয় এলিটদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করা, এই এলিটরাই পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের মাঝে শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে পারবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা হিসেবে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজির প্রচলন (গার্গ, ২০০৩)।

যদিও কোম্পানির ভারতীয় প্রজাদের শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টরস গ্রহণ করেছিল, তবে তারা গ্রান্টের প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করেনি। তবে ১৮৫৪ সালে গ্রান্টের প্রস্তাবসমূহের একটি উপাদান, 'নিম্নমুখী পরিস্রবণ' তত্ত্ব, গ্রহণ করা হয় এবং ক্রমাগত অনুসরণ করা হয়। কলকাতায় ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ এবং ১৮২৪ সালে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের উৎসাহে পরিস্রাবণ নীতি প্রতিফলিত হয়। দুটি কলেজই এলিট শ্রেণির সন্তানদের আকর্ষণ এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল। ১৮২৪ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় একটি ইংরেজি কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত (যা ১৮২৬ সালে বাস্তবায়ন করা হয়) বিদ্যালয়গুলোতে ইংরেজি চালু করার পথে প্রশাসনের ধীর পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৮৫১ সাল পর্যন্ত কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় একটি ইংরেজি কোর্স পড়ানো হতো।

পরিশেষে ১৮৩৫ সালে চার্লস গ্রান্টের প্রস্তাবসমূহ বাস্তবে পরিণত হয় এবং এর পেছনে থমাস ম্যাকলের 'এডুকেশন মিনিট'র অবদান অনস্বীকার্য। তবে অবশ্যই এডুকেশন মিনিট ছিল অ্যাংলিসিস্ট এবং ওরিয়েন্টালিস্টদের বৃহত্তর বিরোধের একটি ফল এবং এতে ওরিয়েন্টালিস্টরা জয়ী হয়েছিল (এই বিরোধ সম্পর্কে জানতে দেখুন, জাস্টোপিল এবং ময়ার, ১৯৯৯)। এই বিতর্কের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল : শিক্ষাব্যবস্থা (স্থানীয় বনাম পশ্চিমা) এবং শিক্ষার মাধ্যম (স্থানীয় ভাষা বনাম ইংরেজি)। মিনিটে পশ্চিমা শিক্ষা এবং ইংরেজিকে সমর্থন করা হয়েছিল। শিক্ষা বিষয়ে প্রশাসনের উদ্দেশ্যসমূহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল :

এখন আমাদের অবশ্যই একটি শ্রেণি তৈরি করার জন্য সর্বোচ্চ কাজ করতে হবে, যারা আমাদের এবং আমরা যে কয়েক মিলিয়ন মানুষকে শাসন করি তাদের মাঝে ব্যাখ্যাকার হিসেবে কাজ করতে পারবে; এমন ব্যক্তিদের একটি শ্রেণি, যারা রক্তে-বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, মতামত, নৈতিকতা এবং প্রজ্ঞায় ইংরেজ (ম্যাকলে, মিনিট অব এডুকেশন, ১৮৩৫ : ১৪)।

গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিংক এই মিনিট তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করেছিলেন, এর ফলে ১৮৩৫ সাল ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে সন্ধিক্ষণে পরিণত

হয়।[১১] এই নীতি গ্রহণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে মাদ্রাসা এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা রহিত করা হয়।

তবে সবচেয়ে জোরালো আঘাত আসে ১৮৩৫ সালে, যখন দাপ্তরিক এবং উচ্চ আদালতের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজির প্রচলন হয়। ১৮৩৭ সালে নিম্ন আদালতের ভাষা হিসেবে আঞ্চলিক ভাষাগুলোর ব্যবহার শুরু হয়। এই দুটি সিদ্ধান্ত মাদ্রাসায় ফার্সিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দিয়েছিল। ১৮৪৪ সালে গভর্নর জেনারেল হেনরি হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন যে শুধু যেসব ব্যক্তি পশ্চিমা ঢঙের শিক্ষা এবং ইংরেজির জ্ঞান রাখেন, তাঁরাই সরকারি চাকরি বা জনজীবনে পেশা নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত হবেন। ফলে তাৎক্ষণিকভাবেই ফার্সির উপযোগিতা এবং মাদ্রাসা-শিক্ষিত তরুণদের কাজ পাওয়ার সুযোগ শূন্যের কোটায় নেমে আসে। সাধারণ মানুষের কথা বাদ দিলেও এলিটদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে স্বল্প সফলতার কারণে ১৮৫০-এর দশকে পরিস্রবণ নীতি পুনর্নিরীক্ষণের সম্মুখীন হয় এবং একটি পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৮৫৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চার্টার নবায়নের পর, ব্রিটিশ সংসদ ভারতীয় শিক্ষার অবস্থা যাচাই করতে একটি তদন্তের ব্যবস্থা করেছিল, এ রকম তদন্তের মধ্যে এটি ছিল সর্বপ্রথম। ফলে ১৮৫৪ সালে উডের ডিসপ্যাচ প্রকাশিত হয়। এটির নামকরণ হয়েছিল ভারতের বোর্ড অব কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট চার্লস উডের নামে। উডের ডিসপ্যাচে শিক্ষাক্ষেত্রে সীমিত সফলতায় হতাশা প্রকাশ করা হয়েছিল এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তাব করা হয়েছিল। প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় পরিস্রাবণ নীতি রহিত করার প্রস্তাব করা হয়, সরকারকে সর্বস্তরে শিক্ষার দায়িত্ব নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোকে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে দেশজ বিদ্যালয়গুলোকে পশ্চিমা ঢঙের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব করা হয়। দ্রুততার সঙ্গে এসব পরামর্শ বাস্তবায়ন করা হয়েছিল এবং এসব পদক্ষেপ ভারতের শিক্ষা খাতের চেহারা পাল্টে দিয়েছিল। শিক্ষার পশ্চিমাকরণ 'সরকারের পদক্ষেপের' পরিবর্তে 'জনসাধারণের কার্যক্রমে' রূপ নেয়, ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ঘটে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। এসব পরিবর্তনের ফলে গতানুগতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো, বিশেষত মাদ্রাসাগুলো, প্রান্তিক হয়ে পড়ে। কারণ অনুদান পাওয়ার শর্তগুলো ছিল গণিত, বিজ্ঞান এবং ভাষাকেন্দ্রিক পাঠ্যসূচি গ্রহণ করতে হবে। ধর্মবিষয়ক সব আলোচনা একটি পৃথক 'ধর্ম' ক্লাসে সরিয়ে নিতে হবে। শিক্ষকদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ নেওয়ারও শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়। এর ফলে শিক্ষক পেশাটি স্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তিদের হাত থেকে, এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মীয় পণ্ডিত ছিলেন এবং শিক্ষকতা তাঁদের প্রাথমিক পেশা ছিল

না, ধীরে ধীরে পেশাদার সার্বক্ষণিক শিক্ষকদের হাতে চলে যায় এবং এসব পেশাদার শিক্ষকের ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের দেওয়া শিক্ষক প্রশিক্ষণ সনদ ছিল (ল্যাঙ্গর, ২০০৫ : ১৬২)।

প্রাথমিক বছরগুলোতে অনুদানের সিংহভাগই পেত মিশনারি বিদ্যালয়গুলো, যা মাদ্রাসাগুলোর জন্য আরেক ধরনের হুমকি ছিল। এর প্রভাব গতানুগতিক সেক্যুলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেমন বাংলার পাঠশালাগুলোতেও অনুভূত হয়েছিল। এটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ মিশনারি স্কুলগুলো সেক্যুলার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছিল। এটা এখন চমৎকারভাবে নথিভুক্ত যে মিশনারি কর্মীরা গভীরভাবে বিশ্বাস করত 'কম বয়সী ছেলেমেয়েদের ধর্মান্তরিত হতে প্রস্তুত করতে শিক্ষা অবদান রাখতে পারে' (শেঠ, ২০০৭ : ৩০)। অন্য কথায় মিশনারিদের জন্য শিক্ষা ছিল প্রিপারেশিও ইভানজেলিকা (শসপেলের জন্য প্রস্তুতি)।

ইংরেজি শিক্ষার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রশাসনের শিক্ষানীতির ওপর মিশনারিদের প্রভাবের পরিচায়ক। চার্চ অব স্কটল্যান্ডের আলেকজেন্ডার ডাফ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি প্রচলনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং নিছক মুখস্থ করার সমালোচক ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুল পরবর্তী সময়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে পরিণত হয় এবং অন্যান্য মিশনারি স্কুলের জন্য আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। স্কুলটি ১৮৩৫ সালে ইংরেজি মাধ্যমে পশ্চিমা শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় তহবিল বরাদ্দের সিদ্ধান্তেও প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেছিল।

দীর্ঘমেয়াদে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের শিক্ষানীতি, বিশেষত প্রশাসনের পশ্চিমা শিক্ষার (সেক্যুলার শিক্ষা হিসেবে লেবেল লাগানো) ওপর জোর দেওয়া দুটি উপায়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রথমত, এটা শিক্ষাকে দুটি বর্গে ভাগ করে—সেক্যুলার এবং ধর্মীয়। যোগিন্দার সিকান্দ যথাযথভাবে যেমনটা বলেছেন, শিক্ষার দ্বিখণ্ডনের ওপর জোর দেওয়ার মাধ্যমে ধর্মকে ব্যক্তিপরিমণ্ডলে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল এবং ধর্মকে 'জীবন এবং কর্মের স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল হিসেবে, যা অন্যান্য একই ধরনের সংজ্ঞায়িত পরিমণ্ডলগুলো থেকে স্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র বা বিচ্ছেদযোগ্য' চিহ্নিত করেছিল (সিকান্দ, ২০০৫ : ৬৫)। ফলে সাধারণ শিক্ষার বিপরীতে মাদ্রাসাকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের ভূমিকায় অবতীর্ণ করা হয়েছিল। এই দ্বিখণ্ডায়নকে, ধর্মীয় বনাম সেক্যুলার, ঐশ্বরিক বনাম ইহজাগতিক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল এবং ওলামাদের জ্ঞানভাষ্যে এটাকে দ্বীনের শিক্ষা (ধর্মীয়/ঐশ্বরিক) এবং দুনিয়ার শিক্ষা (ক্ষণস্থায়ী) হিসেবে অনূদিত হয়েছিল। মজার বিষয় হচ্ছে, ঔপনিবেশিক প্রশাসন এবং ওলামারা উভয়ই এই বিষয়গুলোর মধ্যে মূলত আলোকায়ন-উত্তর কঠোর কম্পার্টমেন্টালাইজেশন (কুঠরিবদ্ধকরণ) অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করেছিল, যদিও বিষয়গুলোর গুরুত্ব পরস্পরের কাছে ঠিক বিপরীত ছিল। কিন্তু ওলামাদের কাছে

এটি উপনিবেশবাদ প্রতিরোধের একটি প্রক্রিয়াও ছিল : 'দ্বীনদুনিয়া পার্থক্যকে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের একটি রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করা উচিত, যা "অভ্যন্তরীণ বিশ্বকে" পশ্চিমা অনধিকার প্রবেশ থেকে রক্ষার একটি প্রচেষ্টা' (হাসান, ২০০৬ : ৬১)। অভ্যন্তরীণ বিশ্বকে রক্ষার এই প্রচেষ্টার ভিত্তি ছিল এর শ্রেষ্ঠত্ব, সার্বভৌমত্ব এবং জীবনে এর মুখ্যতার বিষয়ে উপলব্ধি। দক্ষিণ এশিয়ায় আজ পর্যন্ত এই মনোভাব অপরিবর্তিত রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রভাব হচ্ছে ধর্মীয়-রাজনৈতিক সক্রিয়তার জন্য একটি নতুন সামাজিক পরিমণ্ডল তৈরি করা। ধর্মীয় শিক্ষার প্রান্তিকীকরণ এবং বিদ্যালয়ে প্রকাশ্য ধর্মীয় টেক্সটের অবলুপ্তি, তাদের নিজেদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে নতুন জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে ধর্মীয় আন্দোলনগুলোর সামনে একটি পরিমণ্ডল তৈরি করেছিল। ঊনবিংশ শতকে মুসলিম সম্প্রদায়ের পরিচয়ের রাজনীতিতে মাদ্রাসাগুলো এই ভূমিকা পালন করেছিল।

মোগল সাম্রাজ্যের বিখণ্ডায়ন নিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের একদল যখন বিলাপ করা শুরু করে এবং পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যখন নিজেদের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করছিল, তখনই ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পরিচয়ের প্রশ্নটি ভারতে একটি স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয়ে রূপ নেয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের ব্যর্থতার ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের জ্ঞানভাষ্যে (ডিসকোর্স) প্রাধান্য বিস্তার করলেও, এই প্রক্রিয়া অনেকাংশে শাহ ওয়ালিউল্লাহর বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যে শুরু হয়েছিল। যাঁরা শাহ ওয়ালিউল্লাহর কার্যপদ্ধতির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতেন এবং এমনকি যাঁরা বিষয়টিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থান থেকে ব্যাখ্যা করতেন, তাঁদের সবারই সাধারণ এবং সহজ প্রশ্ন ছিল : কেন ইসলামিক শাসনের পতন হয়েছে? 'ইসলামের হারানো গৌরব' কীভাবে ফিরে পাওয়া যাবে? এসব প্রশ্ন সাধারণভাবে ধর্মকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। বিশেষত ইসলাম এ ক্ষেত্রে পরিচয়ের নির্দেশক এবং সামাজিক সীমানা নির্দেশক হিসেবে কাজ করছিল। তবে বিষয়টি ব্যতিক্রমী ছিল না, কারণ 'সংকটের সময়গুলো ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের জন্ম দেয়, যেহেতু মানুষ তখন প্রশ্ন করে তাদের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পার্থিব গৌরব কেন বিলীন হয়েছে' (ল্যাঙ্গর, ২০০৫ : ১৭২)। এই সংস্কার আন্দোলনগুলো প্রায়ই নানান রূপ ধারণ করে এবং বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। ঊনবিংশ শতকের (এবং বিংশ শতকের) ভারতের ক্ষেত্রে মুসলিম সংস্কার আন্দোলনগুলো, অন্যান্যের মধ্যে, সাম্প্রদায়িক ও পুনর্জাগরণবাদী সক্রিয়তাবাদ এবং শিক্ষা আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল (বিস্তারিত দেখুন, রিটজ, ২০০৬ : ৫২-৮১)। এই আন্দোলনগুলো নানানভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু, আমাদের উদ্দেশ্য অনুসারে মুসলিম জাগরণ এবং পরিচয়ের রাজনীতির বাহন হিসেবে শিক্ষাবিষয়ক আন্দোলন,

বিশেষত মাদ্রাসাগুলো আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও ১৮৭০ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা স্থাপনকে দক্ষিণ এশিয়ায় মাদ্রাসাশিক্ষার আধুনিক যুগের সূচনা হিসেবে বর্ণনা করা যায়, তবে মুসলমানদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি এবং রাজনৈতিক সক্রিয়তা উৎসাহিতকরণে এই মাদ্রাসার ভূমিকা সীমিত ছিল, বিশেষত যদি এটিকে অন্যান্য গোষ্ঠী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা, যেমন ঊনবিংশ শতকে উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত দেওবন্দ মাদ্রাসা এবং দারুল উলুম নাদওয়াতুল ওলামার সঙ্গে তুলনা করা হয়। যেমনটি আগে বর্ণনা করা হয়েছে, কলকাতা মাদ্রাসার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসনে যোগ দেওয়ার জন্য মুসলমানদের যোগ্য করে গড়ে তোলা। শুরু থেকেই মাদ্রাসাটি দারসে-নিজামি নামের পাঠ্যসূচি অনুসরণ করছিল। মাদ্রাসাটির ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণের জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত তদন্ত কমিটির সুপারিশে ১৮৫৩ সালে পাঠ্যসূচিতে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল। তবে মাদ্রাসাটির লক্ষ্য প্রায় একই থেকে গিয়েছিল, ফলে সামাজিক সক্রিয়তায় প্রতিষ্ঠানটি এবং এর ওলামাদের ভূমিকা পালনের ক্ষেত্র খুবই সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

একই শতকের শেষের দিকে কলকাতা মাদ্রাসার অনুকরণে আরও চারটি মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছিল: ১৮৭১ সালে হুগলিতে, ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহীতে ১৮৭৩ সালে। বিংশ শতকের প্রথম ভাগে মাদ্রাসার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। প্রাথমিকভাবে স্কুলের পাঠ্যসূচিতে ইংরেজি অন্তর্ভুক্ত করার প্রেরণা এবং মাদ্রাসাগুলোতে আর্থিক সহায়তা দেওয়া চালিয়ে যাওয়ার ফলে ১৯১৫ সালে মাদ্রাসা পাঠ্যসূচিতে একটি বড় পরিবর্তন আসে, ফার্সির পরিবর্তে অবশ্যপাঠ্য হিসেবে ইংরেজির অন্তর্ভুক্তি এবং পাঠ্যসূচিতে গণিত, ভূগোল, ইতিহাস এবং শারীরিক শিক্ষার প্রচলন করা হয়। যে মাদ্রাসাগুলো এই সংশোধিত পাঠ্যসূচি গ্রহণ করে, সেগুলোকে সংশোধিত (বা নতুন-সূচি) মাদ্রাসা বলা হতো। পুরোনো-সূচি মাদ্রাসা এবং নতুন-সূচি মাদ্রসাগুলো ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যসূচি অনুসরণ করায়, এই পরিবর্তন কলকাতা মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম অনুসরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দুটি ধারা সৃষ্টি করেছিল। সরকারের নীতি ছিল নতুন-সূচির মাদ্রাসাগুলোকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা।

এই পরিবর্তনগুলো গুরুত্বপূর্ণ হলেও ওলামাদের কাছ থেকে খুব কমই সাড়া পেয়েছিল। কারণ এর মধ্যেই দেওবন্দে শুরু হওয়া একটি স্বতন্ত্র মাদ্রাসার ধারা, এর প্রভাব বিস্তার করা শুরু করেছিল। এই মাদ্রাসার লক্ষ্য ছিল মুসলিম সচেতনতা, ক্ষমতায়ন এবং সক্রিয়তা তৈরি করা।

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিদ্রোহের ১০ বছর পর দিল্লির ১০০ মাইল উত্তরের ছোট শহর দেওবন্দে ১৮৬৬ সালে দারুল উলুম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা

করা হয়েছিল। মাদ্রাসাটি জনসাধারণের মধ্যে দেওবন্দ মাদ্রাসা নামে পরিচিত। এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানৌতভি (১৮৩৩-১৮৭৭) এবং মাওলানা রশিদ আহমেদ গাঙ্গোহি (১৮২৯-১৯০৫)। ১৮৬৬ সাল দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা এবং এটিকে ১৮৬৭ সালে উলুম পর্যন্ত উত্তীর্ণকরণ সমসাময়িক রাজনীতির প্রতি গোঁড়া ওলামাদের সচেতন পদক্ষেপ ছিল। যদিও মাদ্রাসাটি দারসে-নিজামি পাঠ্যসূচির একটি সংশোধিত সংস্করণ গ্রহণ করছিল, তবে এটি শাহ ওয়ালিউল্লাহর বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা চালিয়ে নিয়ে যেতে মনস্থ করেছিল। ফলে এটির পাঠ্যসূচিতে মাকুলাতের (যৌক্তিক বিজ্ঞানসমূহ) পরিবর্তে মানকুলাতের (প্রকাশিত জ্ঞান) ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল: 'পাঠ্যসূচির কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল ফিকাহ' (সিকান্দ, ২০০৫ : ৭৪)। দেওবন্দি ওলামারা আধুনিক শিক্ষা, বিশেষত ইংরেজির বিরোধী ছিলেন কি না তা বিতর্কের বিষয়; তবে এটি বিতর্কের ঊর্ধ্বে যে তারা যেটিকে 'ইসলামিক শিক্ষা' বিবেচনা করত, তার বিশুদ্ধতা প্রশ্নে তারা আপস করতে রাজি ছিল না। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা এবং পৃষ্ঠপোষকেরা ব্যক্তি হিসেবে মুসলমানদের আধ্যাত্মিক জাগরণ এবং সার্বিকভাবে সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। শাস্ত্রবাদী ভাবধারার দেওবন্দের ওলামাদের মতে, মুসলিম সম্প্রদায় ঔপনিবেশিক শক্তির হুমকির সম্মুখীন ছিল এবং এই হুমকি নিজেদের মধ্য থেকেও তৈরি হচ্ছিল। সৈয়দ আহমদ খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আলীগড়ের অ্যাংলো-মোহামেডান কলেজের আধুনিকতাবাদী প্রচেষ্টাসমূহ এবং সংস্কারবাদী উদার মুসলিম নেতাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে—এই নেতারা ইংরেজি শিক্ষা এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার পক্ষপাতী ছিলেন—একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হতো। উপরন্তু, দেওবন্দিরা সুফি ধারা এবং শিয়া মতবাদসহ লোকজ ইসলামের বিরোধিতা করত। দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতারা, নানৌতভি এবং গাঙ্গহি, শিয়া বিশ্বাসের সত্যনিষ্ঠতাকে বহুবার চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবং এর বিরুদ্ধে বিস্তর লেখালেখি করেছিলেন। দেওবন্দের ওলামারা হানাফি মাজহাবের অনুসারী। তাঁরা জোর দিয়ে বলেন যে তাকলিদের যেকোনো ধরনের বিচ্যুতি অত্যন্ত শঙ্কার বিষয় এবং এটিকে অবশ্যই মোকাবিলা করতে হবে, কারণ তা বিদাতের (নবপ্রবর্তিত বিষয়) চেয়ে কম শঙ্কার নয়। দেওবন্দিদের কাছে ইজতিহাদের সব পথ চূড়ান্তভাবে বন্ধ। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা দেওবন্দি ওলামাদের একটি স্বতন্ত্র ভিন্নতা দেয় তা হলো, দেশাচার বিষয়ে তাদের অবস্থান:

দেওবন্দিরা লোকজ ইসলামের বিরোধিতা করেছিল, যেখানে দরবেশের মধ্যস্থতা একটি বড় জায়গা দখল করে ছিল। একটি অতীন্দ্রিয়বাদী ক্রমে দীক্ষা গ্রহণকে পরিত্রাণ লাভের উপায় বিবেচনা করা হতো এবং অলৌকিক ঘটনা ও এ

রকম বিষয়গুলোকে ভবিষ্যদ্বক্তা এবং দরবেশদের প্রামাণিক ও অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা হতো। তাঁরা পুরোপুরিভাবে অতীন্দ্রিয়বাদের বিরোধিতা করতেন না কিন্তু যুক্তি দেখাতেন যে ইসলামি আইন (শরিয়া) মেনে চলাই হচ্ছে অতীন্দ্রিয় পরমানন্দ লাভের উপায়। (রহমান, ২০০৪)

প্রথম দিককার মাদ্রাসাগুলো ঢিলেঢালাভাবে সংগঠিত থাকলেও, দেওবন্দের সম্প্রসারিত প্রশাসনিক কাঠামো ছিল : একজন রেক্টর (সরপরাস্ত), একজন আচার্য্য (মুহতামিম) এবং একজন প্রধান অধ্যাপক (সদর মুদাররিস) (রহমান, ২০০৪)। মাদ্রাসায় ক্রমাধিকারতান্ত্রিক কাঠামো গ্রহণ, শিক্ষার পশ্চিমা ধারণার বিজয় প্রমাণ করে। পরিকল্পিত পাঠ্যসূচির উপস্থিতি, ভর্তি এবং স্নাতকত্ব লাভের জন্য নিয়মিত আবশ্যিক শর্ত, পরিকল্পিত পরীক্ষা পদ্ধতি, মাদ্রাসার নিজস্ব ভবন (যেখানে আগের মাদ্রাসাগুলো কোনো একটি মসজিদের অংশ ছিল) এবং ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন মেটানোর জন্য একটি সুসংগঠিত আমলাতন্ত্র, এসব বিষয় আদিরূপাত্মক মধ্যযুগীয় মাদ্রাসার মানসের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, যা দেওবন্দ অনুকরণ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছিল। কাঠামোগত বৈচিত্র্যের জন্য দারসে-নিজামির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা যেতে পারে, তবে এটা মনে রাখা ভালো যে ফারাঙ্গি মহলের ওলামারা তাদের কর্মকাণ্ডকে কখনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়নি এবং দেওবন্দ মাদ্রাসা ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা অনুসরণের পরিবর্তে এর বিরুদ্ধাচরণ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এসব বৈশিষ্ট্যকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ওলামাদের মানিয়ে নেওয়ার সামর্থ্য হিসেবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রকৃত পক্ষে, ওলামারা দেওবন্দকে বিস্তৃত জনগণকে সেবাদানকারী পথপ্রদর্শক ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সাহায্য করেছিল।

প্রতিষ্ঠার প্রথম দিনগুলোতে দেওবন্দ বেশি সক্রিয়তা তৈরি করতে পারেনি, তবে মাওলানা মাহমুদুল হাসান (১৮৫১-১৯২০) হাল ধরার পর প্রতিষ্ঠানটি সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রভাগে চলে আসে। মাওলানা হাসানকে, যিনি মাদ্রাসাটির প্রথম ছাত্র ছিলেন, প্রায়ই শাইখুল হিন্দ (ভারতের নেতা) নামে ডাকা হতো। তিনি সামারাতুত তারবিয়া (প্রশিক্ষণের ফল) নামে একটি সংগঠন স্থাপন করেছিলেন, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য জামিয়াতুল আনসার গঠন করেছিলেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে আন্তর্জাতিকীকরণের একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৯ সালে দেওবন্দ মাদ্রাসা দুটি অতিশয় সক্রিয় রাজনৈতিক সংগঠন, জামিয়াত-ই-খিলাফত-ই-হিন্দ (সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলন) এবং জামিয়াত-ই-উলামা-ই-হিন্দ (ভারতের ধর্মীয় পণ্ডিতদের সংগঠন) প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল (কাশমি, ২০০১)।

সক্রিয়তাবাদ ছাড়াও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেওবন্দের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ফলে

দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা এই মাদ্রাসায় পড়তে আসতে শুরু করে এবং এই মাদ্রাসার অনুকরণে অনেক মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। মেটকাফ উল্লেখ করেছেন যে দেওবন্দ মাদ্রাসা এবং দেওবন্দ থেকে ২০ মাইল দূরে শাহরানপুরে এর অনুরূপ মাদ্রাসায় অনেক দূর থেকে; এমনকি বাংলা থেকেও অসংখ্য শিক্ষার্থী পড়তে আসতেন (মেটকাফ, ১৯৮২ : ১৩৫)। তবে উগ্র পদক্ষেপ, তাকলিদ বিষয়ে দেওবন্দি ওলামাদের দৃঢ় অবস্থান, তাদের নীতিনিষ্ঠতা এবং ধর্মীয় পাঠের ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যাখ্যাকেই সহি বলে জোর প্রদান করায় সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের নানান অংশ থেকে মাদ্রাসাটি সমালোচনার শিকারও হয়। 'ইসলামের জন্য হুমকির' অব্যবহিত উৎসের বিষয়ে ভিন্নতা, সর্বতোভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার বিষয়, অন্যান্য চিন্তাধারাসম্পন্ন গোষ্ঠীর উত্থানের অন্যতম মূল কারণ ছিল। ফলে নতুন মাদ্রাসাও স্থাপিত হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে মাওলানা আহমেদ রেজা খান (১৮৫৫-১৯২১)-এর নেতৃত্বে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত (সুন্নাহ এবং সম্প্রদায়ের জনগণ), যা সাধারণত বেরলভী নামে পরিচিত, এর উত্থান এ রকম একটি উদাহরণ। মাওলানা আহমেদ রেজা খান মধ্য ভারতের উত্তরাঞ্চলে (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) ব্যারাইলী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কখনো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেননি। তিনি তাঁর বাবা মাওলানা নাকি আলীর, যিনি একজন হাদিসের পণ্ডিত ছিলেন, তত্ত্বাবধানে চিরাচরিত দারসে-নিজামি পাঠ্যসূচি মোতাবেক পড়াশোনা করেন। ১৪ বছর বয়সে তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে ফতোয়া লেখার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বাকি জীবন তিনি এই কাজ চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি দুবার হজব্রত পালন করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি মুখস্থ করার অসাধারণ ক্ষমতা এবং পাণ্ডিত্যসহ অন্যান্য অনন্য গুণাবলি প্রদর্শন করেছিলেন। ১৯০০ সালে পাটনায় সমমনা ওলামাদের সভায় আহমেদ রেজাকে ১৪০০ হিজরির মুজাদ্দিদ (নবায়নকারী) ঘোষণা করা হয়েছিল। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় কয়েকবার ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯০৪ সালে ব্যরাইলীতে তিনি মাদ্রাসা মানজার আল-ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছিলেন। অন্য একটি স্কুল, ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত লাহোরের দারুল উলুম নুমানিয়াহ আহমেদ রেজার চিন্তাধারা অনুসরণ করত এবং নিজেদের বেরলভী বলে পরিচয় দিত।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যেমনটা এর নাম থেকে বোঝা যায়, এটাই শুধু সত্যিকারভাবে সুন্নাহর (রসুলের প্রথা এবং আচার-আচরণ) প্রতিনিধিত্ব করে এবং একইভাবে সত্য সুন্নি মুসলিম ধারার প্রতিনিধিও তারা। বেরলভীরা দেওবন্দিদের মতো হানাফি মাজহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও তারা সুফি ধারার গ্রহণযোগ্যতা, দরবেশদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং চিরাচরিত আচার-

আচরণগুলোর বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। দেওবন্দিরা এই বিষয়গুলোর বিরোধিতা করলেও, বেরলভীরা এসব আচার পালনে মানুষকে উৎসাহিত করে: 'আহমেদ [রেজা] খানের ধর্মতাত্ত্বিক লেখালেখির একটি বড় অংশ এটা প্রমাণ করতে নিয়োজিত ছিল যে আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা এবং পথপ্রদর্শক (পীর) হিসেবে বেরলভীদের অতীন্দ্রিয়বাদী চর্চাগুলো ইসলামিক আইন বা রাসুলীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ' (রিটজ, ২০০৬ : ৯১)।

মতের এই ভিন্নতা ১৯০০ শতকের শেষভাগে এবং বিংশ শতকের প্রথমাংশে তিক্ত দ্বন্দ্বের রূপ ধারণ করে। এ সময় দেওবন্দ এবং বেরলভী ফতোয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। জাতীয় রাজনীতির বিবেচনায়, বেরলভীরা রক্ষণশীল আচরণ করেছিল। তারা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা করলেও, গণ-আন্দোলনসমূহ যেমন দেওবন্দিদের সমর্থিত ১৯২০-এর দশকের অসহযোগ আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে রেখেছিল। পরবর্তী বছরগুলোতেও বেরলভী এবং দেওবন্দিদের অবস্থানসমূহ পরস্পর বিপথগামী এবং বিরোধাত্মক ছিল। দেওবন্দিরা পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, অন্যদিকে বেরলভীরা মুসলিম লীগকে সমর্থন দিয়েছিল।

দেওবন্দি এবং বেরলভীদের মধ্যে বিদ্বেষপূর্ণ সম্পর্ক এবং উচ্চমার্গীয় বিতর্ক, যা মাঝে মাঝে শিষ্টাচারপূর্ণ থাকত না, এটা দৃশ্যমান করে যে ১৯০০ শতকের শেষাংশে মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে একটি বিভেদ প্রকট হয়ে উঠছিল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যতটা 'সত্য পথের' দিকে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াসের স্থান ছিল, ততটাই নিরবচ্ছিন্ন তর্কের মাধ্যম হিসেবে পরিণত হয়েছিল। অতএব, এই মাদ্রাসাগুলোর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল সত্যিকার মুসলমানিত্বকে এবং ইতিহাসের সংকটময় সন্ধিক্ষণে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভূমিকা সংজ্ঞায়িত করা। এই পুনঃসংজ্ঞায়ন এবং সম্প্রদায়গত পার্থক্যসমূহে মাদ্রাসাগুলো অবশ্যই ভূমিকা রেখেছিল। তবে এটা মাদ্রাসাগুলোর একমাত্র ভূমিকা ছিল না। পক্ষান্তরে, পার্থক্যসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং একটি মধ্যপন্থা গ্রহণ করার প্রচেষ্টাও চালানো হয়েছিল।

পার্থক্যসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিপাদনের বিভিন্ন ধারাকে ঐক্যবদ্ধকরণ এবং সম্প্রদায়গত পার্থক্যসমূহকে ছাপিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ ছিল ১৮৯৩ সালে মাওলানা মুহাম্মদ আলি মুঙ্গেরির (১৮৪৬-১৯২৭) নেতৃত্বে পণ্ডিতদের একটি সংগঠন, নাদোয়াতুল ওলামা, প্রতিষ্ঠা করা। এই সংগঠনের প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলো ছিল : মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির সংস্কারসাধন, সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে মুসলিম সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করা এবং মুসলিম পরিচয়ের সচেতনতা জাগিয়ে তোলা। শুরুটা সত্যিকার অর্থেই অনুকূল এবং ঐক্যবদ্ধ ছিল। সংগঠনটি প্রায় সব মতাবলম্বীর প্রতিনিধিদের ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিল। সুন্নিদের যেকোনো ধরনের উদ্যোগ থেকে দূরে থাকলেও, এমনকি

শিয়ারাও এখানে যোগ দিয়েছিল। সংগঠকদের বিশ্বাস ছিল, সংগঠনটি পুরোনো ধারণাসমূহ এবং নতুন বাস্তবতার মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করবে। এর ফলে গোটা সম্প্রদায়ের সক্রিয়তাবাদের সাধারণ ভিত্তি তৈরি হবে। কিন্তু শিগগিরই একতার এই আশা উবে যায়, অনেক দল ভিন্ন হয়ে যায় এবং বেরলভীরা সংগঠন এবং এর ধারণার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করা শুরু করে। এই সমালোচনাসমূহের কাছে মাথা না নুয়ে, সংগঠনের প্রধান নেতারা ১৮৯৬ সালে একটি মাদ্রাসা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে দারুল উলুম নাদোয়াতুল ওলামা (সংক্ষেপে নাদোয়া) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯০৫ সালে শিবলি নোমানি নাদোয়ায় যোগদান করেন। নোমানি ছিলেন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, যিনি এর আগে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে মোহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজে (সাধারণভাবে আলীগড় কলেজ নামে পরিচিত) পড়িয়েছিলেন। শিবলি নোমানি মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠার প্রায় ১০ বছর পর এতে যোগদান করেছিলেন, তবে তাকে এই সংগঠন (নাদোয়াতুল ওলামা) এবং মাদ্রাসার অনুপ্রেরক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

যদিও নাদোয়া দেওবন্দি ওলামাদের সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখত এবং পশ্চিমা-শিক্ষিত এলিটদের সক্রিয় সমর্থন পায় বলে ধারণা করা হতো। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি, যেমনটি এর প্রতিষ্ঠাতারা আশা করেছিলেন, একটি সামুদয়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সফল হয়নি। উর্দুর পরিবর্তে, যে ভাষাটি দেওবন্দ মাদ্রাসা জনপ্রিয় করে তুলেছিল, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আরবির প্রতি আগ্রহ পুনরুদ্দীপিত করতে নাদোয়া সফল হয়েছিল। আরবির গুরুত্ব তুলে ধরতে নাদোয়ার প্রচেষ্টা প্রধানত এর সঙ্গে আরবি-ভাষী ওলামাদের—বিশেষত মিসরীয় সংস্কারবাদী ওলামা—যোগাযোগের ফল ছিল। নোমানি ১৮৯২ সালে তার মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকা ভ্রমণের সময় এসব সংস্কারবাদীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এটা প্রায়ই উল্লেখ করা হয় যে নোমানির শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের এই ধারণা বিখ্যাত সালাফিস্ট মুহাম্মদ আবদু (১৮৪৯-১৯০৫) দ্বারা প্রভাবিত (হার্টাং, ২০০৬ : ১৪১)। এমনকি নোমানি মাদ্রাসাটি ছেড়ে যাওয়ার পরও সালাফিস্টদের সঙ্গে নাদোয়ার এই যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল। বিশ শতকের মধ্য ভাগে সালাফিয়া আদর্শে তাদের অবদান সংরক্ষণের জন্য একটি আরবি জার্নাল প্রকাশের কাজে, নাদোয়া মিসরীয় সালাফিস্টদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করেছিল।

নাদোয়ার জন্য নির্মিত পাঠাগার এবং এর বিপুল সংগ্রহ সক্রিয়তাবাদের চেয়ে ইসলামি জ্ঞানের বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার প্রতি এর গুরুত্বারোপের সাক্ষী। উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকৃতি সত্ত্বেও বা এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে, এই প্রকল্পটি যেমনটি আশা করা হয়েছিল, তেমনটি সফল হতে পারেনি।

দারুল উলুম নাদোয়াতুল ওলামা তাদের পাঠ্যসূচি এবং শিক্ষাপদ্ধতিতে

সংস্কারবাদী ওলামাদের চাওয়া অনেক পরিবর্তন সংযোজন করেছিল। এই পরিবর্তনগুলোর মধ্যে ছিল: পাঠ্যসূচিতে আধুনিক ইতিহাস এবং কথ্য আরবির সংযোজন এবং মুখস্থ করা ও শিক্ষকদের মতামত অন্ধভাবে অনুসরণের পরিবর্তে বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কে উৎসাহিতকরণ। তবে 'দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানত রক্ষণশীল এবং অপ্রগলভভাবে উন্মুক্ত থেকে গিয়েছিল' (রিটজ, ২০০৬: ২৭৫)। সংস্কারের পদক্ষেপগুলো ধীরগতি হয়ে যায় এবং ১৯১৩ সালে শিবলি নোমানি মাদ্রাসাটি ছেড়ে যাওয়ার পর তা পুরোপুরি স্থগিত হয়ে যায়; যদিও মাদ্রাসাটি টিকে আছে এবং ভারতে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার সম্মান লাভ এবং প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে।

উপসংহার

পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক আখ্যান এটা প্রমাণ করে যে একটি ধারণা এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদ্রাসা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছে। এর বহিরাবয়ব এবং আধেয়গুলো অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদ্রাসাগুলো এখনো সমাজের সঙ্গে অনেকাংশে সম্পৃক্ত আছে। স্থান ও কালের ভিত্তিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের চাহিদাগুলো এসব মাদ্রাসা স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দক্ষিণ এশীয় মাদ্রাসাগুলোর ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে মাদ্রাসা এবং রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার কোনো একক ধরন নেই। উদাহরণস্বরূপ রাষ্ট্র একসময় মাদ্রাসাগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এবং অন্য সময় মাদ্রাসাগুলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ক্রোধের শিকার হয়েছে।

স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে জন্মলগ্ন থেকেই মাদ্রাসাগুলো বিবাদের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে ইসলামিক চিন্তাধারার সাম্প্রদায়িক পার্থক্যগুলোর মধ্যে, কখনো শিয়া এবং সুন্নিদের মধ্যে বা অন্য সময় সুন্নিদের বিভিন্ন মাজহাবের মধ্যে। উনবিংশ শতকের শেষাংশের ভারতে এই বিতর্ক একই মাজহাবের বিভিন্ন উপদলে (বা মাশলাক, পন্থাসমূহ) ছড়িয়ে পড়ে (যেমন দেওবন্দি এবং বেরলভীদের মধ্যে বিতর্ক, এদের উভয়ই হানাফি মাজহাবের অনুসারী)। তীব্র বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ সত্ত্বেও কিছুটা গতিশীলতা, যেমন সমসাময়িক বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে এবং নতুন পরিস্থিতির আলোকে ক্লাসিক্যাল টেক্সটগুলোর ব্যাখ্যা প্রদানে প্রতিষ্ঠানগুলোর চলমান প্রচেষ্টা বিদ্যমান ছিল।

ঔপনিবেশিক আমলে দক্ষিণ এশিয়ায় মাদ্রাসার ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত পাঠ অনেক দিক থেকেই শিক্ষামূলক। মাদ্রাসাগুলোর প্রকৃতি এবং লক্ষ্য শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তঃস্থ ঘটনাপ্রবাহের দ্বারাই রূপায়িত হয়নি। বরং অন্যান্যের মধ্যে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের নীতিমালা, অন্যান্য সম্প্রদায় যেমন খ্রিষ্টান মিশনারি এবং আর্য সমাজের চ্যালেঞ্জ এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যদের উদীয়মান রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ হতে চাওয়াও নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছিল।

মাদ্রাসা এবং ওলামাদের রাজনৈতিক সক্রিয়তা, মাদ্রাসাগুলোয় যার সৃষ্টি, সম্প্রদায়ের পরিচয়ের সংজ্ঞায়ন এবং পুনঃসংজ্ঞায়নের তাড়নায় চালিত ছিল, বিশেষত প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলোতে। তাদের সাফল্য বা ব্যর্থতা ছাড়াও, এই ঘটনাপ্রবাহ ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার ভিত্তিভূমি তৈরি করেছিল। এই পরিবর্তন উপমহাদেশকেও বিভক্ত করেছিল এবং একটি নতুন রাষ্ট্রের, পাকিস্তানের, অভ্যুদয় হয়েছিল।

তথ্যসূত্র :

১. তবে রিচার্ড ইটনের মতে সর্বপ্রথম যোগাযোগ স্থাপিত হয় একাদশ শতাব্দিতে। ইটনের মতে এই সময় তুর্কী-ভাষি বংশোদ্ভুত সুফিরা এখানে আসেন (ইটন, ১৯৯৩)।

২. কিছু মতানুসারে শহরটি বিন কাশিমের ছেলে আমর নির্মাণ করেছিলেন। স্বল্প সময়ের মধ্যেই এটি সিন্ধের অন্যতম উদীয়মান শহরে পরিণত হয়েছিল। ৯৫৭ সালের মধ্যে এটি বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল।

৩. কিছু বিশেষজ্ঞ জোর দিয়ে বলেন যে, পাঠ্যসূচীতে যৌক্তিক বিজ্ঞান যেমন- অলঙ্কারশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা এবং ধর্মতত্ত্ব ইত্যাতি বিষয়ে জোর প্রদানের ধারা শুরু হয় সিকান্দার লোদির শাসনামলে (১৪৮৯-১৫১৮)(সুফি, ১৯৪১ :৩৩)।

৪. জান জাহান খান, তারিখই-জান-জাহান, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, কলকাতায় পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়।

৫. অবশ্য কিছু পন্ডিত রাজ সভা কর্তৃক শিক্ষাকে পৃষ্ঠপোষকতা করার দাবির সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। উদাহরণস্বরূপ, সাইয়্যিদ নাকি হুসেইন জাফরির (২০০৬ :৪৯) মতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে শাসকদের শুধু বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্ট ছিল; সম্ভবত, ইউরোপের অভিজাতদের মত দেশীয় অভিজাতদের কাছে এ বিষয়টি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ছিল না'।

৬. এখন পর্যন্ত ফিরিঙ্গি মহলের উপর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গবেষণা করেছেন রবিনসন (২০০১)।

৭. মেটকাফ বর্ণনা করেছেন, 'কাজি এবং মুফতি- যেসব কর্মকতা মুসলিম আদালতে প্রয়োজন হয়- তৈরি করা ছিল ফারাঙ্গি মহলের বিশিষ্টতা' (মেটকাফ, ১৯৮২ :৩০)।

৮. ১৮৯০ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আলোচ্য মাদ্রাসাটির নির্দিষ্ট কোন নাম ছিল না। চালু থাকার সময় মাদ্রাসাটি এর প্রধানদের (সদর মুদাররিস) নামানুসারে পরিচিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, যখন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মাদ্রাসাটির প্রধান ছিলেন, তখন এটি মাদ্রাসা-ই- শাহ ওয়ালিউল্লাহ নামে পরিচিত ছিল এবং যখন তার ছেলে শাহ আবদ আল-আজিজ মাদ্রাসাটির প্রধান ছিলেন, তখন মাদ্রাসাটি মাদ্রাসা-ই-শাহ আবদ আল-আজিজ নামে পরিচিত ছিল (আশরাফ, ২০০৫ :৬৩-৬৪)।

৯. এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ১৮শ শতকের ইসলামিক পন্ডিত মুহাম্মদ ইবন আবদ আল-ওহাব (১৭০৩-১৭৮৭), যিনি সাধারণত ওহাবিজমের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত; তিনিও হায়া আল-সিন্ধির ছাত্র ছিলেন। কোন কোন গবেষক জোর দিয়ে বলেন যে, এরফলে শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং আবদ আল-ওহাবের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক সংলগ্নতা দেখা যায় (ভল, ১৯৭৫:৩২-৩৯)।

১০. যদিও ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শাসক শক্তি হিসেবে

আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু দিল্লী কেন্দ্রিক সাম্রাজ্য এটা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেনি। ১৭৬৫ সালে কোম্পানীকে দেওয়ানী দেওয়া হয়, অর্থাৎ বাংলা, বিহার এবং ওড়িষ্যায় মোঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে কোম্পানীকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে কোম্পানীকে আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা এবং স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

১১. সাধারণ বিভাগের কাউন্সিলে ভারতের গভর্নর জেনারেলের সিদ্ধান্ত, নাম্বার. ১৯, ৭ মার্চ, ১৮৩৫, ইন্ডিয়া জেনারেল কনসাল্টেশনস পি/১৮৬/৮৮(২)।

অনুবাদক : গোলাম মুস্তাফা মুন্না

গ্রন্থসূত্র

Abul Fazl Allami (1907) *The Ain I Akbari*, trans. H Blochmann and HS Jarrett, Volume I: Chapter 202, Ain 25: The regulation of education. Calcutta: The Asiatic Society of Bengal. Available at: http://persian.packhum.org/persian/main?url=pf%3Ffile%3D00702051%26ct%3D0

Ahmad K (1968) Muslim tradition in education. *Islamic Education (Journal of All Pakistan Islamic Education Congress)* November–December: 21–64.

Ali MM (1965) *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities 1833–1857.* Chittagong: Mehrab Publications.

Ashraf M (2005) Madrasa-i-Rahimiah: Growth and pattern of educational curriculum, origin and character of Islamic education. In: Husain SM Azizuddin (ed) *Madrasa Education in India: Eleventh to Twenty First Century*. New Delhi: Kanishka Publishers, 59–75.

Bernier F (1914) *Travels in the Mogul Empire A.D. 1656–1668*, translated by A Constable. London: H. Milford, Oxford University Press.

Beveridge H (trans.) (1977) *The Akbar Nama of Abul-Fazl.* 3 vols. Reprint Edition. Delhi: Ess Ess Publications. (Originally published in Calcutta by the Royal Asiatic Society of Bengal, 1902–1939.)

Dallal A (1993) The origins and objectives of Islamist revivalist thought, 1750–1850. *Journal of the American Oriental Society* 113(3) (July–September): 341–359.

Eaton R (1993) *The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760.* Berkeley: University of California Press.

Faruki Z (1935) *Aurangzeb and His Times.* Bombay: DB Taraporevala Sons.

Garg BR (2003) *Charles Grant: The Forerunner of Macaulay's Educational Policy*. Ambala Cantonment, India: Associated Publishers.

Ghazi MA (2004) *Islamic Renaissance in South Asia (1707–1867): The Role of Shah Wali Allah and His Successors*. New Delhi: Adam Publishers.

Hartung J-P (2006) The Nadwat al-'ulama: Chief patron of Madrasa education in India and a turntable to the Arab world. In: Hartung J-P and Reifeld H (eds) *Islamic Education, Diversity, and National Identity: Dini Madaris in India Post-9/11.* New Delhi: Sage, 135–157.

Hassan F (2006) Madaris and the challenges of modernity in colonial India. In: Hartung J-P and Reifeld H (eds) *Islamic Education, Diversity, and National Identity: Dini Madaris in India Post-9/11.* New Delhi: Sage. New Delhi: Sage, 56–72.

Husain SM Azizuddin (2005) Mir Fahullah Shirazi's contribution for the revision of the syllabi of Indian madrasas during Akbar's reign. In: Husain SM Azizuddin (ed) *Madrasa Education in India: Eleventh to Twenty First Century*. New Delhi: Kanishka Publishers, 24–36.

Ikram SM (1964) *Muslim Civilization in India*, Ainslie T Embree (ed). New York: Columbia University Press.

Islam S (2002) *Prosohongo: Shiksha* (Issue: Education, in Bengali). Dhaka: Shikshabarta Prokashona.

Jafri SNH (2006) A modernist view of Madrasa education in late Mughal India. In: Hartung J-P and Reifeld H (eds) *Islamic Education, Diversity, and National Identity: Dini Madaris in India Post-9/11.* New Delhi: Sage, 39–55.

Jalbani GN (1967) *Teachings of Shah Waliyullah of Delhi*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf.

Kaur K (1990) *Madrasa Education in India: A Study of Its Past and Present*. Chandigarh: Centre for Research in Rural and Industrial Development.

Laird MA (1972) *Missionaries and Education in Bengal 1793–1837.* Oxford: Clarendon Press.

Lane-Poole S (1990) *Aurengazeb and the Decay of the Mughal Empire.* New Delhi: Low Price.

Langohr V (2005) Colonial education systems and the spread of local religious movements: The case of British Egypt and Punjab. *Contemporary Studies in Society and History* 47(1) (January): 161–189.

Law NN (1916) *Promotion of Learning in India during Muhammadan Rule by Muhammadans.* London: Longman's Green

Macaulay's Minute on Education (1835) *Report of the Saddler's Commission.* Appendix 2, Vol. 6. Calcutta: Calcutta University.

McCully BT (1966) *English Education and the Origins of Indian Nationalism*. New York: Columbia University Press.

Metcalf BD (1982) *Islamic Revival in British India: Deoband, 1860–1900*. New Delhi: Oxford University Press.

Naik JP and Nurullah S (2000) *A Students' History of Education in India:*

1800–1973. Bombay: Macmillan India.

Nayyar AH (2003) Madrassah education frozen in time. In: Hoodbhoy P (ed) *Education and the State: Fifty Years of Pakistan*. Karachi: Oxford University Press, 215–250.

Qasmi MB (2001) *Recounting Untold History, Darul Uloom Deoband: A Heroic Struggle against the British Tyranny*. Mumbai: Markazul Ma'arif Education and Research Center.

Rahim MA (1982) *Banglar Samajik o Sangskritk Itihash* [Social and Cultural History of Bengal, in Bengali]. Vol 1 Dhaka: Bangla Academy.

Rahman T (2004) The madrassa and the state in Pakistan. *Himal* February. Available at: www.himalmag.com/2004/february/essay.htm

Reetz D (2006) *Islam in the Public Sphere, Religious Groups in India, 1900–1947*. New Delhi: Oxford University Press.

Rizvi SAA (1980) *Shah Wali-Allah and His Times*. Canberra: Ma'rifat Publishing House.

Robinson F (2001) *The 'Ulama of Farangi Mahall and Islamic Culture in South Asia*. New Delhi: Permanent Black.

Rudolph SH and Rudolph LI (2001) Living with difference in India: Legal pluralism and legal universalism in historical context. In: Larson GJ (ed) *Religion and Personal Law in Secular India: A Call for Judgment*. Bloomington: Indiana University Press.

Saklain G (1993) *Bangladesher Sufi Sadhak* [Sufis and Holy Men of Bangladesh, in Bengali]. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Seth S (2007) Secular enlightenment and Christian conversion: Missionaries and education in colonial India. In: Kumar K and Oesterheld J (eds) *Education and Social Change in South Asia*. New Delhi: Orient Longman, 27–43

Siddiqui IH (2005) Madrasa-education in medieval India. In: Husain SM Azizuddin (ed) *Madrasa Education in India: Eleventh to Twenty First Century*. New Delhi: Kanishka Publishers, 7–23.

Sikand Y (2005) *Bastions of the Believers: Madrasas and Islamic Education in India.* New Delhi: Penguin.

Sufi GMD (1941) *Al Minhaj: The Evolution of Curriculum in the Muslim Educational Institutions of India.* Lahore: Sh. Muhammad Ashraf.

Voll JO (1975) Muhammad Hayya al-Sindi and Muhammad ibn Abd al-Wahab: An analysis of an intellectual group in eighteenth-century Medina. *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 38(1): 32–39.

Zastoupil L and Moir M (eds) (1999) *The Great Indian Education Debate: Documents Relating to the Orientalist–Anglist Controversy, 1781–1843*. Richmond, Surrey: Curzon.



বিশ্ব স্বাস্থ্যের পরিপ্রেক্ষিত ও বাংলাদেশ

শাহাদুজ্জামান

সারসংক্ষেপ

বিশ্ব স্বাস্থ্যের ধারণার জন্ম হয়েছে জনস্বাস্থ্য ধারণা থেকে। জনস্বাস্থ্যে একটি জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্যের কথা বলা হয়। জনস্বাস্থ্যকে একই সাথে বলা হয় বিজ্ঞান ও শিল্প। এশিয়া-আফ্রিকার উপনিবেশগুলোতে রোগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে গিয়ে ঔপনিবেশিক আমলে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ধারণাটি চালু হয়েছিল। কিন্তু বিশ্বায়নের প্রভাবে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যের ধারণাটি আর টিকে থাকেনি। এর ফলে তখন তা হয়ে ওঠে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হলেও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য শব্দ দুটি সমার্থক অর্থে ব্যবহার করা হয়। বেশ কিছু কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবা প্রয়োজন। যেমন : বিশ্বের সকল দেশগুলোর মধ্যে সমতা নিশ্চিত; মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মৃত্যুর হার কমানোর জন্য মানবিক সহায়তা; সার্স, বার্ড ফ্লু, এইডসের মতো রোগের সরাসরি প্রত্যক্ষ প্রভাব; বিশ্ব নিরাপত্তার প্রশ্ন এবং পারস্পরিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বিনিময়। বিশ্ব স্বাস্থ্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ঔপনিবেশিক শাসক দেশগুলো এবং উপনিবেশগুলোর ভেতর স্বাস্থ্য, চিকিৎসাবিষয়ক যোগাযোগ ঘটেছে দুটি উপায়ে—ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিদের ধর্মপ্রচার ও ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রভাব। ঔপনিবেশিক দেশগুলো স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগে বিশ্বের রোগ প্রতিরোধ এবং রোগ নির্মূলের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্যের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতেও বেশ কিছু অগ্রগতি ঘটেছে, যেমন : জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস। কিন্তু বিশ্ব পরিবেশের পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের মতো দেশে স্থানীয় স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও।

শব্দগুচ্ছ

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্যবিজ্ঞান, রোগতত্ত্ব, আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী, রোগতত্ত্ব, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ, জনমিতি, রেডক্রস, গণস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিমা।

প্রারম্ভিক কথা

বিশ্ব স্বাস্থ্য বিষয়ে কথা বলতে গেলে কয়েকটা ধারণা শুরুতে স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। যেমন আমাদের বোঝা দরকার জনস্বাস্থ্য (Public Health), আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য (International Health) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য (Global Health) ধারণাগুলোর মধ্যে পার্থক্য কী? আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বা বিশ্ব স্বাস্থ্য ধারণার জন্ম হয়েছে জনস্বাস্থ্য ধারণা থেকে। জনস্বাস্থ্যের একাডেমিক সংজ্ঞা এ রকম :

The science and art of preventing disease, prolonging life and promoting health through the organized efforts and informed choices of society, organizations, public and private, communities and individuals.

(1920 Winslow in Skolnik 2008)

অর্থাৎ, মোটা দাগে বললে জনস্বাস্থ্য হচ্ছে সরকারি, বেসরকারি, সামাজিক বা ব্যক্তি পর্যায়ে রোগ প্রতিরোধ, আয়ু বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সংগঠিত এবং সঠিক তথ্য জানা সাপেক্ষে নেওয়া সামাজিক উদ্যোগবিষয়ক বিজ্ঞান ও শিল্প। উল্লেখ্য, জনস্বাস্থ্যবিজ্ঞান শুধু ব্যক্তির স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবে না, বরং একটা জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবে। জনস্বাস্থ্যবিজ্ঞান শুধু রোগমুক্তির ওপর জোর দেয় না, বরং রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার ওপর জোর দেয়। জনস্বাস্থ্য যেহেতু একটা পুরো জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্যের বিষয়ে কথা বলে, ফলে এ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞান ছাড়াও রোগতত্ত্ব, পরিসংখ্যান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞানসহ আরও নানা মানবিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন পড়ে। জনস্বাস্থ্য তাই একাধারে বিজ্ঞান ও শিল্প। এই জনস্বাস্থ্যের ধারণা যখন একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী বা একটি বিশেষ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, তখন আসে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বা বিশ্ব স্বাস্থ্যবিষয়ক ধারণা। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য ধারণা দুটি খুব কাছাকাছি হলেও এর ভেতর একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে।

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ধারণাটি মূলত চালু হয়েছিল ঔপনিবেশিক আমলে। ঔপনিবেশিক দেশগুলো যখন তাদের উপনিবেশ বিস্তার করছিল, তখন তাদের অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ ছিল ঔপনিবেশিক অঞ্চলের রোগসমূহ। এশিয়া, আফ্রিকার উপনিবেশ অঞ্চলের রোগ সম্পর্কে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক দেশগুলোর ধারণা ছিল খুব কম। কলেরা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ইত্যাদি রোগ, যা এশিয়া-আফ্রিকায় ছিল প্রকট, তার সম্পর্কে ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান ছিল কম। কিন্তু স্বাস্থ্য, রোগ ইত্যাদি বিষয় তাদের উপনিবেশ বিস্তারের জন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক দেশগুলোর দরকার ছিল উপনিবেশে সুস্থ একটা শ্রমশক্তি, সেই সঙ্গে দরকার ছিল তাদের ঔপনিবেশিক কর্মকর্তাদের

রোগমুক্ত রাখা। ফলে এশিয়া, আফ্রিকা এসব অঞ্চলের রোগ নিয়ে তাদের গবেষণা, চর্চা, রোগ প্রতিরোধের নানা ব্যবস্থা করার প্রয়োজন পড়ে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির স্বার্থে। এ সময়ই ইউরোপে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ধারণাটির প্রচলন ঘটতে থাকে। সে সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানে দুই ধরনের চর্চা শুরু হয়। একটা হচ্ছে ইউরোপীয়দের নিজস্ব অঞ্চলের স্বাস্থ্য, অন্যটি 'আন্তর্জাতিক' স্বাস্থ্য। অর্থাৎ স্বাস্থ্যবিষয়ক যা কিছু ইউরোপীয় নয়, তা আন্তর্জাতিক। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বলতে তখন এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার ঔপনিবেশিক অঞ্চলের স্বাস্থ্যকেই বোঝাত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে উপনিবেশ-উত্তরকালে পরিস্থিতি বদলেছে। পৃথিবী ক্রমেই বিশ্বায়নের অধীনে এসে পড়ায় অতীতের সেই ঔপনিবেশিক এবং অ-ঔপনিবেশিক দেশের বিভাজন ঠিক আগের মতো আর থাকে না। নানা দেশের ভেতর পারস্পরিক যোগাযোগের মাত্রাটা ঘটে আরও দ্রুততায়, আরও জটিল প্রক্রিয়ায়। মোটা দাগে বিশ্বায়নের অর্থ বললে দাঁড়ায়, বিশ্বব্যাপী পণ্য, মানুষ ও চিন্তার চলাচল। এই চলাচল ইতিহাসে সব সময়ই ছিল কিন্তু বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে এসে এই চলাচলের মাত্রা হয়েছে দ্রুততর এবং ব্যাপক। এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যকেও শুধু ইউরোপীয় আর অ-ইউরোপীয় হিসেবে বিভাজিত করে রাখার আর কোনো উপায় নেই। এই সূত্রে ক্রমেই বিশ্ব স্বাস্থ্য ধারণাটি আলোচনায় আসে। বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যবিষয়ক পারস্পরিক সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালে। কিন্তু আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য ধারণাটি আরও ব্যাপক আকার নিয়েছে। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বলতে একসময় বোঝাত মূলত স্বল্প ও নিম্ন আয়ের দেশসমূহ, যারা গড়ে তৃতীয় বিশ্ব নামে পরিচিত, সেসব দেশের স্বাস্থ্যকে। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার স্বাস্থ্য নয়, পুরো বিশ্বেরই স্বাস্থ্য। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিষয়ক কার্যক্রম সাধারণত হতো দুটি দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্যবিষয়ক কার্যক্রমে বিশ্বের সব কটি দেশের অংশগ্রহণই জরুরি। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য' শব্দটি এখন নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো এটি একটি ধারণা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যাতে বোঝায় সাম্প্রতিক বিশ্বের জনগণের স্বাস্থ্য, কখনো এটি ব্যবহৃত হয় উদ্দেশ্য হিসেবে অর্থাৎ সুস্থ জনগোষ্ঠীর একটি পৃথিবী গড়ার লক্ষ্য বোঝাতে। বিশ্ব স্বাস্থ্য কখনো একটি গবেষণার বিষয়, কখনো এটি মাঠপর্যায়ে কাজের বিষয়। যদিও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য শব্দ দুটি এখনো অনেক ক্ষেত্রেই সমার্থক হিসেবে ব্যবহার হয় কিন্তু ক্রমেই আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য শব্দটির ব্যবহার কমে আসছে এবং তার জায়গা দখল করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য শব্দটি। প্রথমত, আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য শব্দটার সঙ্গে ঔপনিবেশিকতার একটা সম্পর্ক আছে বলে এবং দ্বিতীয়ত, বিশ্বায়ন ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠায় পৃথিবীর সমস্যাগুলো

এখন পরস্পর যুক্ত, এই ধারণা শক্তিশালী হয়ে ওঠার কারণে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবা কেন প্রয়োজন?

উত্তরে কয়েকটা শর্ত ভাবা যেতে পারে :

ক. সমতা নিশ্চিত করার কারণ : আমরা একটা বৈষম্যমূলক পৃথিবীতে বাস করি। দেখা গেছে, বিশ্বের স্বাস্থ্যবিষয়ক ৯০ শতাংশ সমস্যা পৃথিবীর যে অঞ্চলে রয়েছে, সেখানে আছে মাত্র ১০ শতাংশ সম্পদ। উল্টোভাবে যেখানে মাত্র ১০ শতাংশ সমস্যা, সেখানে আছে ৯০ শতাংশ সম্পদ। একে বলা হয় ৯০/১০ বিভাজন। যেমন ধরা যাক আফ্রিকার দেশ মালাউয়ের জনসংখ্যা ১ কোটি ২০ লাখ। এখন সেই পুরো দেশে ২০১০ সালের হিসাবে অর্থোপেডিক সার্জন আছেন মাত্র একজন। অন্যদিকে লন্ডন একটা শহর, যার জনসংখ্যাও ১ কোটি ২০ লাখ, কিন্তু এই একটা শহরেই অর্থোপেডিক সার্জন আছেন ২০০-এর ওপরে। সেভাবে মালাউতে স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু ব্যয় যেখানে তিন ডলার, সেখানে ব্রিটেনে স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু ব্যয় ১ হাজার ৮০০ ডলার। কিংবা ধরা যাক, নেপালে এক হাজারে শিশুমৃত্যুর হার ৫৫ জন, অন্যদিকে ব্রিটেনে এক হাজারে শিশুমৃত্যুর হার মাত্র চারজন। বিশ্বব্যাপী বৈষম্যের এমন অগণিত উদাহরণ দেওয়া যায়। বিশ্বের জনপদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য তাই প্রয়োজন স্বাস্থ্য খাতে অর্থ ও সম্পদের সমবণ্টন। পৃথিবীব্যাপী স্বাস্থ্য খাতে একটা ন্যায়ভিত্তিক সমবণ্টন নিশ্চিত করতে হলে আমাদের বিশ্ব স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবতে হবে।

খ. মানবিক কারণ : কয়েকটি পরিসংখ্যানের দিকে চোখ বোলানো যাক। পৃথিবীতে এ মুহূর্তে প্রতিদিন গড়ে এক হাজার শিশু তার এক মাস বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই মারা যায়, প্রতিবছর পাঁচ লাখের বেশি নারী প্রসবকালীন জটিলতায় মারা যায়, প্রতিবছর ১০ লাখের বেশি মানুষ যক্ষ্মায় মারা যায়। কিন্তু এই মৃত্যুগুলোকে বিখ্যাত জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ পল ফারমার নাম দিয়েছেন 'বাজে' বা 'অহেতুক' মৃত্যু বলে। বাজে এ জন্য যে এসব মৃত্যু খুব সহজেই ঠেকানো যায়। যেসব কারণে এই মৃত্যুগুলো ঘটে তা প্রতিরোধ করা, চিকিৎসা করা খুবই সহজ। কিন্তু এই মৃত্যু ঠেকানোর জন্য যে প্রযুক্তি, যে ব্যবস্থার প্রয়োজন, তা তাদের কাছে পৌঁছায়নি। যে দেশ, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের কাছে এই মৃত্যুগুলো ঠেকানোর জ্ঞান, প্রযুক্তি, রসদ আছে তা যথাস্থানে ব্যবহার করে এই অর্থহীন মৃত্যুগুলো বন্ধ করা তাদের দায়িত্ব।

গ. প্রত্যক্ষ প্রভাবসংক্রান্ত কারণ : আজকের এই বিশ্বায়নের পৃথিবীতে মানুষ এবং পণ্যের মতো রোগও পৃথিবীর নানা প্রান্তে খুব দ্রুত ছড়িয়ে যেতে পারে। রোগ সহজেই একটা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে অন্য দেশের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে

পারে। সাম্প্রতিক কালে সার্স, বার্ড ফ্লু ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে আমরা তা দেখেছি। এ ছাড়া এইডস একটা অবিরাম ঝুঁকি হিসেবে পৃথিবীতে তো রয়ে গেছেই। সুতরাং কোনো দেশই নিজেদের রোগের ব্যাপারে নিরাপদ ভাবার কোনো কারণ নেই। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের একটা সংক্রামক রোগ অন্য যেকোনো দেশের জন্য একটা ঝুঁকি। রোগের পারস্পরিক এই প্রত্যক্ষ প্রভাবের কারণেই বিশ্ব স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবাটা জরুরি।

ঘ. পরোক্ষ প্রভাবসংক্রান্ত কারণ : দারিদ্র্য থেকে যেমন রোগ ঘটে, তেমনি রোগও দারিদ্র্যের জন্ম দেয়। যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, এইডস ইত্যাদি রোগের প্রকোপ বিভিন্ন দেশে বেড়ে যাচ্ছে, যা জন্ম দিচ্ছে দারিদ্র্য, বেকারত্ব। এই দারিদ্র্য ও বেকারত্ব থেকে জন্ম হচ্ছে নানা রকম রাজনৈতিক অস্থিরতা, মানুষ নিজের দেশ ত্যাগ করে হচ্ছে অভিবাসী, অনেক ক্ষেত্রেই বাড়ছে অবৈধ অভিবাসন। কোনো একটা নির্দিষ্ট দেশের দারিদ্র্য, বেকারত্ব তাই অন্য দেশের নিরাপত্তার জন্যও হয়ে উঠছে হুমকি। সুতরাং রোগের সঙ্গে বিশ্বের নিরাপত্তারও একটা পরোক্ষ যোগ রয়েছে। বিশ্ব নিরাপত্তার কথা ভাবতে হলে আমাদের বিশ্ব স্বাস্থ্যের কথাও ভাবতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্যের কথা ভাবলে তা দরিদ্র দেশগুলো কিংবা ধনী দেশগুলোর দরিদ্র অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপরও প্রভাব ফেলবে, যা শেষ বিচারে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখবে।

ঙ. পারস্পরিক শিক্ষাসংক্রান্ত কারণ : পৃথিবীর সব দেশই একে অন্যের কাছ থেকে শিখতে পারে। এমন নয় যে জ্ঞান শুধু উন্নত দেশগুলোতেই রয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত দেশগুলোর মানুষের রয়েছে সমস্যা সমাধানের নানা উদ্ভাবনী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। সেই জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় হতে পারে উন্নত দেশগুলোর কাছেও। তাদের জন্যও সেখানে রয়েছে শিক্ষণীয় অনেক কিছু। ব্রিটেনের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এনএইচএসের প্রধান নাইজেল ক্রিসপ ২০১০ সালে প্রকাশিত তাঁর বইয়ে লিখছেন,

> Richer Countries import many health workers from poorer countries, whilst at the same time exporting their ideas and ideologies about health. It is an unfair exchange. What would it be like, if it were the other way round-and poorer countries imported health workers from richer ones and exported their ideas and experience about health? (নাইজেল ক্রিসপ ২০১০)

তিনি পৃথিবীব্যাপী পরস্পরিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বিনিময়ের গুরুত্বের কথা বলেছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবার প্রয়োজনে উন্নত, অনুন্নত সব দেশের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বিনিময় প্রয়োজন।

বিশ্ব স্বাস্থ্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

এবার বিশ্ব স্বাস্থ্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটির দিকে লক্ষ করা যাক। প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ভেতর চিকিৎসাসংক্রান্ত জ্ঞান অভিজ্ঞতা বিনিময়ের নজির আছে। ভারতীয়, আরব, গ্রিক অঞ্চলে বিকশিত চিকিৎসাশাস্ত্রের ভেতর পারস্পরিক যোগাযোগ, মতবিনিময় ঘটেছে। আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী, চীনা চিকিৎসাপদ্ধতির ভেতর পারস্পরিক যোগাযোগের নজির রয়েছে। আমি এখানে আলোচনা মূলত সাম্প্রতিক ইতিহাসে সীমিত রাখব। ঊনবিংশ শতাব্দীর দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখব, সে সময়ের ঔপনিবেশিক শাসক দেশগুলো এবং উপনিবেশগুলোর ভেতর স্বাস্থ্য, চিকিৎসাবিষয়ক ব্যাপক যোগাযোগ ঘটেছে। মূলত ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে বিকশিত মেডিকেল শাস্ত্র ক্রমেই উপনিবেশের সনাতন চিকিৎসাপদ্ধতিকে দুর্বল করে দিয়েছে। এই যোগাযোগটা ঘটেছে মূলত দুটি পথে। এক ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিদের হাত ধরে, অন্যটি ঔপনিবেশিক শাসকদের হাত ধরে। ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিরা এশিয়া, আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের উপায় হিসেবে প্রায় ক্ষেত্রে সেসব অঞ্চলে একটা হাসপাতাল করেছে। হাসপাতালের চিকিৎসাসেবার মধ্য দিয়ে তারা স্থানীয় জনগণের মন জয় করেছে এবং পরবর্তী সময়ে তাদের ধর্মান্তরিত করেছে। ফলে হাসপাতাল ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিদের কাছে শুধু চিকিৎসাকেন্দ্র ছিল না, ছিল ধর্মপ্রচারের একটা বাহন। একইভাবে ঔপনিবেশিক শাসকেরা তাঁদের উপনিবেশগুলোতে স্থাপন করেছেন পশ্চিমা ধাঁচের হাসপাতাল। এসব হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পেছনে ছিল মূলত ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্য। মূলত দুটি উদ্দেশ্য লক্ষ করা যায়। বলা বাহুল্য ঔপনিবেশিক অর্থনীতি সচল রাখার জন্য ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর প্রয়োজন ছিল সুস্থ একটি শ্রমশক্তির। ফলে শহর থেকে গ্রাম-গ্রঞ্জে তারা যে হাসপাতাল, ডিসপেনসারি প্রতিষ্ঠা করেছিল, তার একটা বড় কারণ ছিল স্থানীয় শ্রমবাজারকে সুস্থ রাখা, যে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তা ছাড়া এসব হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ঔপনিবেশিকদের একটা মানবিক চেহারাও তুলে ধরেছিল স্থানীয় জনগণের কাছে। ১৯১৪ সালে ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসের ব্রিটিশ প্রধান ক্রাউফোর্ড গেজেটে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছিলেন :

> *The peaceful and civilizing influence of the work done in the dispensaries and by regimental surgeons on the frontiers of India has been in political importance equivalent to the presence of some thousands bayonets. It is because of such unexpected philanthropy that, as conquerors, we hold a position in the minds of the people which would not otherwise be possible. (Crawford : Medical Gadget of India 1914)*

লক্ষণীয়, তিনি হাসপাতালকে বেয়নেটের সঙ্গে তুলনা করছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যরক্ষার পাশাপাশি উপনিবেশ অঞ্চলে আসা ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক কর্মকর্তাদের স্বাস্থ্যও ছিল তাদের একটি ভাবনার বিষয়। আগেই বলেছি কলেরা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর এশিয়া, আফ্রিকার এসব অচেনা রোগ ছিল তাদের ভীতির কারণ। বহু ইউরোপীয় সেনা এবং কর্মকর্তা মারা গেছেন এসব রোগে। ফলে উপনিবেশ অঞ্চলে হাসপাতাল তৈরির আরেকটা প্রণোদনা ছিল ঔপনিবেশিক কর্মকর্তাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা। এ সময় ইউরোপীয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপনিবেশ অঞ্চলের রোগতত্ত্বের ওপর গবেষণার জন্য নানা প্রতিষ্ঠান চালু হয়। ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ওপর নতুন বিভাগ চালু হয়। ব্রিটেনে লন্ডন স্কুল অব হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন বা হল্যান্ডে 'রয়েল ট্রপিক্যাল ইনস্টিটিউট' এখনো তাদের সেই ঐতিহ্যে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। ঔপনিবেশিক কালপর্বে মোটা দাগে বললে এসবই ছিল বিশ্ব স্বাস্থ্যের কর্মকাণ্ড।

বিশ শতকের ১৯৪০-এর দশক থেকে ঔপনিবেশিক দেশগুলো এক এক করে স্বাধীন হতে থাকে। তবে সদ্য স্বাধীন দেশগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক আমলের স্বাস্থ্যব্যবস্থাই বহাল থাকে। সেখানে মূলত হাসপাতালকেন্দ্রিক চিকিৎসাব্যবস্থাই অব্যাহত থাকে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য, রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদির ওপর জোর কম থাকে। ষাটের দশকের পর থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য ভাবনায় একটা পরিবর্তন আসে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ এসব আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগে বিশেষ রোগ প্রতিরোধ এবং রোগ নির্মূলের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উদ্যোগ স্মল পক্স বা গুটিবসন্ত এবং ম্যালেরিয়া নির্মূলের কর্মসূচি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রত্যন্ত গ্রামপর্যায়ে টিকা কর্মসূচির মাধ্যমে গুটিবসন্ত নির্মূলের ব্যাপক কর্মসূচি নেওয়া হয়। এ জন্য স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষ কর্মী বাহিনী তৈরি করা হয়। এতে ১৯৭০-এর দশকের মধ্যেই পৃথিবী থেকে গুটিবসন্ত নির্মূল হয়ে যায়। এটি বিশ্ব স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একটি বড় অর্জন। একই ধরনের উদ্যোগ ম্যালেরিয়ার রোগের ক্ষেত্রে নেওয়া হলেও এ ব্যাপারে তেমন সাফল্য আসেনি। পৃথিবীর নানা প্রান্তে এখনো ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আছে। এ বিষয়ক কর্মসূচি এখনো অব্যাহত আছে। ম্যালেরিয়ার পর বিশ্ব থেকে পোলিও নির্মূল এখন আরেকটি লক্ষ্য।

বিশ্ব স্বাস্থ্যবিষয়ক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে একটা মাইলফলক ১৯৭৮ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের কাজাখস্তানের আলমা আটা শহরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গৃহীত ঘোষণা। এটি আলমা আটা ডিক্লারেশন নামে পরিচিত। এই ঘোষণায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার প্রধান উপায় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। শুধু হাসপাতালকেন্দ্রিক এবং ডাক্তার পরিচালিত চিকিৎসাসেবা

নয়, গুরুত্ব দেওয়া হয় গ্রামীণ পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি করে জনগণের ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার দিকে। শুধু একটি-দুটি রোগ নির্মূলের কর্মসূচি নয়, মানুষের দোরগোড়ায়, সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে কী করে সমন্বিত উদ্যোগে জরুরি এবং ন্যূনতম চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া যায়, সে ব্যাপারে জোর দেওয়া হয় এ ঘোষণায়। পৃথিবীর বহু দেশ এরপর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নামে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এরপর ১৯৮০ সালে আবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য' এমন একটি নীতিমালা ঘোষণা করে। সেই লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী নানা সমন্বিত স্বাস্থ্য কর্মসূচি নেওয়া হয়। তবে নানা সীমাবদ্ধতার কারণে ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত হয়নি। এখনো পৃথিবীর বিশাল জনগোষ্ঠী ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০০ সালে জাতিসংঘ 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' ইংরেজিতে 'মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' নামে পরিচিত ঘোষণাটি দেয়। এ ঘোষণায় আটটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এই ঘোষণা অনুযায়ী, ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য, ক্ষুধা নিবারণ, প্রাথমিক শিক্ষা, লিঙ্গবৈষম্য দূর করে নারীর ক্ষমতায়ন, শিশুমৃত্যুর হার কমানো, মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর হার কমানো, এইডস, ম্যালেরিয়াসহ অন্যান্য রোগ মোকাবিলা করা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার অঙ্গীকার করা হয়। ২০১৫ সাল সমাসন্ন কিন্তু বলা বাহুল্য উপরোল্লিখিত অঙ্গীকারের অধিকাংশ বাস্তবায়নই এখনো সুদূরপরাহত। এই অবস্থা মোকাবিলায় আরও নতুন নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

তবে এ কথাও অনস্বীকার্য যে গত অর্ধশতাব্দীতে বিশ্ব স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অর্জনও হয়েছে অনেক। যেমন ১৯৫০ সালের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিশুমৃত্যুর হার ব্যাপক হারে কমেছে। এক হাজার শিশুতে যে মৃত্যুর হার ছিল ১৪৮ তা হয়েছে ৬৫, মানুষের গড় আয়ু ৪০ বছর থেকে বেড়ে হয়েছে ৬৫ বছর, পৃথিবী থেকে বসন্ত নির্মূল হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী বিপুলসংখ্যক শিশু টিকার আওতায় আসায় প্রতিরোধযোগ্য রোগের প্রকোপ অনেক কমেছে। বিশ্বব্যাপী সমন্বিত উদ্যোগের ফলেই সেটা ঘটেছে। এই অর্জন সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এখনো কঠিন একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। বর্তমান পৃথিবীতে স্বাস্থ্যবিষয়ক যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে, সেগুলোকে কতগুলো ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমত, পৃথিবীর জনসংখ্যা একটা রোগতত্ত্বগত বা এপিডেমিওলজিক্যাল ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। অর্থাৎ একসময় পৃথিবীর মানুষ মূলত ভুগত নানা রকম সংক্রামক রোগে। যেমন : কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া। কিন্তু পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে এসব রোগের প্রকোপ কমে সেখানে অসংক্রামক দীর্ঘমেয়াদি

রোগ যেমন : ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগ, মানসিক রোগ, স্থূলতা এসবের প্রকোপ বেড়েছে। জীবনযাত্রার মান এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়নের কারণে সেসব দেশে সংক্রামক রোগ কমে গেলেও, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর জীবনযাপন, বিশ্বায়ন ইত্যাদির কারণে জীবনযাত্রায়, খাদ্যাভ্যাসে, মানসিক প্রশান্তির ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে, যা জন্ম দিয়েছে হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি ধরনের অসংক্রামক রোগের। উন্নয়নশীল দেশের পরিস্থিতি এ ক্ষেত্রে আরও জটিল। কারণ, সেসব দেশে সংক্রামক রোগগুলো একদিকে নির্মূল হয়নি কিন্তু অন্যদিকে বিশ্বায়নের প্রভাবে জীবনযাত্রার পরিবর্তনে জন্ম নিয়েছে নানাবিধ অসংক্রামক রোগেরও। ফলে অনুন্নত দেশগুলোতেও ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগ ইত্যাদির প্রকোপ বাড়ছে। আবার পুরোনো সংক্রামক রোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এইডসের মতো নতুন ধরনের সংক্রামক রোগ। উন্নয়নশীল দেশের এই ত্রিমুখী রোগ মোকাবিলা বিশ্ব স্বাস্থ্যের জন্য এখন তাই একটা বড় হুমকি।

দ্বিতীয়ত, জনমিতি বা ডেমোগ্রাফিরও একটা ক্রান্তি সূচিত হয়েছে পৃথিবীতে। পৃথিবীর মানুষের গড় আয়ু বেড়ে যাওয়ায় ক্রমেই বয়োবৃদ্ধ মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। বৃদ্ধ মানুষদের শারীরিক ও সামাজিক জীবনযাপনের দাবি ভিন্নতর। কিন্তু পৃথিবীর বহু দেশই এই ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনসংখ্যা এবং তাদের বার্ধক্যজনিত সেবাদানে প্রস্তুত নয়। এটাও বিশ্ব স্বাস্থ্যের একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

তৃতীয়ত, পৃথিবীর এই যে রোগতত্ত্বগত ও জনমিতিগত পরিবর্তন হচ্ছে, সেটিকে ভালোভাবে বোঝার জন্য, ব্যাখ্যা করার জন্য, একে মোকাবিলার জন্য নতুন কর্মপন্থা, স্বাস্থ্যসেবা-ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়ার জন্য যে গবেষণা-দক্ষতা, তথ্য-উপাত্ত দরকার তা অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে নেই। রোগবিষয়ক সঠিক তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা সুবিধার অভাব বিশ্ব স্বাস্থ্যের আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ।

চতুর্থত, সাম্প্রতিক পৃথিবীতে পরিবেশ বিপর্যয়, ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির কারণে প্রতিনিয়তই মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর, জীবনের ওপর নতুন নতুন সংকট নেমে আসছে। এসব সংকট মোকাবিলাও বিশ্ব স্বাস্থ্যের একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

বিশ্ব স্বাস্থ্যের এই ব্যাপক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা কোনো একটি দেশ বা সংস্থার পক্ষে এককভাবে সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় শুধু একটি কোনো জ্ঞানকাণ্ড দিয়ে তাকে মোকাবিলা করা। চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে জনস্বাস্থ্য বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও রাজনৈতিক অর্থনীতির জ্ঞান সমন্বিত করেই একে মোকাবিলা করতে হবে। সরকারি, বেসরকারি, জাতীয়-আন্তর্জাতিক নানা যৌথ উদ্যোগে একে মোকাবিলা করতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য মোকাবিলায় যাঁরা নিয়োজিত আছেন, এখানে তাঁদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঔপনিবেশিক আমলে বিশ্বব্যাপী ঘটে যাওয়া কতগুলো

গুরুতর কলেরা মহামারি মোকাবিলায় উনবিংশ শতাব্দীতে কতগুলো আন্তর্জাতিক রোগ নিয়ন্ত্রণবিষয়ক কনফারেন্স হয় মূলত ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর আয়োজনে। তবে এগুলো ছিল বিচ্ছিন্নভাবে মাঝেমধ্যে নেওয়া কিছু উদ্যোগ। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রথম সংগঠিত ধারাবাহিক উদ্যোগের পথিকৃৎ বলা যায় আন্তর্জাতিক সংস্থা 'রেডক্রস'। সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী অঁরি ডুনান্টের উদ্যোগে ১৮৬৪ সালে রেডক্রস প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ব্যবসার সূত্রে ফ্রান্সের উপনিবেশ আলজেরিয়ায় গিয়ে সেখানে এক যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং যুদ্ধাহত ব্যক্তিদের চিকিৎসাসেবার ন্যূনতম ব্যবস্থার অভাব দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং মূলত যুদ্ধাহতদের সেবার লক্ষ্যেই একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নেন। সেই সূত্রেই জন্ম নেয় রেডক্রস। রেডক্রসের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ১৯০১ সালে চালু হওয়া প্রথম শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান অঁরি ডুনান্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে বলা যায়, পরবর্তীকালের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য মোকাবিলার উদ্যোগ, যার কথা আগে উল্লেখ করেছি। বর্তমানে আরও অগণিত সংস্থা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য মোকাবিলায় যুক্ত আছে। তাদের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা যায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ছাড়াও জাতিসংঘের আরও কয়েকটি সংস্থা রয়েছে যারা আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কাজ করে, যেমন: ইউনিসেফ, ইউএনএআইডি, ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ। এ ছাড়া বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রভৃতি আন্তর্জাতিক ব্যাংকও স্বাস্থ্য খাতে কাজ করে। এর বাইরে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও স্বাস্থ্য খাতে নানা কর্মসূচি পালন করে থাকে। যেমন: অক্সফাম, কেয়ার, ডিএফআইডি, সেভ দ্য চিলড্রেন। 'ডক্টরস উইদাউট বর্ডার' নামে আরেকটি সংস্থা রয়েছে, যারা মূলত আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেই কাজ করে এবং কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তারাও নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। ব্যক্তি উদ্যোগে আরও কিছু সংস্থা রয়েছে, যারা আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য খাতে সাম্প্রতিক কালে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এ ক্ষেত্রে বিল অ্যান্ড মিলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া রকফেলার ফাউন্ডেশনও দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছে। এ ছাড়া 'গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর টিবি ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট', 'ইন্টারন্যাশনাল এইডস ভ্যাকসিন ইনিশিয়েটিভ'ও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য সংস্থা। এর বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ব স্বাস্থ্য নিয়ে নিয়মিত গবেষণা এবং অধ্যয়ন চলছে। উপরোল্লিখিত সংস্থাগুলো স্বাভাবিক ও জরুরি উভয় অবস্থাতেই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে আসছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য বিষয়ে নতুন নতুন জ্ঞান আহরণ এবং বিতরণ করছে, স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির নানা রকম কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

তবে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কর্মকাণ্ডে নানা সমস্যা আছে। অনেক সংস্থা আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কাজ করলেও তাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া বা সমঝোতার সমস্যা আছে। এতে করে দেখা যায়, একই দেশে বিভিন্ন সংস্থা একই রকম কাজ করে পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে কিন্তু একে অন্যের অভিজ্ঞতা সমবায় করছে না। অনেক সময় এই সংস্থাগুলো ওপর থেকে নিজেদের তৈরি কোনো কর্মকাণ্ড বিভিন্ন দেশে চাপিয়ে দেয়, যা সব সময় সেসব দেশের উপযোগী নয়। এতে করে স্থানীয় মানুষের অংশীদারি থাকে না। স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণবিহীন ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া এমন অনেক কর্মসূচিই তাই ব্যর্থ হয়। এসব সংস্থার অভ্যন্তরীণ সুশাসন নিয়েও অনেক সমস্যা আছে। এমনকি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও তাদের কাজকে প্রভাবিত করে। স্বাস্থ্য খাতে কর্মরত কিছু কিছু সংস্থা ধর্মীয় মৌলবাদী বা কোনো স্বৈরশাসককে সহায়তা করেছে, এমন নজিরও আছে।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বিশ্ব স্বাস্থ্যের এই প্রেক্ষাপটে সংক্ষেপে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের ওপরও একটা সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা যেতে পারে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। চার দশক ধরে কিছু জনস্বাস্থ্য সূচকে ধারাবাহিক অগ্রগতি ঘটেছে বাংলাদেশে। স্বাধীনতার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে, গড় আয়ু বেড়েছে, মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে, কমেছে শিশুমৃত্যুর হার। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অর্জন শিশুমৃত্যুর হার কমানো। সত্তরের দশকে যেখানে হাজারে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৫০, তা ২০০৭ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৫২-তে। এ হার দক্ষিণ এশিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে খুবই উল্লেখযোগ্য। এমনকি শক্তিশালী অর্থনীতির পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের শিশুমৃত্যুর হার বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। বাংলাদেশ প্রমাণ করেছে, অর্থনৈতিক সূচকে পিছিয়ে থাকলেও কোনো কোনো জনস্বাস্থ্য সূচকে উল্লেখযোগ্য অর্জন সম্ভব। এটি পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল দেশের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ। শিশুমৃত্যু রোধে এই অর্জনের জন্য তাই সংগত কারণেই জাতিসংঘ পুরস্কৃত করেছে বাংলাদেশকে।

একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় নানাবিধ কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। একটি বড় কারণ এ দেশে শিশুদের কয়েক দশক ধরে রোগ প্রতিরোধক টিকা কর্মসূচির সাফল্য। সত্তরের দশকে যেখানে টিকার আওতায় ছিল শতকরা মাত্র দুই ভাগ শিশু, ২০০৭ সালে সেখানে টিকার আওতায় এসেছে ৮২ ভাগ শিশু। এটি সম্ভব হয়েছে ব্যাপক মাঠপর্যায়ের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। টিকা কর্মসূচিকে গ্রামের মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে মাঠপর্যায়ের

স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমেই। একইভাবে বাংলাদেশে জন্মহার কমেছে মাঠকর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অবদান রেখেছেন নারী স্বাস্থ্যকর্মীরা। অত্যন্ত প্রতিকূল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের মতো স্পর্শকাতর একটি ব্যাপারকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন। কোনো কোনো গবেষক উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশের তুলনামূলক উদার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং জাতিগত সমসত্ত্বতাও এ ধরনের মাঠপর্যায়ে কর্মকাণ্ডে সফলতা আনতে সহায়তা করেছে। উল্লেখ্য, পাকিস্তানে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা এবং নানা জাতিগত বিভেদের কারণে ব্যর্থ হয়েছে জনসংখ্যা কর্মসূচি। বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার কমার আরও একটি কারণ ডায়রিয়া ও কলেরা নিয়ন্ত্রণ। একটা সময় ছিল যখন গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত কলেরায়। এখনো কলেরা ও ডায়রিয়ার প্রকোপ রয়েছে কিন্তু সেসব ভয়াবহ মহামারির তুলনায় তা সামান্য। এটি সম্ভব হয়েছে মূলত ওরাল স্যালাইন আবিষ্কারের কারণে। আর এই সত্য প্রতিষ্ঠিত যে এই ওরাল স্যালাইন আবিষ্কৃত হয়েছে বাংলাদেশেরই আইসিডিডিআরবির গবেষণাগারে। *টাইম* ম্যাগাজিন ওরাল স্যালাইনকে চিকিৎসাক্ষেত্রে গত শতাব্দীর অন্যতম প্রধান একটি আবিষ্কার হিসেবে বর্ণনা করে প্রচ্ছদ কাহিনি করেছিল। গত চার দশকে বাংলাদেশের সেবা খাতে বেসরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা একটি বাস্তবতা। স্বাস্থ্য খাতের নানা সেবাকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এসব সংস্থার ভূমিকাও অনস্বীকার্য। বিশেষ করে ব্র্যাকের স্বাস্থ্যসেবিকারা যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে বিবিধ জনস্বাস্থ্য কর্মকাণ্ডে যুক্ত আছেন। কেয়ার, সেভ দ্য চিলড্রেন ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থাও এ দেশের স্বাস্থ্য খাতে ভূমিকা রাখছে। স্বাধীনতার উষালগ্নে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে চিকিৎসাকে হাসপাতালের চার দেয়ালের বাইরে আনার নানা যুগান্তকারী উদ্যোগ নিয়েছিলেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী প্রমুখ তাঁদের গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে নানা কারণে বিতর্কিত হয়েছেন তিনি কিন্তু তাঁর উদ্যোগে আশির দশকে বাংলাদেশে বহুজাতিক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত একটি ওষুধনীতি প্রণয়ন ছিল তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশের জন্য একটি বিপ্লবী কর্মকাণ্ড। তবে এসব অর্জনকে বিবেচনায় রেখেও বলতে হয়, বিশ্ব প্রেক্ষাপটের সামগ্রিক জনস্বাস্থ্যচিত্রে আমাদের অবস্থান এখনো একেবারে তলার দিকে। জনস্বাস্থ্যে আমাদের ব্যর্থতাও ব্যাপক।

এ কথা সত্য, শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশ। এও সত্য যে শিশুরা বেঁচে আছে, কিন্তু তাদের পুষ্টির মান পৃথিবীর নিম্নতম স্তরে। মায়েদের মৃত্যুর হার প্রথম তিন দশকে কমলেও তা স্থিতিশীল রয়েছে প্রায় এক দশক ধরে এবং সে হার এখনো বিপজ্জনক। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অতীতে যে

সাফল্য এসেছিল বাংলাদেশে, সেটি হুমকির মুখে পড়েছে আবার। বেড়ে যাচ্ছে জন্মের হার। আর সামগ্রিকভাবে বৈষম্য আমাদের স্বাস্থ্যচিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে রয়ে গেছে এখনো। স্বাস্থ্যের মান এবং স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে এ দেশে ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে, শহর ও গ্রামের মধ্যে, এমনকি শহরের উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে, বাঙালি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য অবকাঠামো থাকলেও তার ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত। এসব কেন্দ্রে প্রায়ই থাকে না প্রয়োজনীয় জনবল, থাকে না ওষুধ, যন্ত্রপাতি। সরকারি বরাদ্দ যা থাকে একদিকে তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল, অন্যদিকে যতটুকু সরবরাহ থাকে সেটিও অব্যবস্থাপনা আর দুর্নীতির কারণে পৌঁছায় না গ্রাহকের কাছে। স্বাধীনতার পর প্রথম তিন দশকের স্বাস্থ্য বাজেটে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ থাকলেও ২০০৩ সালে এইচএনএসপিপি নামে যে নতুন স্বাস্থ্য পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাতে প্রাইমারি স্বাস্থ্যে বরাদ্দ কমিয়ে বাড়ানো হয়েছে টারসিয়ারি স্তরে বিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্যসেবায়। গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ মানুষ এখনো চিকিৎসার জন্য নির্ভর করেন নানা অপ্রাতিষ্ঠানিক এবং অপেশাদার চিকিৎসাসেবা দানকারীদের ওপর। ওদিকে স্বাস্থ্যবিমা বিষয়টিও বিকাশ লাভ করেনি আমাদের দেশে। শহরে যাঁরা অর্থ দিয়ে স্বাস্থ্যসেবা কেনার সামর্থ্য রাখেন, তাঁরাও যে মানসম্পন্ন সেবা পাবেন, তার নিশ্চয়তা নেই। চিকিৎসার মান নিয়ন্ত্রণের কার্যকর কোনো ব্যবস্থা আমাদের নেই, রোগীর অধিকার বলে কোনো প্রসঙ্গ আমাদের চিন্তার জগতে নেই। যাঁদের সামর্থ্য আছে, তেমন একটি বিরাট সংখ্যক রোগী যে বিদেশে চলে যান, গবেষণায় দেখা গেছে তার অন্যতম একটি কারণ এ দেশের ডাক্তারদের আচরণ, রোগীর মর্যাদার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। এ ছাড়া স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দক্ষ পেশাজীবীরও রয়েছে ব্যাপক ঘাটতি। জনসংখ্যা অনুপাতে চিকিৎসাদানকারীর যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সংখ্যা রয়েছে, তাতে আমাদের আরও ৬০ হাজার ডাক্তার প্রয়োজন, প্রয়োজন প্রায় তিন লাখ নার্সের। সর্বোপরি স্বাস্থ্য খাতে নানা সংকীর্ণ রাজনৈতিক বিবেচনায় নেওয়া বিপরীতমুখী সিদ্ধান্তে বারবার মুখ থুবড়ে পড়েছে এর অগ্রগতি। বলা বাহুল্য, একটি দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি তার সামগ্রিক উন্নতি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ভাবার কোনো সুযোগ নেই। স্বাস্থ্যকাঠামো দেশটির সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গেও যুক্ত। স্বাস্থ্যসেবাকে মুক্তবাজারের পণ্য করে তাকে ব্যক্তি খাতে রেখে দেওয়ার কারণে এ দেশে স্বাস্থ্যসেবায় ব্যাপক বৈষম্য রয়ে গেছে।

বাংলাদেশের এই স্বাস্থ্যচিত্র থেকে আমরা আবার ফিরে যেতে পারি বিশ্ব স্বাস্থ্যের প্রেক্ষাপটে। বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য এই যে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোনো দেশের স্বাস্থ্যবিষয়ক পরিকল্পনার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্যের যে নানা শর্ত ও

শক্তিগুলোর কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, সেদিকে নজর রাখা প্রয়োজন। বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন একটি দেশের স্বাস্থ্য প্রশাসন বিশ্ব প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত, যেখানে নানা দেশ, নানা আন্তর্জাতিক সংস্থা, দাতা সংস্থার বিবিধ স্বার্থ কাজ করে, স্থানীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্ব পুঁজিবাজার, বিশ্বব্যাপী মানুষের, তথ্যের, সংস্কৃতির যে চলাচল ঘটছে সেটাও স্থানীয় স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করছে, সর্বোপরি বিশ্ব পরিবেশের পরিবর্তনও প্রভাব ফেলছে স্থানীয় স্বাস্থ্যের ওপর। আমাদের তাই ভাবতে হবে বিশ্ব প্রেক্ষাপটে, কিন্তু কাজ করতে হবে স্থানীয় পরিপ্রেক্ষিতে।

তথ্যসূত্র :

Huyen, M.M., P.Martens, H.B. Hilderlink, 'The Health Impact of Globalization: a Conceptual Framework', *Globalization and Health*, (2005) 1:14

Labonté, R., & Schreker, T. 'Globalization and Social Determinants of Health: The Role of Global Marketplace (part 2 of 3)'. *Globalization and Health, 3* (6), (2007a), p.1-17 (p.1).

Lee, K., D. Yach, & A. K. Scott, 'Globalization and Health', in Merson, M., Black, R., Mills, A. (Eds) *Global Health: Diseases, Programs, Systems and Policies*. (London: Jones & Bartlett Publisher, 2012), p 885-908.

Markle, W., Fisher, M., Smego, R. (Eds) *Understanding Global health*. (Ohio: McGraw-Hill Professional, 2007).

Merson, M., Black, R., Mills, A. (Eds) *Global Health: Diseases, Programs, Systems and Policies*. (London: Jones & Bartlett Publisher, 2012).

Skolnik, R., *Essentials of Global Health*. (London: Jones & Bartlett Publisher, 2008).

Zaman, S., *Broken limbs, broken lives: Ethnography of a hospital ward in Bangladesh.* (Publisher: Het Spinhuis, Amsterdam, The Netherlands, 2005).

পর্যালোচনা নিবন্ধ

মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদ : মিথ না রিয়েলিটি?

আরিফ রহমান

সারসংক্ষেপ

আমাদের জাতীয় জীবনে ১৯৭১ সাল একটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ বছর। এই বছরই বাংলাদেশ পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর দোসর হিসেবে কাজ করেছিল এদেশীয় রাজাকার, আলবদর, আলশামস নামধারী কিছু নরপশু। দীর্ঘদিন পর হলেও বর্তমানে এসব রাজাকার, আলবদর নেতার বিচার হচ্ছে। এই বিচার চলাকালে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি নিয়ে স্বাধীনতাবিরোধীরা মাঠে নেমেছে। এই বিকৃতির অন্যতম লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের সময় সংগঠিত নির্মম গণহত্যায় প্রাণ হারানো মানুষের সংখ্যা। যদিও যেকোনো গণহত্যাতেই সংখ্যা প্রধান বিচার্য বিষয় নয়, তারপরও সংখ্যার একটি সাংকেতিক তাৎপর্য রয়েই যায়। এই প্রবন্ধে যুক্তি দেখানো হয়েছে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গণহত্যায় নিহত মানুষের সংখ্যা ৩০ লাখের কম নয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যম এবং গবেষণাপত্র ব্যবহার করে এই দাবির সত্যতা উপস্থাপন করা হয়েছে। অন্যদিকে ১৯৭১-এর গণহত্যায় নিহতের সংখ্যা নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘিরে '৩ লক্ষ বনাম ৩ মিলিয়ন' শিরোনামে যে বিতর্ক করা হয়, তার জবাবও খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। এ ছাড়া দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধে ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলোতে মারা যাওয়া মানুষদের কেন গণহত্যার শিকার বিবেচনা করা উচিত, সে যুক্তিগুলোও প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিশেষে বিশ্বের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গণহত্যার সঙ্গে তুলনামূলক ব্যাখ্যার সাহায্যে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গণহত্যায় যে ৩০ লাখের অধিক বাঙালি গণহত্যার শিকার হওয়া কোনো মিথ নয়, বরং বাস্তবতা তা তুলে ধরা হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

১৯৭১, মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা, ৩০ লাখ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শরণার্থী, বঙ্গবন্ধু।

প্রারম্ভিক কথা

'১৯৭১ সালের যুদ্ধটা নিয়ে সব সময়ই একটু বেশি বাড়াবাড়ি করা হয়। সে সময় এমন বড় কিছুই হয়নি, সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের একটু শায়েস্তা করেছে, এই যা। ভারত ষড়যন্ত্র করে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মুসলমান দেশকে ভেঙে দুই ভাগ করেছে। যাঁরা দাবি করেন একাত্তরের গন্ডগোলের সময় ৩০ লাখ মানুষ মারা গেছে তাঁরা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা বড়জোর তিন লাখ, এমনকি কমও হতে পারে। আর মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা তিরিশ লাখ, এই আষাঢ়ে গল্পের প্রবক্তা শেখ মুজিব। আর সেই আষাঢ়ে গল্পটা প্রথম মঞ্চস্থ হয় বাহাত্তরের আটই জানুয়ারি, মুজিব যখন পাকিস্তান থেকে লন্ডনে আসেন। সেখানে সাংবাদিকেরা মুক্তিযুদ্ধে দেশের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জানতে চান। শেখ মুজিব একদিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত ছাত্র ছিলেন, স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজি ভালো জানতেন না। শেখ মুজিব দেশে আসার সময় বিমানবন্দরে তাকে বিদেশি সাংবাদিকেরা যখন ক্ষয়ক্ষতির কথা জিজ্ঞাসা করে তখন অশিক্ষিত মুজিব মৃতের সংখ্যা "থ্রি লাখ" বলতে গিয়ে "থ্রি মিলিয়ন" বলে ফেলেন। সেই থেকে দেশের সব মানুষ এই সংখ্যাটাকে সঠিক ধরে নিয়েছে, যার আসলে কোনো ভিত্তি নেই।'

ওপরের লেখাটা নিয়ে যদি আজও আপনি এ দেশের ঘরে ঘরে যান তাহলে অন্তত মোট দশ ভাগের চার ভাগ মানুষ এই লেখার কিছুটা অংশের সঙ্গে হলেও একমত হবে। বাকি চার ভাগ মানুষের তিন ভাগ এই লেখাটা দেখামাত্র ছুড়ে ফেলে দেবেন আর বাদবাকি দুই ভাগ মানুষ হবেন বিভ্রান্ত। আজকের লেখা এই বিভ্রান্ত মানুষদের জন্য। আমাদের দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরও স্বাধীনতার অনেক মৌলিক প্রশ্নে আমরা মতৈক্যে পৌঁছাতে পারিনি। সরকারের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এবং স্বাধীনতাবিরোধীদের লাগাতার অপপ্রচারের কারণে এসব মৌলিক প্রশ্নে আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এই নিবন্ধের পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরে আমরা এসব মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজব।

একাত্তরে শহীদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেই বঙ্গবন্ধুর 'থ্রি লাখ' 'থ্রি মিলিয়ন' বিভ্রান্তির গল্প বলা হয়। প্রথমেই এই মিথটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। দেখব বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসার আগেই দেশি-বিদেশি সংবাদপত্রে ৩০ লক্ষাধিক শহীদের খবর। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলেই একটা খবর সত্য হয়ে যায় না, আর সে জন্যই এখানে উদ্ধৃত করেছি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দৈনিকে শহীদের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ার তুলনামূলক চিত্র। যেটাতে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করার সুযোগ

নেই কোনো পক্ষেরই, যেটা প্রমাণ করবে ৩০ লাখ সংখ্যাটা কোনো স্বপ্নে পাওয়া সংখ্যা নয়, বাস্তবসম্পন্ন পরিসংখ্যান।

যেহেতু সংবাদপত্র কখনোই বিভ্রান্তির ওপরে নয়, সে জন্য আলোচনা করেছি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদের সংখ্যা নিয়ে করা বেশ কয়েকটি গবেষণার কথা। উল্লেখ করব বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন জাতিসংঘের পরিসংখ্যান, বিভিন্ন এনসাইক্লোপিডিয়ায় মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা সম্পর্কে মতামত এবং কয়েকজন গণহত্যা গবেষকের পর্যালোচনা। এরপর একজন গণহত্যা গবেষকের সম্পূর্ণ গবেষণাপদ্ধতি এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর গবেষণার পুরো চিত্র তুলে ধরব। এরপর ৫০ বছর ধরে আমাদের দেশের মৃত্যুহারের তুলনামূলক পর্যালোচনা তুলে ধরব। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাওয়া মৃত্যুহারের সঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া মৃত্যুহারের তুলনা করে দেখানো সম্ভব ১৯৭১ সালে শহীদের সম্ভাব্য সংখ্যাটি। যাঁরা দাবি করেন এত কম সৈনিক এত কম সময়ে এত বেশি মানুষকে মেরে ফেলতে পারে না, তাদের জন্য বিভিন্ন যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি এবং সময়ের সাপেক্ষে সৈনিক ও হতাহতের তুলনা করা হবে। শেষে আলোচনা করব শরণার্থী শিবিরে মৃত মানুষের সংখ্যা নিয়ে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকা এবং গবেষকদের গবেষণা থেকে আমরা ধারণা করে নিয়েছি, ১৯৭১ সালে ভারতে চলে যাওয়া প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ শরণার্থীর ভেতর ৬ থেকে ১২ লাখের ভাগ্যে মৃত্যু নেমে এসেছিল।

বঙ্গবন্ধু কি আসলেই তিন লাখ বলতে গিয়ে ত্রিশ লাখ বলেছিলেন?

থ্রি লাখ বনাম থ্রি মিলিয়ন আসলেই খুবই চমৎকার একটি তত্ত্ব, এই তত্ত্বের সমাধানের জন্য সমস্যাটার কয়েকটা গুরুতর অংশ নিয়ে আমি প্রথমেই আলোচনা করব। এই ইস্যু নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে ভালোই জল ঘোলা করা হচ্ছে। বিতর্কিত সাংবাদিক ডেভিড বার্গম্যান সম্প্রতি তাঁর ব্লগেও একই কথার সমর্থন দিয়েছেন।[১] আমরা খোঁজ করেছি এই গল্পের প্রথম প্রচারকের এবং খুঁজেও পেয়েছি। *'বাংলাদেশিদের মৃত্যু নিয়ে মুজিবের বিভ্রান্তি'* (মুজিবস কনফিউশন অন বাংলাদেশি ডেথস) শিরোনামে লন্ডনের বিখ্যাত *দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান*-এ প্রকাশিত এক চিঠিতে (২৪ মে, ২০১১) বিবিসির বাংলা বিভাগের সাবেক উপপ্রধান সিরাজুর রহমান লিখেছেন, '২১ মে আইয়ান জ্যাক স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশিদের মৃত্যুর যে সংখ্যা উল্লেখ করেছেন তা ঠিক নয়। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তান থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডনে আসার পর আমিই ছিলাম স্বাধীনতাসংগ্রামের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারী বাংলাদেশি। তাকে হিথরো (বিমানবন্দর) থেকে ক্ল্যারিজেস হোটেলে নিয়ে এসেছিলেন লন্ডনে ভারতের

হাইকমিশনার আপা ভাই পান্থ। এর ঠিক পরপরই আমি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। মিস্টার পান্থ তাকে "ইওর এক্সিলেন্সি" বলে সম্বোধন করায় মুজিব অবাক হচ্ছিলেন। আমি যখন তাঁকে বলেছি, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে এবং আপনার অনুপস্থিতিতে আপনাকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয়েছে, মুজিব তখন বিস্মিত এমনকি অনেকাংশে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। স্পষ্টত তিনি এমন ধারণা নিয়েই লন্ডনে এসেছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তানিদের হয়তো পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছে, যার জন্য তিনি আন্দোলন করছিলেন। সেদিন আমি এবং উপস্থিত অন্য সকলে তাকে যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছিলাম। আমি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলাম, এখনো পর্যন্ত হতাহতদের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। কিন্তু বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের অনুমান, যুদ্ধে তিন লাখ (৩,০০,০০০) মানুষ মারা গেছে।

'আমাকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে পরবর্তী সময়ে ডেভিড ফস্টারকে মুজিব বলেছিলেন, পাকিস্তানিরা "আমার তিন মিলিয়ন মানুষকে" হত্যা করেছে। তিনি "লাখ"কে "মিলিয়নের" সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিলেন, নাকি তাঁর বিভ্রান্ত মনই এ জন্য দায়ী ছিল আমি জানি না। কিন্তু বহু বাংলাদেশি এখনো বিশ্বাস করেন, তিন মিলিয়নের সংখ্যাটা কল্পনাপ্রসূত এবং অবিশ্বাস্য।'[২]

এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য এটা নিরূপণ করা নয়, মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা কত। সত্য-মিথ্যা যা-ই হোক আসল উদ্দেশ্য এটা খুঁজে বের করা মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা তিরিশ লাখ এই গল্পের প্রথম প্রবক্তা কি সত্যিই শেখ মুজিব কি না। কারণ যদি ধরে নিই একাত্তরে ৩০ লাখ মানুষের শহীদ হওয়াটা একান্তই মুজিবের মস্তিষ্কপ্রসূত, আসল সংখ্যাটা তিন লাখ; তাহলে প্রথমেই জেনে নেওয়া দরকার মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিয়ে এই তিন লাখ ফিগারটিই এল কোথা থেকে। বঙ্গবন্ধুর আগে কি কেউ এই সংখ্যা উচ্চারণ করেছেন? করলে কোথায় করেছেন? ত্রিশ লাখ আগে এসেছে নাকি তিন লাখ? এ ছাড়া আর কোনো ফিগার কি আছে?

আমরা দেখব, বঙ্গবন্ধু দেশে আসার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত দেশি সংবাদপত্র কী বলছে হতাহতের সংখ্যা নিয়ে। একটু ঘাঁটাঘাঁটি করতেই বেরিয়ে এল তিরিশ লাখের প্রথম উচ্চারণ। একাত্তর সালেই মুক্তিযুদ্ধের প্রথম লগ্নে অর্থাৎ মার্চে পাকিস্তানে জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রথম সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন, 'ওদের ত্রিশ লাখ হত্যা করো, বাকিরা আমাদের থাবার মধ্যে থেকেই নিঃশেষ হবে।'

সত্যি বলতে, দেখা যাচ্ছে প্রথম ভুলটা ছিল জেনারেল ইয়াহিয়া খানের, তিনিই সম্ভবত তিন লাখ বলতে গিয়ে ত্রিশ লাখ বলে ফেলেছিলেন। কিন্তু তিনিই

শেষ না; মাওলানা ভাসানী যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়েই দশ লাখ মানুষ হত্যাকাণ্ডের কথা বলেছিলেন। কবি আসাদ চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের সময় লিখেছেন তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতা। সেসব কবিতায় বারবার উঠে এসেছে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যুর কথা। মুক্তিযুদ্ধকালীন তাঁর দুটো কবিতার কথা উল্লেখ করছি। আসাদ চৌধুরী তাঁর 'রিপোর্ট ১৯৭১'[৩] কবিতার ৫৪ নাম্বার লাইনে লিখেছেন ১০ লাখ গলিত লাশের কথা :

'জনাব উথান্ট,
জাতিসংঘ ভবনের মেরামত অনিবার্য আজ।
আমাকে দেবেন, গুরু, দয়া করে তার ঠিকাদারী?
বিশ্বাস করুন রক্তমাখা ইটের যোগান
পৃথিবীর সর্বনিম্ন হারে একমাত্র আমি দিতে পারি
যদি চান শিশু ও গলিত খুলি, দেওয়ালে দেওয়ালে শিশুদের রক্তের আল্পনা
প্লিজ, আমাকে কন্ট্রাক্ট দিন।
দশ লক্ষ মৃতদেহ থেকে
দুর্গন্ধের দুর্বোধ্য জবান শিখে রিপোর্ট লিখেছি—পড়, পাঠ কর।'

মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হতো 'চরমপত্র'। সেই চরমপত্রের শেষ প্রচার দিবস অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বরের কিছু অংশ সরাসরি তুলে দিচ্ছি :

> '...২৫ মার্চ তারিখে সেনাপতি ইয়াহিয়া খান বাঙ্গালিগো বেশুমার মার্ডার করনের অর্ডার দিয়া কি চোটপাট! জেনারেল টিক্কা খান সেই অর্ডার পাইয়া ৩০ লাখ বাঙ্গালির খুন দিয়া গোসল করল। তারপর বঙ্গাল মুলুকের খাল-খন্দক, দরিয়া-পাহাড়, গেরাম-বন্দরের মইদ্দে তৈরি হইল বিচ্ছু...' (চরমপত্র; পৃ : ৩২৫)।

এবার আসি সংবাদপত্রে। বঙ্গবন্ধুই যদি ভুলটি করে থাকেন তাহলে ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ থেকে ৯ জানুয়ারি, ১৯৭২ পর্যন্ত নিচের সংবাদ প্রতিবেদনগুলোতে ত্রিশ লাখ শহীদের কথা কী করে এল। যেমন দৈনিক *পূর্বদেশ*-এর সম্পাদক তাঁর পত্রিকায় ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর 'ইয়াহইয়া জান্তার ফাঁসি দাও' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় লেখেন। সেখানে পরিষ্কার লেখা হয়, 'হানাদার দুশমন বাহিনী বাংলাদেশের প্রায় ৩০ লাখ নিরীহ লোক ও দুশতাধিক বুদ্ধিজীবীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে...'। এরপর রাশিয়ার *প্রাভদা*, ৩ জানুয়ারি, ১৯৭২ ত্রিশ লাখের কথা উল্লেখ করে। *মর্নিং নিউজ*, ৫ জানুয়ারি ১৯৭২ ত্রিশ লাখের কথাই আবার উল্লেখ করে সেই সংখ্যাটা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেয়। ঢাকার পত্রিকা দৈনিক *অবজারভার* শিরোনাম করে এভাবে, 'পাক আর্মি কিল্ড ওভার ৩০ লাখ পিউপল', যেটা

প্রকাশিত হয় ০৫.০১.১৯৭২ তারিখে মুজিব দেশে আসার ৩ দিন আগে। ৪ জানুয়ারি *আজাদ* পত্রিকাও *প্রাভদার* কথা উল্লেখ করে তাদের সংবাদে। *দৈনিক বাংলা* পত্রিকা তাদের, ৬ জানুয়ারি, ১৯৭২ 'জল্লাদের বিচার করতে হবে' শিরোনামে করা প্রবন্ধ ত্রিশ লাখ শহীদের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। যেটা প্রকাশিত হয় ৮ তারিখের আগে।

সুতরাং দলিলপত্র যাচাই করে এই পর্যন্ত পড়ে আসা যেকোনো একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ নিশ্চয়ই মেনে নিতে বাধ্য হবেন ত্রিশ লাখ ফিগারটা মুজিবের মাথায় হঠাৎ করে আসেনি। শহীদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়েছিল এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রচার হচ্ছিল। স্বাধীনতার পর দেশি পত্রিকাগুলোতেও এই সংবাদ প্রচারিত হতে থাকে এবং মুজিব জেলে থাকতে থাকতেই সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে এই সত্য পৌঁছে গিয়েছিল।

এবার আসুন খুঁজে দেখি একাত্তরের বিদেশি সংবাদপত্রগুলো ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের আগ পর্যন্ত হতাহতের সংখ্যা সম্পর্কে কী ধারণা দেয়। যদিও মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ ছিল প্রায় বিদেশি সাংবাদিকমুক্ত। সাংবাদিকদের বড় অংশকেই বের করে দেওয়া হয় ২৫ মার্চ রাতে, *দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ*-এর ২৭ মার্চ ১৯৭১ সংখ্যাটা পড়লে সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করে বের করে দেওয়ার ঘটনাটি। আমি ওই রিপোর্ট থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করছি :

> 'স্বাধীনতা আন্দোলনকে ধূলিসাৎ করতে সেনাবাহিনী যখন অভিযানে নামে সেই সময় থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত সকল বিদেশি সাংবাদিককে অস্ত্রের মুখে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে অবরুদ্ধ করে রাখা হয় এবং পরে সবাইকে ধরে প্লেনে উঠিয়ে করাচিতে নিয়ে যাওয়া হয়।
>
> ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার সংবাদদাতা সাইমন ড্রিং হোটেলের ছাদে লুকিয়ে থেকে গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হন; যদিও তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালানো হয়েছে। সাইমন ড্রিং ছাড়া কেবল অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-এর ফটোগ্রাফার মাইকেল লরেন্ট গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাইমন ড্রিং জ্বলন্ত ঢাকা শহরে ব্যাপকভাবে ঘুরে দেখার সুযোগ পান। গতকাল একটি প্লেনে করে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে আসতে সক্ষম হন। দু দুবার তার বস্ত্র উন্মোচন করে তল্লাশি চালানো এবং তার লাগেজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলেও, কৌশলে তিনি ঢাকায় নেওয়া নোটগুলোসহ সোমবার সকালে ব্যাংকক পৌঁছে এই রিপোর্ট পাঠান' *(দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ*, ২৭ মার্চ ১৯৭১)।

সাইমন ড্রিংয়ের মতো হাতে গোনা যে কয়েকজন সাংবাদিক লুকিয়ে ছিলেন তাঁদের কাছে আসলেও সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া অসম্ভব ছিল, কারণ অভিযান চলছিল সারা দেশে। পুরো দেশের সব খবর একত্র করে একটা ফিগার নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ ছিল এবং এই কথা সেই সময়ের

সংবাদপত্রগুলোতেও এসেছে বারবার। পড়তে গিয়ে দেখেছি যখনই একটা ফিগারের কথা বলা হচ্ছে তখনই আবার বলা হচ্ছে সামগ্রিক অবস্থা আমরা জানি না, সংখ্যাটা এর চেয়েও অনেক বেশি হতে পারে। তাই প্রথম দিকে একাত্তরে আসলে কী ঘটছিল পাকিস্তানে, সেটা পৃথিবীর মানুষ খুব একটা জানত না। খবরে হয়তো দেখা যেত খানিক গন্ডগোলের কথা কিন্তু পুরো চিত্রটা মানুষের কাছে পরিষ্কার ছিল না।

পরিষ্কার করেছিলেন যে মানুষটি, তিনি ছিলেন পাকিস্তানি। পাকিস্তানি সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাস ছিলেন প্রথম মানুষ, যিনি সারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেছিলেন। একাত্তরের এপ্রিলে যখন সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের ওপর নির্বিচারে নিপীড়ন চালাচ্ছিল, হত্যা করছিল, ঠিক তখনই পাকিস্তানি সরকার সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাসকে যুদ্ধাবস্থার প্রতিবেদন তৈরির জন্য সেখানে আমন্ত্রণ জানায়। শাসকশ্রেণি ধারণা করেছিল মাসকারেনহাস তাদের মিথ্যা প্রচারণায় সায় দেবেন। কিন্তু তারপরের ঘটনা ইতিহাস। অ্যান্থনি মাসকারেনহাস সেই কাজটাই করলেন, যেটা একজন বিবেকবান মানুষের করা উচিত। আসুন দেখা যাক এত কিছুর পরও বিভিন্ন টাইমলাইনে আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রগুলো কী লিখেছে মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে :

১. *টাইমস* একাত্তরের এপ্রিলের শুরুতেই লিখেছে ৩ লাখ ছাড়িয়েছে এবং বাড়ছে।
২. *নিউজউইক* এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে ১৯৭১ লিখেছে সাত লাখ।
৩. *দ্য বাল্টিমোর সান* ১৪ মে ১৯৭১ লিখেছে ৫ লাখ।
৪. *দ্য মোমেন্টো, কারাকাস* জুনের ১৩ তারিখে লিখেছে ৫ থেকে ১০ লাখ।
৫. *কাইরান ইন্টারন্যাশনাল* ২৮ জুলাই লিখেছে ৫ লাখ।
৬. *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল* ২৩ জুলাইয়ে রিপোর্ট করেছে, সংখ্যাটা ২ থেকে ১০ লাখ।
৭. *টাইমস* সেপ্টেম্বরে বলছে ১০ লক্ষাধিক।
৮. *দ্য হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড হাইগেট এক্সপ্রেস, লন্ডন* ১ অক্টোবর ১৯৭১ বলেছে শহীদের সংখ্যা ২০ লাখ।
৯. *ন্যাশনাল জিওগ্রাফি* ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে লিখেছে শহীদের সংখ্যা ৩০ লাখ।

সংবাদপত্রের ওপর জোর দিচ্ছি, কারণ যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সময় ৩০ লাখ শহীদের ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি মনে করেন, দাবি করেন সংখ্যাটা অনেক কম এবং

উদ্দেশ্যমূলকভাবে বানানো, তাঁদের কাছে তুলে ধরতে যে সংখ্যাটা হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠেনি। আন্তর্জাতিক দৈনিক বলছে এপ্রিলে সাত লাখ, জুলাইতে দশ লাখ, সেপ্টেম্বরে বিশ লাখ তাহলে ডিসেম্বরে তিরিশ লাখ শহীদ আকাশ থেকে আসা ফিগার মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই।

এবার আমরা আলোচনা করব পৃথিবীময় বিভিন্ন গণহত্যা, রাজনীতি, সংঘাত গবেষকের দৃষ্টিতে ১৯৭১ সালে হতাহতের সংখ্যা। দেখব বিভিন্ন গবেষণাপত্র, ডিকশনারি, এনসাইক্লোপিডিয়ায় এই গণহত্যা সম্পর্কে কী বলা আছে। সত্যি বলতে সংখ্যাটা ত্রিশ লাখ, তিন লাখ, এক লাখ অথবা ছাব্বিশ হাজার যাই হোক না কেন, এটা তো অবশ্যই এক বাক্যে মানতে হবে যে সংখ্যাটা অনেক বড়। সংখ্যাটা যে অনেক বড়, সেটা এমনকি এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সেনা প্রশাসকের দায়িত্বে থাকা জেনারেল রাও ফরমান আলী। উল্লেখ্য, এই রাও ফরমান আলী বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের নীলনকশাকারী, যুদ্ধের পর তার ডায়েরি থেকে নিজ হাতে তৈরি করা বুদ্ধিজীবীদের তালিকা পাওয়া যায়। সেই তালিকায় থাকা কাউকেই স্বাধীন বাংলায় খুঁজে পাওয়া যায়নি। ডক্টর মুনতাসীর মামুন বছর কয়েক আগে পাকিস্তানি জেনারেলদের মধ্যে যারা জীবিত আছে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সেসব দুর্লভ সাক্ষাৎকার পাওয়া যাবে তাঁর গ্রন্থ *সেই সব পাকিস্তানি*-তে। ড. মামুনকে সেই বইতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাও ফরমান আলী সেনাবাহিনীর হাতে বিরাট সংখ্যার হত্যাকাণ্ডের পক্ষে স্বীকারোক্তি দেন। সেই দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত চুম্বক অংশ পাঠকের উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি :

'...মামুন : ওই সময় একজন সক্রিয় জেনারেল হিসেবে আপনি এত ব্যাপক আকারে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে জানতেন না?

ফরমান : আমি বিশ লাখ লোক নিহত হওয়ার হিসাব মেনে নিতে পারছি না।

মামুন : না, আমি ওটা নিয়ে তর্ক করতে চাচ্ছি না।

ফরমান : সংখ্যাটা ৪০-৫০ হাজারের মতো হবে।

মামুন : তাহলে আপনার বিবেচনায় এই ৪০-৫০ হাজার বিরাট সংখ্যা নয়? ফরমান : না... এটা...।

মামুন : সেনাবাহিনী নিরীহ, নির্দোষ লোকদের হত্যা করেছে।

ফরমান : জি হ্যাঁ, সংখ্যাটা বিরাট। আমি স্বীকার করছি সংখ্যাটা সত্যিই বিরাট...'

এখানে স্বীকারোক্তির পাশাপাশি আরও একটা জিনিস পাওয়া যাচ্ছে সেটা হচ্ছে, মৃত মানুষের সংখ্যার ব্যাপারে বিভ্রান্তি। পাকিস্তান ১৯৭২ সালে করা তাদের

হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট[৪] অনুসারে মুক্তিযুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা ২৬,০০০। ১৯৭২ সালের পর থেকে লাগাতার ভিত্তিহীন এই অপপ্রচার তারা চালিয়ে যাচ্ছে আজ পর্যন্ত, ড. মুনতাসীর মামুন এই সাক্ষাৎকার নেন নব্বইয়ের দশকে, সুতরাং কমিশনের বলা ২৬,০০০ সংখ্যাটা ফরমান জানতেন না তা অসম্ভব। তারপরও তিনি ড. মামুনকে বলেন সংখ্যাটা ৪০-৫০ হাজার।

এসব বিভ্রান্তির জবাব নির্মোহভাবে দিতে পারে মুক্তিযুদ্ধের ওপর করা বিভিন্ন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা। যেখানে গণহত্যার পর হতাহতের সংখ্যা বের করার গাণিতিক সূত্র মেনে মৃত মানুষের সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে হওয়া অনেকগুলো গবেষণা থেকে কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করব আমরা।

১. 'সেন্টার ফর সিস্টেমেটিক পিস'-এর ডিরেক্টর ড. মার্শাল জোবি, 'মেজর এপিসোডস অব পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স ১৯৪৬-২০১৪' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ১০ লাখ মানুষ নিহত হয়েছে।

২. ড. টেড রবার্ট গার এবং ড. বারবারা হার্ফ দুজন গণহত্যা গবেষক। এঁদের মাঝে ড. টেড রবার্ট গার বর্তমানে ম্যারিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আর ড. বারবারা হার্ফ ইউএস নেভি একাডেমিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক। তাঁরা দুজনই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিকপাল হিসেবে পরিচিত। তাঁদের বিখ্যাত গবেষণা, যেটা পরবর্তী সময়ে পুস্তক হিসেবেও সমাদৃত হয়, *টুয়ার্ড অ্যাম্পিরিক্যাল থিওরি অব জেনোসাইডস অ্যান্ড পলিটিসাইডস*, প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। সেই বইতে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে ১২,৫০,০০০ থেকে ৩০,০০,০০০ মানুষ নিহত হয়েছে।

৩. মিল্টন লিটেনবার্গের গবেষণাপত্র, যেটা প্রকাশিত হয় কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, 'ডেথস ইন ওয়ারস অ্যান্ড কনফ্লিক্টস ইন দ্য ২০ত সেনচুরি' শীর্ষক সেই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ১.৫ মিলিয়ন অর্থাৎ ১৫ লাখ।

৪. ড. জ্যাক নুস্যান পোর্টার একজন লেখক, গবেষক, সমাজকর্মী এবং যিনি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব জেনোসাইড স্কলার্সের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট, তাঁর সাড়া জাগানো বই *জেনোসাইড অ্যান্ড হিউমেন রাইটস*। এই বইতে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে শহীদের সংখ্যা ১০ থেকে ২০ লাখ।

৫. ১৯৪৫ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে ৩০০টি আন্তর্জাতিক সংঘাত সম্পর্কে বলা হয়েছে *ইন্টারন্যাশনাল কনফ্লিক্ট: আ ক্রোনোলজিক্যাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব কনফ্লিক্টস অ্যান্ড দেয়ার ম্যানেজমেন্ট, ১৯৪৫-*

১৯৯৫ বইটিতে। লেখকদ্বয় জ্যাকব বারকোভিচ এবং রিচার্ড জ্যাকসন দুজনেই আন্তর্জাতিক সংঘাত বিশেষজ্ঞ।

৬. গণহত্যা গবেষক টম হার্টম্যান এবং জন মিচেল তাঁদের লেখা *দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাস অব মিলিটারি হিস্টিরি*, ১৯৪৫-১৯৮৪ বইতে বলেছেন একাত্তরের যুদ্ধে দশ লাখ মানুষ মারা যায়।

৭. ওয়ার্ল্ড অ্যালামন্যাক, যাদের বলা হয়ে থাকে তথ্যপঞ্জির জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ, তারা তাদের বেস্ট সেলার ১৯৮৪ সালের সংখ্যায় বলেছে, ১৯৭১ সালের সংঘাতে নিহতের সংখ্যা ১০ লাখ।

৮. কম্পটনস এনসাইক্লোপিডিয়া তাদের গণহত্যা পরিচ্ছদে মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা লিখেছে ৩০ লাখ।

৯. এনসাইক্লোপিডিয়া অ্যামেরিকানা তাদের ২০০৩ সালের সংস্করণে বাংলাদেশ নামক অধ্যায়ে একাত্তরে নিহত মানুষের সংখ্যা উল্লেখ করেছে ত্রিশ লাখ।

১০. গণহত্যা গবেষক লিও কুপার তাঁর বিখ্যাত *জেনোসাইড* বইতে উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ শহীদ হয়েছে।

১১. ১৯৮১ সালের জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ৩৩তম বছর উপলক্ষে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুসারে 'মানব ইতিহাসে যত গণহত্যা হয়েছে এর মধ্যে বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের গণহত্যা স্বল্পতম সময়ে সর্ববৃহৎ। গড়ে প্রতিদিন ৬,০০০ থেকে ১২,০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এটি হচ্ছে গণহত্যার ইতিহাসে প্রতিদিনে সর্বোচ্চ নিধন হার। এই ঘোষণা যেহেতু মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার প্রায় দশ বছর পরে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং গণহত্যা যে ২৬৬ দিন চলেছিল তারা সেটা জানত। রাউন্ড ফিগার ২৬০ দিন ধরে বাঙালি নিধন হয়েছে ১৫,৬০,০০০ থেকে ৩১,২০,০০০ পর্যন্ত।

১২. পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী *অ্যা প্রোবলেম ফ্রম হেল : অ্যামেরিকা অ্যান্ড দ্য এইজ অব জেনোসাইড* গ্রন্থের লেখিকা সামান্তা পাওয়ার পৃথিবীর বিভিন্ন গণহত্যার খতিয়ান বের করেছেন। বেস্ট সেলার এই বইটিতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নিহত মানুষের সংখ্যা বলা হয়েছে ১০ থেকে ৩০ লাখ।

১৩. বিশিষ্ট রাজনীতিবিজ্ঞানী রুডল্ফ জোসেফ রুমেলের *স্ট্যাটিসটিকস অব ডেমোসাইড* বইটিকে দাবি করা হয়ে থাকে বিশ্বে গণহত্যা নিয়ে সংখ্যাগতভাবে অন্যতম কমপ্রিহেনসিভ বই। বইটির অষ্টম অধ্যায়ে *স্ট্যাটিসটিকস অব পাকিস্তান'স ডেমোসাইড এস্টিমেইটস, ক্যালকুলেশনস অ্যান্ড সোর্সেস* নিবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের মুক্তির সংগ্রামে ১৫,০৩,০০০ থেকে সর্বোচ্চ সম্ভাবনার ঘরে ৩০,০৩,০০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি বিভিন্ন সময় সংখ্যাটা ১৫ লাখ বলেই উল্লেখ করেছেন। অনেকের মনে খটকা লেগে থাকতে পারে যে বেশির ভাগ গবেষকের মতে, সংখ্যাটা ১০ থেকে ১৫ লাখের ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাদের উদ্দেশে বলছি, গল্পটা এখানেই শেষ হয়নি। শরণার্থী শিবিরে নিহত মানুষের বেশির ভাগ গবেষক গণনায় আনেননি। এক কোটি বিশ লাখ মানুষের স্থানান্তরে প্রচুর মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। আমাদের ধারণা অনুসারে কেবল শরণার্থী শিবিরে নিহত মানুষের সংখ্যাই ৬ থেকে ১২ লাখ হতে পারে। এ ছাড়া হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশ্বিক স্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. রিচার্ড ক্যাস বলেছেন :

> 'আমরা পাবলিক হেলথের লোক হিসাবে যুদ্ধের সরাসরি প্রাণহানি ছাড়াও কোল্যাটারাল ড্যামেজের দিকে নজর রাখতে চাই এবং এই যুদ্ধের ফলে প্রায় দশ মিলিয়ন মানুষকে ঘরছাড়া হয়ে ভারতে পালাতে হয়েছিল, পাঁচ লাখ মানুষ যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে মারা গিয়েছিল'। এই সব অতিরিক্ত প্রাণহানির দায় কার, সবই ঈশ্বরের লীলা? নাকি যারা এই যুদ্ধ এনেছিল তাদের?'

জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ও ত্রিশ লাখ শহীদ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মৃত্যুহার নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ওপর জাতিসংঘের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৯৫০-৫৫ সালে আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১৪.৬, ১৯৫৫-৬০ সালে ১৫.৩, ১৯৬০-৬৫ সালে ১৫.৩, ১৯৭০-৭৫ সালে হঠাৎ এটা হয়ে যায় ৫.৫, আবার ১৯৭৫-৮০ সালে ১৪.২, ১৯৮০-৮৫ সালে ১৪.৫ এভাবে চলছে।

জাতিসংঘের হিসাবমতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা :

সাল	১৯৫০	১৯৫৫	১৯৬০	১৯৬৫	১৯৭০	১৯৭৫	১৯৮০	১৯৮৫	১৯৯০
জনসংখ্যা (লাখ)	৩৯৭	৪৩৪	৫০১	৫৭৮	৬৬৯	৭০৬	৮০৬	৯২৩	১০৫৩
বৃদ্ধির হার (%৫ বছরে)	১৪.৬	১৫.৩	১৫.৩	১৫.৭	৫.৫	১৪.২	১৪.৫	১৪.১	

সত্তর থেকে পঁচাত্তরের ভেতর স্বাভাবিক জন্মহার বিবেচনায় তাহলে হারিয়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৫ লাখ!

১৯৫০-১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রতি ৫ বছরে জনসংখ্যা গড়ে ১৫.৩% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে
যদি ১৯৭০-১৯৭৫ সালে জনসংখ্যা এই হারে (১৫.৩/৫ বছর) বৃদ্ধি পেত তাহলে ১৯৭৫ সালে জনসংখ্যা দাঁড়াত ৭৭১ লাখ
অর্থাৎ ১৯৭০-১৯৭৫ সালে আমাদের দেশ থেকে হারিয়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা ৭৭১-৭০৬ = ৬৫ লাখ

আচ্ছা এই মানুষগুলো কোথায় হারিয়ে গেল। আসুন দেখি উল্লেখযোগ্য কী কী ঘটনা ঘটেছিল এই পাঁচ বছরে, যেটা এত মৃত্যু কিংবা হারিয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে :

১. সত্তরের ঘূর্ণিঝড়
২. চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ
৩. যুদ্ধের পর ভারত থেকে ফিরে না আসা শরণার্থী
৪. একাত্তরের যুদ্ধ + অন্য আনুষঙ্গিক

১. সত্তরের ঘূর্ণিঝড়ে বলা হয়ে থাকে নিহতের সংখ্যা তিন লাখ, যদিও উইকিপিডিয়া অনুসারে সর্বোচ্চ ফিগার ধরা হয় ৫ লাখ। এর বেশি কাউকে আমি দাবি করতে শুনিনি।

২. ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ নিয়ে একটা সামান্য গরমিলের ব্যাপার আছে। ঘটনা হচ্ছে তৎকালীন সরকারের মতে সেই দুর্ভিক্ষে ২৭ হাজার মানুষ মারা যায়, যদিও বিভিন্ন সূত্র অনুসারে সংখ্যাটা মোটমাট ১০ থেকে ১৫ লাখ। আমরা যদি এর মাঝামাঝি একটা সংখ্যা ধরি তাহলে সাড়ে বারো লাখ।[৫] এই দুর্ভিক্ষে আসলে মানুষ মারা গিয়েছে অনেক পরে, যেটাকে বলে পোস্ট-ফেমিন। মোট মৃত মানুষের ৫ লাখই এই পোস্ট-ফেমিনে মারা যায়। বলা বাহুল্য এই দুর্ভিক্ষ ৭৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে, সুতরাং পোস্ট-ফেমিনে মৃত মানুষেরা আমাদের টাইম লাইনে পড়বে না। অর্থাৎ আমাদের টাইম লাইনে ৭৪ দুর্ভিক্ষজনিত মৃত মানুষের সংখ্যা বিয়োগ করতে হবে সাড়ে সাত লাখ।

৩. শরণার্থী শিবিরে সত্যিকার অর্থে থেকে যাওয়া মানুষের সংখ্যাটা বের করা আসলে সম্ভব না, যদিও *দ্য হিন্দু* পত্রিকার[৬] প্রতিবেদন থেকে আমরা জানি, ৯২ লাখ শরণার্থী দেশে ফিরেছে ১৯৭২ সালের মার্চের ভেতরেই। এদিকে

মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট আমাদের বলছে :

> 'পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমণ ও নির্যাতনের শিকার হয়ে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী ভারতে গমন করেন। ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় ১৪১টি শরণার্থী শিবির স্থাপিত করা হয়। এই শিবিরগুলিকে মোট ৯,৮৯৯,৩০৫ বাংলাদেশী আশ্রয় গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গে ৭,৪৯৩,৪৭৪, ত্রিপুরাতে ১,৪১৬,৪৯১, মেঘালয়ে ৬৬৭,৯৮৬, আসামে ৩১২,৭১৩ ও বিহারে ৮৬৪১ সংখ্যক বাংলাদেশী শরণার্থী আশ্রয় গ্রহণ করেন।'

অর্থাৎ প্রায় সাত লাখ শরণার্থী ফিরে আসেননি।

৪. এই তিন উৎস থেকে আমরা দেখি মোট হারিয়ে যাওয়া/মৃত মানুষের সংখ্যা (৭+৭.৫+৫) অর্থাৎ ১৯.৫ লাখ। এবার আমাদের হাতে থাকা ৬৫ লাখ থেকে বাদ পাচ্ছি ৪৫.৫ লাখ মানুষ নিখোঁজ/ নিহত।

বিহারি হত্যাকাণ্ড আর তৎকালীন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সর্বোচ্চ সীমা ধরে হিসাব করে দেখুন সবকিছুর বিবেচনায় শহীদের সংখ্যা কত হয়? যেকোনো সোর্স থেকে মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া বাদবাকি প্যারামিটারে সর্বোচ্চ মানগুলো গ্রহণ করলে মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা ত্রিশ লাখের চেয়ে অনেক বেশি।

গাণিতিক হিসাব

এবার আলোচনা করব কিছু গাণিতিক হিসাব নিয়ে। দেখব পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে মাত্র নয় মাসে ত্রিশ লাখ বাঙালিকে মেরে ফেলা আদৌ সম্ভব কি না। কারণ এ ধরনের কথা আমরা হরহামেশাই শুনে এসেছি যে এত কম সময়ে এত বেশি মানুষকে হত্যা করা নাকি অসম্ভব। আমরা এ জন্য তুলনা করব একাত্তর-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী ঘটে যাওয়া কয়েকটি যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা, হতাহতের সঙ্গে হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত সেনাবাহিনীর অনুপাত, মোট জনগোষ্ঠী হিসেবে ক্ষয়ক্ষতির শতকরা হার ইত্যাদি। ১৯৭১ পৃথিবীতে কিন্তু একবারই এসেছিল, অর্থাৎ আপনি নিশ্চয়ই পৃথিবীতে ১৯৭১ সালের আগে বা পরে এমন কোনো যুদ্ধ আশা করতে পারেন না যে যুদ্ধ ঠিক নয় মাসই টিকেছিল এবং যে যুদ্ধে ঠিক তিন মিলিয়ন মানুষই মারা গিয়েছিল বিরানব্বই হাজার অ্যাকটিভ সৈন্য এবং লাখ খানেক প্যারামিলিটারি আলবদর রাজাকারদের হাতে। আমরা হয়তো এ রকম যুদ্ধ পাব, যেখানে যুদ্ধটা আরও কম অথবা বেশি সময় টিকেছে, কিন্তু প্রতি মাসে বাংলাদেশের চেয়ে বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। আবার হয়তো এমন যুদ্ধ পাব যেখানে মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা হিসেবে আমাদের চেয়ে বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু প্রতিদিনের হত্যাকাণ্ডের হার হয়তো আমাদের চেয়ে কম। আবার এমন যুদ্ধ পাওয়া যাবে, যেখানে কম সৈনিকের হাতে বেশি গড়ে আমাদের চেয়ে বেশি মানুষের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এভাবে যুদ্ধগুলো তুলনা করলেই

বোঝা যাবে আমাদের দেশে মৃতের সংখ্যায় কি অতিরঞ্জন করা হয়েছে, নাকি এটা একটা স্বাভাবিক ধারণা।

প্রথমেই আমাদের জানা দরকার ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সৈনিকের সংখ্যা কত। অনেকের কাছেই তিরানব্বই হাজার অ্যাকটিভ সেনাবাহিনীর ব্যাপারটা তো মীমাংসিত। আসলে ব্যাপারটা নিয়েও আজকাল বিতর্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে একটি চক্র। ভারতীয় লেখিকা শর্মিলা বোস, পাকিস্তানের জেনারেল নিয়াজিসহ অনেকেই ৯৩,০০০ সৈন্যের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছেন। তিনি তাঁর *ডেড রেকনিং* বইতে লিখেছেন :

> '১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানে সৈনিক সংখ্যা ছিল ১২,০০০। সংকট মোকাবেলায় আরও সৈন্য আনা হয়েছিল ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার লে জে এ এ কে নিয়াজি এ ব্যাপারে লিখেছেন, আমার হাতে মোট সৈনিক বা যোদ্ধা ছিল ৪৫,০০০। এর মাঝে ৩৪,০০০ ছিল সেনাবাহিনী থেকে ও এগারো হাজার সিএএফ (সিভিল আর্মড ফোর্সেস এবং প্যারামিলিটারি) ও পশ্চিম পাকিস্তানি বেসামরিক পুলিশ ও অস্ত্রধারী নন-কমব্যাট্যান্টস। ৩৪,০০০ নিয়মিত সেনার মধ্যে ২৩,০০০ ছিল পদাতিক বাহিনীর সৈন্য, বাকিরা ছিল সাঁজোয়া, গোলন্দাজ, ইঞ্জিনিয়ারিং, সিগন্যালস ও অন্যান্য সহায়ক বাহিনী।'

শর্মিলা এরপর পাঠকের কাছে প্রশ্ন রাখেন, 'তাহলে কীভাবে ৩৪,০০০ সেনাসদস্য ও ১১,০০০ বেসামরিক পুলিশ ও অন্যদেরসহ মোট ৪৫,০০০ সদস্যের বাহিনীর দ্বিগুণেরও বেশি ৯৩,০০০ সৈন্য হয়ে ডিসেম্বর মাসে ভারতে যায় যুদ্ধবন্দী হিসেবে?'

তাঁর মতে, বারবার যে ৯৩,০০০ পাকিস্তানি সৈন্যের কথা বলা হচ্ছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে, তা সঠিক নয় এবং এভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সেনা শক্তিকে অনেকখানি বাড়িয়ে বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৭১ সালের আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রগুলো কিন্তু সে কথা বলে না। একাত্তরজুড়ে আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রগুলোতে বারবারই উঠে এসেছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধির কথা। কিছু প্রতিবেদনের বিবরণ একটু দেখে আসা যাক :

১. *টাইমস* ১৫ মার্চ ১৯৭১ বলছে বর্তমান সৈন্যসংখ্যা ৬০,০০০
২. লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *ইকোনমিস্ট* পত্রিকা ৩ এপ্রিল ১৯৭১ তাদের প্রতিবেদনে সৈন্যসংখ্যা উল্লেখ করেছে ৭০ হাজার
৩. *টাইমস* পত্রিকা ৫ এপ্রিল ১৯৭১ লিখেছে বর্তমান সৈন্যসংখ্যা ৮০ হাজার
৪. সিঙ্গাপুরের *দ্য নিউ নেশন* পত্রিকা ৬ এপ্রিল ১৯৭১ সৈন্যের সংখ্যা উল্লেখ করেছে ৭০ হাজার।
৫. *ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ* ২৫ আগস্ট ১৯৭১ লিখছে সৈন্যসংখ্যা এখন ১ লাখ।

প্রশ্নটা হচ্ছে, কেন বারবার একটি মহল থেকে এই নিষ্পত্তি হওয়া পাকিস্তানি ৯৩,০০০ যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা কমিয়ে ২০-২৫ হাজারে নিয়ে আসার একটা তীব্র প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ করছি? কী তাদের স্বার্থ? এককথায় উত্তর খুবই সহজ, সৈনিক সংখ্যা কম দেখানো সম্ভব হলে যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি, হতাহত, ধর্ষণের সংখ্যা কমিয়ে দেখানো যাবে। সৈন্যসংখ্যা কম হলে জনপ্রতি খুন/ধর্ষণের হার বেড়ে যায়। আর তখন সেটাকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

বধ্যভূমি

আমরা জানি আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে ৩৫টি স্থানকে বধ্যভূমি হিসেবে চিহ্নিত করে সেগুলো সংরক্ষণ করা হচ্ছে সরকারিভাবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মোট কতগুলো বধ্যভূমি আছে সেটা এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়নি। তবে ওয়্যার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং (ডব্লিউসিএফসি) এ দেশে প্রায় ৯৪২টি বধ্যভূমি চিহ্নিত করেছে। তারা জানিয়েছে, এই সংখ্যাটা এখানেই শেষ হয়নি। এর মধ্যে কেবল চট্টগ্রামেই আছে ১১৬টি। এ ছাড়া দেশের আনাচকানাচে সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে আরও অগণিত বধ্যভূমি। এর মধ্যে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী বধ্যভূমি স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের আহ্বায়ক প্রফেসর ড. গাজী সালেহ উদ্দিন[৭] জানান, স্বাধীনতার পর এ বধ্যভূমির শুধু একটি গর্ত থেকেই প্রায় ১ হাজার ১০০ মাথার খুলি উদ্ধার করা হয়। সংগৃহীত কঙ্কাল এখনো সংরক্ষিত রয়েছে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের স্মৃতি অম্লান জাদুঘরে। একাত্তরের এপ্রিল থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এখানে ২০ হাজারের মতো বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধকালে ঢাকায় হত্যা করে রায়েরবাজারে এনে ফেলে রাখা হতো। আর চট্টগ্রামে লোকজনদের ধরে এনে হত্যার কাজটি চলত পাহাড়তলীতে। যেখানে বধ করা হয় সেটাই বধ্যভূমি। সে হিসেবে পাহাড়তলী বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বদ্ধভূমি। ড. সুকুমার বিশ্বাস, স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের অন্যতম গবেষক। বাংলা একাডেমিতে কর্মরত অবস্থায় ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত তিনি সারা দেশে ঘুরেছেন এবং একাত্তরের বধ্যভূমি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁর অনেক লেখায় তিনি বলেছেন, রাজশাহীর একটি বধ্যভূমিতে একশটি গণকবর থেকে দশ হাজার মানুষের কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়। গল্লামারী বধ্যভূমি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারে পাশেই অবস্থিত। একাত্তরে খুলনা শহর মুক্ত হওয়ার পর গল্লামারী খাল ও এর আশপাশের স্থান থেকে প্রায় পাঁচ ট্রাক ভর্তি মানুষের মাথার খুলি ও হাড়গোড় পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, ওই স্থানে আনুমানিক ১৫০০০ মানুষ হত্যা করা হয়। বরিশাল সদরের পানি উন্নয়ন বোর্ডসংলগ্ন কীর্তনখোলা তীরে সরকারিভাবে স্তম্ভ নির্মিত বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয় এক থেকে দেড় হাজার

লোক। এ রকম অনেক অনেক আছে অথচ রায়েরবাজার এবং জল্লাদখানার মতো বিখ্যাত বধ্যভূমির মোট লাশের সংখ্যা কখনোই নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। তারপরও আমরা যদি না পাওয়া বধ্যভূমির কথা হিসাব করে সর্বসাকল্যে মোট ১০০০ বধ্যভূমির সংখ্যা ধরে নিই এবং প্রতি বধ্যভূমিতে ১০০০ করে লাশ থাকলে তাহলেই বধ্যভূমিতে মোট প্রাণ হারানো বাঙালির সংখ্যা হয় ১০ লাখ। এ ছাড়া নদীমাতৃক দেশে হাজার হাজার মানুষকে নদীর পাড়ে নিয়ে এসে হত্যা করা হয়েছে, এ রকম চাক্ষুস তথ্য আমাদের দিয়েছেন সাবসেক্টর কমান্ডার রুহেল আহমেদ চৌধুরী। তাঁর ব্যক্তিগত মতে, 'তিরিশ লক্ষ শহীদ একটা মুখের কথা, বিলিভ মি সংখ্যাটা চল্লিশ লাখ ছাড়িয়ে গেলেও আমি অবাক হব না। আই ওয়াজ দেয়ার অ্যান্ড আই প্রক্লেইম দ্যাট।'[৮]

এ পর্যায়ে এসে আমাদের সবার জানা কিছু উপাত্তের বিষয়ে সত্যতা নিশ্চিত করি। আমরা জানি, একাত্তরে বাংলার জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৫০ লাখ। পাকিস্তানি বাহিনী মোট আত্মসমর্পণকৃত সদস্যসংখ্যা ৯২ থেকে ৯৩ হাজার এবং মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে মোট ২৬৬ দিন। এবার একটু ক্যালকুলেটর নিয়ে বসি। যদি, আমরা ধরি শহীদের সংখ্যা ৩ লাখ, তাহলে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতি সদস্যকে প্রতিদিন হত্যা করতে হয় ৩ লক্ষ/৯২ হাজার/২৬৬ দিন = ০.০১২২৫৮৯০৮১৩ জনকে। অর্থাৎ প্রতিদিন শহীদ হয় : ৩০০,০০০/২৬৬=১,১২৮ জন। আর যদি, শহীদের সংখ্যা ধরি ৩০ লক্ষ, তাহলে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতি সদস্যকে প্রতিদিন হত্যা করতে হয় ৩ লক্ষ/৯২ হাজার/২৬৬ দিন = ০.১২২৫৮৯০৮১৩ জনকে। অর্থাৎ প্রতিদিন শহীদ হয় ৩০০০০০০/২৬৬= ১১২৭৮.১৯৫৪৮৮৭ জন।

একটু লক্ষ করুন, আগেই বলেছি, জাতিসংঘের দেওয়া তথ্য অনুসারে[৯] ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সালে প্রতিবছর আমাদের দেশে গড়ে ১১ লাখ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করে। সে হিসেবে গড়ে প্রতিদিন ৩০১৩ জন মানুষ মারা যেত স্বাভাবিক অবস্থায়ই, একটা বিরাট যুদ্ধের মধ্যে আমরা যদি দাবি করি প্রতিদিন ১,১২৮ জন মারা যাচ্ছে তাহলে সেটা হাস্যকরই মনে হয়। মৃত্যুহারের বিবেচনায় ১১,২৮০ অর্থাৎ ৩০ লাখই বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। আগেই উল্লেখ করেছি, ১৯৮১ সালে জাতিসংঘ সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ৩৩তম বছর উপলক্ষে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন মতে, মানব ইতিহাসে যত গণহত্যা হয়েছে এর মধ্যে বাংলাদেশের ১৯৭১-এর গণহত্যা স্বল্পতম সময়ে সর্ববৃহৎ সংখ্যা। গড়ে প্রতিদিন ৬০০০ থেকে ১২০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। দেখা যায় যে ২৫ মার্চ ১৯৭১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, এই মোটামুটি ২৬০ দিনে দিনপ্রতি ৬০০০-১২০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এই তথ্যটি দিয়ে একটু হিসাব করলে দেখা যাবে হত্যার সর্বনিম্ন সংখ্যা: ৬০০০ x ২৬০=১৫,৬০০০০ (পনের লাখ ষাট হাজার) এবং

সর্বোচ্চ সংখ্যা : ১২০০০ x ২৬০=৩১,১২০০০ (একত্রিশ লাখ বারো হাজার)। আমরা যদি এই পরিসংখ্যানের মাঝামাঝি ধরে হিসাব করি তাহলে এ সময় মৃত্যুর সংখ্যা ২৩,৪০০০০ (তেইশ লাখ চল্লিশ হাজার)। এখন, একাত্তরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাত কোটি পঞ্চাশ লাখ। প্রতি পরিবারে সদস্যসংখ্যা ৫ জন করে ধরলে পরিবার সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১ কোটি পঞ্চাশ লাখ। তাহলে প্রতি পরিবারে মারা গিয়েছে প্রায় ০.১৬ জন, অর্থাৎ ১৯৭১-এ শতকরা ১৬% পরিবারের কেউ না কেউ মুক্তিযুদ্ধে মারা গিয়েছিল। এখানে অন্তত শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ এমন অনেক পরিবার আছে যারা মুক্তিযুদ্ধে একাধিক সদস্য হারিয়েছে, একইভাবে বলা যায় এমন পরিবারও আছে যারা কোনো সদস্য হারায়নি। আবার একই সঙ্গে এটাও বলা যায়, কোনো কোনো পরিবার পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। একটা বিষয় লক্ষ করবেন, এই পরিবারগুলো একাত্তরের পরিবার, আজকে ২০১৪ সালের পরিবার নয়। ২০১৪ সালের হিসাবে এখন একাত্তর-পরবর্তী তৃতীয় প্রজন্ম। সহজ ভাষায় বললে একাত্তরের পরিবার থেকে তার পরবর্তী পরিবার এবং সেই পরিবারের পরবর্তী পরিবার এখন চলছে। অর্থাৎ এখনকার শতকরা ষোলটা পরিবারে আপনি একাত্তরের ভিকটিম পাবেন না। আপনাকে যেতে হবে আপনার দাদার পরিবারে, দাদার পরিবারের ভেতর দাদার ভাই-বোনও বিবেচনায় আসবে (তিরিশ-উর্ধ্বদের ক্ষেত্রে বাবার পরিবার)। আপনার দাদার-বাবার পরিবারের সাপেক্ষে বিবেচনা করে দেখুন একশ পরিবারে শহীদের খোঁজ পান কি না।

বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রে গণহত্যা

আমরা এখন অন্যান্য রাষ্ট্রের গণহত্যার খতিয়ান হাজির করব। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে গাণিতিক যুক্তি আগে হাজির করা হয়েছে ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে সেই দাবিটা পর্যালোচনা করা। মূলত এটাই প্রকৃত গবেষণার পদ্ধতি। আমরা ইতিহাসের যে গণহত্যা নিয়ে আলোচনা করব সে গণহত্যার নির্মমতা আর ভয়াবহতা বাংলাদেশকেও ছাড়িয়েছে।

কম্বোডিয়া : এখন আমরা তুলনা করে দেখব যে ১৯৭৫-১৯৭৯ সালের মধ্যে কম্বোডিয়ার খেমাররুজরা যে গণহত্যা চালিয়েছিল তার সঙ্গে ১৯৭১-এর গণহত্যার। কম্বোডিয়ায় খেমাররুজরা ক্ষমতায় ছিল চার বছর, ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত। এই চার বছরে তারা হত্যা করেছে প্রায় ১৭ থেকে ৩০ লাখ মানুষ। হ্যাঁ, অনেকে বলতে পারেন কোথায় চার বছর আর কোথায় ২৬০ দিন, তারপরও তো কম্বোডিয়ার গণহত্যা ৩০ লাখ ছাড়ায়নি। যাঁরা এ রকম ভাবছেন তাঁদের বলি, দাঁড়ান, একটু ধৈর্য ধরুন। তখন কম্বোডিয়ার জনসংখ্যা বাংলাদেশের

মতো সাড়ে সাত কোটি ছিল না, খেমাররুজরা ক্ষমতায় যাওয়ার সময় কম্বোডিয়ার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭৬ লাখ। তাহলে ভাবুন, ৭৬ লাখের মধ্যে ১৭-৩০ লাখকে মেরে সাফ করে ফেলেছে!

১৯৭৪-৭৫ সালে কম্বোডিয়ায় ১৫ লাখ ২০ হাজার পরিবারের বসবাস ছিল। কাজেই প্রত্যেক পরিবারে মারা গিয়েছে ১.১৮ জন করে, যেখানে বাংলাদেশের হিসাবটা ছিল ০.১৬। তাহলে বলতে হয় গড়ে কম্বোডিয়ার প্রত্যেক পরিবারই কাউকে না কাউকে হারিয়েছে, যা বাংলাদেশে ঘটেনি। জনসংখ্যার ২২ ভাগ মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত করতে খেমাররুজরা সময় নিয়েছিল ৪৮ মাস (৪× ১২=৪৮), তাহলে সেই হারে জনসংখ্যার ৪ ভাগ নিশ্চিহ্ন করতে খেমাররুজদের সময় লাগত সাড়ে আট মাস। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কাজ পাকিস্তানি বাহিনী নয় মাসে করেছে, খেমাররুজরা প্রায় সাড়ে আট মাসেই সেটা করতে পারত। তুলনামূলকভাবে খেমাররুজরা পাকিস্তানি বাহিনীর চেয়ে অনেক বেশি নৃশংস ছিল, আগেই বলা হয়েছে কম্বোডিয়ায় এক পরিবারে মারা গিয়েছিল ১.১৮ জন, যেখানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হিসাব ০.১৬, সুতরাং খেমাররুজরা পাকিস্তানি বাহিনীর তুলনায় ৭ গুণেরও বেশি নৃশংস ছিল (১.১৮/০.১৬)। অথচ কম্বোডিয়ার গণহত্যার ফিগার নিয়ে কিন্তু এত বিতর্ক হয়নি আজও।

নাইজেরিয়া : ৬ জুলাই ১৯৬৭ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ সাল পর্যন্ত চলা নাইজেরিয়ার যুদ্ধের দিকে এবার একটু আলোকপাত করব। প্রায় আড়াই বছর স্থায়ী এ যুদ্ধে প্রায় ত্রিশ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। নাইজেরিয়ার অচল অবস্থায় 'ইগবো' নিয়ন্ত্রিত মিলিটারি বাহিনী দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের তেলসমৃদ্ধ অঞ্চল 'বায়াফ্রা'কে ৩০ মে ১৯৬৭ সালে 'দ্য রিপাবলিক অব বায়াফ্রা' নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে। কেবল পাঁচটি দেশ বায়াফ্রাকে একটি নতুন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে চিহ্নিত করেছিল। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, তাদের আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মতো ছিল না মোটেও। যুদ্ধে হতাহত এই ত্রিশ লাখ জনগোষ্ঠী আবার আমাদের মতো একই গোত্রের বা অঞ্চলের ছিল না, বিভিন্ন অঞ্চলে মোট হতাহতের সংখ্যা ছিল এটা। ব্রিটিশ শাসনামলের পর ১৯৬০ সালে স্বাধীনতার পর কার্যত তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায় দেশটি এবং তাঁর পরিণতিতেই এই গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। যদিও 'বায়াফ্রা' নামক রাষ্ট্রটির পতন ঘটে, তারপরও বিশ্ব গণহত্যার মানচিত্রে নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সব মিলিয়ে এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের সক্রিয় সৈন্য ছিল ৩৫,০০০ থেকে ৭৫,০০০। তাহলে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ যেকোনো হিসাবের সৈনিক সংখ্যাকে বিবেচনায় নিয়ে নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধ থেকে পরিষ্কারভাবে বলা যায়, ৯০ হাজারের কম সৈনিক নিয়ে ত্রিশ লক্ষাধিক মানুষকে মেরে ফেলা অসম্ভব কিছু নয়।

রুয়ান্ডা : রুয়ান্ডা গণহত্যার কথা আমরা সবাই জানি, কারণ রুয়ান্ডা তাদের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজ শুরু করতে পেরেছে আমাদেরও আগে, রুয়ান্ডায় যে মূল দুই গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আছে তারা হচ্ছে হুতু ও তুতসি। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হুতু এবং তুতসিরা সংখ্যালঘু। ১৮৯৪ সালে জার্মানরা রুয়ান্ডা দখল করে নেওয়ার পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তা বেলজিয়াম দখলে নেয়। রুয়ান্ডা দখলের পর তারা তুতসিদের রুয়ান্ডার ক্ষমতায় বসায়। রুয়ান্ডায় ব্যবসা-বাণিজ্য এই তুতসিরা নিয়ন্ত্রণ করত। ১৯৬২ সালে বেলজিয়ানরা রুয়ান্ডা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় ক্ষমতা চলে যায় সংখ্যাগুরু হুতু সম্প্রদায়ের কাছে। এবার হুতুরা তুতসিদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যায়। এ অবস্থা দিন দিন বাড়তে থাকে। ১৯৯৪ সালের ১৭ এপ্রিল এই দ্বন্দ্ব গৃহযুদ্ধে রূপ নেয় এবং ১৯৯৪ সালের জুলাইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলতে থাকে। মাত্র ১০০ দিনের যুদ্ধে হুতুরা প্রায় ১০ লাখ তুতসি হত্যা করে। যা ছিল পুরো দেশের জনসংখ্যার ২০ ভাগ। এই যুদ্ধ থেকে আমরা দেখি মাত্র ১০০ দিনে দশ লাখ মানুষকে মেরে ফেলা খুবই সম্ভব। যেটা আমাদের দেশে সংগঠিত গণহত্যার প্রায় সমান। আমরা জানি পাকিস্তানি বাহিনী তাদের সংগঠিত অভিযানে ২৬৬ দিনে ত্রিশ লক্ষাধিক বাঙালিকে হত্যা করে। এর সঙ্গে সঙ্গে রুয়ান্ডার গণহত্যা থেকে আমরা আরও দেখতে পাই, ১০০ দিনের ভেতরে একটি দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ শেষ করে ফেলে অর্ধশিক্ষিত বর্বর একটি সেনাবাহিনী। সুতরাং ২৬৬ দিনে একটি জনগোষ্ঠীর সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্যে ত্রিশ লাখ অর্থাৎ ৪ শতাংশ মেরে ফেলা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম যুদ্ধবাজ একটি সেনাবাহিনীর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়।

চীন : নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা এলে সবাই 'দ্য ন্যানকিং ম্যাসাকার' কিংবা 'রেইপ অব ন্যানকিং'-এর কথা বলে থাকে। ১৯৩৭ সালের ১৩ ডিসেম্বর থেকে ১৯৩৮ সালের জানুয়ারির শেষ সময়ের ভেতর জাপানি সেনাবাহিনী চীনের রাজধানী ন্যানকিন শহরটিকে একদম গুঁড়িয়ে দেয়। প্রচুর পরিমাণে ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড এবং লুটতরাজ চলতে থাকে। শেষে হিসাব করে দেখা যায়, এই অল্প সময়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ। বলা হয়ে থাকে সেই যুদ্ধে এক তলোয়ারে ১০০ মানুষকে জবাই করা হতো। এই হত্যার বিচারের উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালে গঠিত হয় 'ন্যানকিন ওয়ার ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল'। জাপানের এই হত্যাকাণ্ড থেকে আমরা দেখতে পাই এক মাসেরও কম সময়ে কীভাবে একটি জনগোষ্ঠীর প্রায় তিন লাখ মানুষকে মেরে ফেলা সম্ভব।

আর্মেনিয়া : আর্মেনিয়া ইউরোপের একটি রাষ্ট্র। জর্জিয়া ও আজারবাইজানের সঙ্গে এটি দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চলে কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের স্থল যোজকের ওপর অবস্থিত। ইয়েরেভান দেশটির রাজধানী ও বৃহত্তম শহর।

জাতিগত আর্মেনীয়রা নিজেদের হায় বলে থাকে। আর্মেনিয়ার ৯০ শতাংশ লোক এই 'হায়' জাতির লোক। ১৯২২ সালে এটি সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৯৯১ সালে রাষ্ট্রটি স্বাধীনতা লাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুর্কিরা আর্মেনীয়দের ওপর নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। একটি রাষ্ট্রে কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়কে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক ধরে নিলে তাদের ওপর গণহত্যার সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধে হয়। ১৯১৫ সালের আর্মেনীয় গণহত্যা তারই উজ্জ্বল প্রমাণ। ষাটের দশকে আমরাও ছিলাম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চোখে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। সামরিক রাষ্ট্র অটোমানদের সঙ্গে পাকিস্তানের অনেক মিল। তিন বছর ধরে চলা এই গণহত্যায় সেই দেশে ১৫ লাখ মানুষ মারা যায়। সে সময় আর্মেনিয়ার জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৪৩ লাখ। তার মানে এই যুদ্ধে ৩৪ শতাংশ জনগোষ্ঠী নিঃশেষ হয়ে যায় তিন বছরে। আর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আমাদের জনগোষ্ঠীর ৪ শতাংশকে হত্যা করে নয় মাসে। আর্মেনিয়ার হত্যাকাণ্ড থেকেও বোঝা যায়, জনসংখ্যার শতকরা হারে আমাদের গণহত্যাকেও ছাড়িয়ে যায় আর্মেনিয়ার গণহত্যা।

এ রকম আরও অনেক আছে। আমি কেবল দৈবচয়নে গণহত্যা হয়েছে এমন কয়েকটি দেশ নির্বাচিত করেছি এবং এই অল্প কয়েকটি দেশে চলা গণহত্যাকে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি আমাদের গণহত্যা নির্মমতার দিক দিয়ে অন্যতম হলেও পৃথিবীময় চলা বিভিন্ন গণহত্যায় এই শতকেই আমাদের গণহত্যাকেও ছাড়িয়েছে অনেক দেশ। সাধারণ জনগণের ওপর রাষ্ট্রীয় হত্যাযজ্ঞের যে নির্মমতর নজির বর্বর তুর্কিরা, খেমাররুজরা, হুতুরা কিংবা পাকিস্তানিরা স্থাপন করেছে সে ক্ষত পুষিয়ে যুদ্ধহীন একটা সমাজ তৈরি করে নিতে এই জাতিগুলোর আরও সময় প্রয়োজন।

শরণার্থী শিবিরে নিহত : শহীদ নাকি মৃত

কথাসাহিত্যিক অদিতি ফাল্গুনীর বড় ভাই শরণার্থী শিবিরে মারা যান। অদিতি জানিয়েছেন তখন তাঁর বড় ভাই অনেক ছোট ছিল। শরণার্থী শিবিরে পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে তাঁর বড় ভাইয়ের মৃত্যু ঘটে। জানতে চেয়েছিলাম, আপনি কি শরণার্থী শিবিরে নিহত আপনার বড় ভাইকে ৩০ লাখ শহীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন? তিনি বললেন, 'আমি শহীদই মনে করি, তাঁর মৃত্যুর জন্য পাক আর্মিই দায়ী। আমার আরেক বড় ভাই তাঁর বয়স তখন চার, মাইলের পর মাইল বাবা-মার সাথে হাঁটতে হাঁটতে বলত 'বাবা পাক আর্মি কখন আসবে? ওরা কখন গুলি করবে? আমাদের গুলি করে না কেন?' সে ভাবত গুলি করাটা বোধ হয় কোনো মজার খেলা। তিনি এখন একজন কবি এবং স্থপতি, কানাডায় থাকেন। তাঁর নাম তুষার গায়েন'।[১০]

শরণার্থী শিবিরে নিহত ভাগ্যহত মানুষগুলো কি মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হিসেবে গণ্য হবেন কি না সে ব্যাপারে দ্বিমত আছে। যদিও সেসব নিহত মানুষদের আত্মীয়স্বজনেরা তাঁদের শহীদই মনে করেন, কারণ এই মৃত্যুর জন্য কোনো বুলেট না লাগলেও এই মৃত্যু ঘটেছিল পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মমতার কারণে। এই নিবন্ধে আমরা দেখব শরণার্থী শিবিরে শরণার্থী হয়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা কত আর তাদের মাঝে শহীদ হয়েছিল কত। আমাদের দেশের মানুষদের কাছে দেশ ছেড়ে শরণার্থী শিবিরে চলে যাওয়া মানুষদের সংখ্যাটা নিয়ে তেমন কোনো দ্বিমত নেই। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে জানা যায় শরণার্থীদের একেবারে সঠিক পরিসংখ্যান। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে :

> 'পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমণ ও নির্যাতনের শিকার হয়ে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী ভারতে গমন করেন। ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় ১৪১টি শরণার্থী শিবির স্থাপিত করা হয়। এই শিবিরগুলিকে মোট ৯,৮৯৯,৩০৫ বাংলাদেশী আশ্রয় গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গে ৭,৪৯৩,৪৭৪, ত্রিপুরাতে ১,৪১৬,৪৯১, মেঘালয়ে ৬৬৭,৯৮৬, আসামে ৩১২,৭১৩ ও বিহারে ৮৬৪১ সংখ্যক বাংলাদেশী শরণার্থী আশ্রয় গ্রহণ করেন।'

কিন্তু ৭১ সালে ইয়াহিয়া খান শরণার্থীদের সংখ্যা নিয়ে প্রচণ্ড মিথ্যাচার করেন। *নিউজউইক*-এর জ্যেষ্ঠ সম্পাদক আর্নড দ্য বোর্চগ্রেভ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার একটি সাক্ষাৎকার নেন। সাক্ষাৎকারটি তাৎক্ষণিকভাবে *ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন*সহ অনেক পত্রিকায় অনূদিত হয়। সেখানে শরণার্থী ইস্যুতে খোলাখুলি আলোচনা করা হয়। সাক্ষাৎকারটির চুম্বক অংশ তুলে ধরছি পাঠকের উদ্দেশে :

'প্রশ্ন : এখনো প্রতিদিন ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ শরণার্থী পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত পেরিয়ে ভারত চলে যাচ্ছে—এটাকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর : না, তারা যাচ্ছে না। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। যেভাবে ভারতীয়রা গোলা নিক্ষেপ করছে সীমান্তবর্তী মানুষদের এমনিতেই প্রাণের ভয়ে ছুটোছুটি করতে হচ্ছে। সীমান্ত চীনের প্রাচীরের মতো নয়। সীমান্তে চিহ্ন নেই। ভারতীয়রা বিদেশি সাংবাদিকদের ভারতের ভেতরের ভূখণ্ড দেখিয়ে বলে এটাই সীমান্ত।

প্রশ্ন : মাত্র কয়েক মাসে ৯০ লাখ মানুষ কীভাবে নিজের দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়?

উত্তর : সংখ্যাটা আমি মানতে নারাজ। ২০ থেকে ৩০ লাখ হতে পারে। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক দিয়ে গুনলে ৪০ লাখও পাওয়া যেতে পারে।'

ইয়াহিয়া খানের এই চরিত্র অজানা নয় আমাদের। যুদ্ধের সময়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম দেখানোর জন্য এরা মরিয়া হয়ে ছিল। আপনারা হয়তো জানেন, মুক্তিযুদ্ধের পর পাকিস্তানে গঠিত হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করে,

যুদ্ধের সময় বাংলাদেশে নিহত মানুষের সংখ্যা ২৬,০০০। ত্রিশ লাখকে যারা ছাব্বিশ হাজার বানিয়ে দিতে পারে, তারা এক কোটি শরণার্থীকে ২০ থেকে ৩০ লাখ বললে আমরা বরং একটু অবাক হই, এতটা বড় ফিগার তারা স্বীকার করে নিল কী করে!

আসলে ইয়াহিয়া খানের হাতে আর কোনো উপায়ও ছিল না। ৭১ সালে সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি ছিল আমাদের দিকে। বিশ্বময় সংবাদপত্রগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে আসলে যেকোনো মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হবে ১৯৭১ সালে ভারতে বাঙালি শরণার্থীর সংখ্যা ছিল এক কোটি কিংবা তার চেয়েও বেশি। মুক্তিযুদ্ধকালীন বিশ্বময় প্রকাশিত দেড় শতাধিক পত্রিকা থেকে আসুন একটু খুঁজে বের করার চেষ্টা করি শরণার্থীদের প্রকৃত সংখ্যা। প্রতিটি রিপোর্ট একটা একটা করে পড়ে দেখা অসম্ভব, সে জন্য আমি সবগুলো প্রতিবেদন থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যাটি আলাদা করে বের করেছি। একটা কথা খেয়াল রাখবেন, সমস্ত শরণার্থী কিন্তু এক দিনেই ভারতে পাড়ি জমাননি, আর তাই সংখ্যাটা বেড়েছে ক্রমান্বয়ে।

- *ডেইলি টেলিগ্রাম* ৩০ মার্চ ১৯৭১ লিখেছে; ২৫ মার্চ ১৫,০০০ মানুষ দেশ ছেড়ে পালায়।
- *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর ২৪ মে ১৯৭১ সালের তাদের পত্রিকায় বলেছে, এখন ভারতে শরণার্থী সংখ্যা ১৫ লাখ।
- একই পত্রিকা ৬ জুন ১৯৭১ লিখেছে ২০ লাখ।
- এরপর একই পত্রিকার ১৩ জুন ১৯৭১ সালের সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানিয়েছে ৫০ লাখ।
- সাপ্তাহিক *ইকোনমিস্ট* বলেছে প্রতিদিন ৬০,০০০ মানুষ পালাচ্ছে।
- *দ্য স্পেক্টেটর* তাদের পত্রিকায় ১৯ জুন ১৯৭১ বলছে ৫০ লাখ।
- *সানডে টাইমস* ২০ এবং ২১ জুন ১৯৭১ লিখেছে ৬০ লাখ
- *ইকোনমিস্ট নিউজউইক* ২৬ জুন বলেছে ৬০ লাখ।
- *ওয়াশিংটন ডেইলি* নিউজ ৩০ জুন ১৯৭১ লিখেছে ৬০ লাখ।
- *দ্য পালাভার উইকলি* ৮ জুন ১৯৭১ বলেছে প্রতিদিন ৫০,০০০ মানুষ দেশ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে।
- ১৭ জুলাই ১৯৭১ *ইকোনমিস্ট* বলছে ৬৮ লাখ।
- *হেরাল্ড ট্রিবিউন* ৯ আগস্ট ১৯৭১ বলেছে শরণার্থী এখন ৭০ লাখ।
- *কাইহান ইন্টারন্যাশনাল* ২ আগস্ট ১৯৭১ রিপোর্ট করেছে ৭৫ লাখ।

- সেনেগালের *লে সেলাই* ৭ সেপ্টেম্বর বলেছে ৮০ লাখ।
- *টরন্টো টেলিগ্রাম* ১৩ সেপ্টেম্বর বলছে ৮০ লাখ।
- *দ্য ইভিনিং স্টার* ৩০ সেপ্টেম্বর লিখেছে ৮০ লাখ শরণার্থীর কথা।
- *ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ* ২৫ সেপ্টেম্বর বলছে ৮৫ লাখ।
- *দ্য অ্যাডভান্স মরিশাস* ২৭ সেপ্টেম্বর বলেছে ৮৫ লাখ।
- *দ্য ওয়েস্টার্ন মেইল* ২৮ সেপ্টেম্বর বলেছে ৯০ লাখ।
- *নিউইয়র্ক টাইমস* ১১ অক্টোবর বলছে ৯০ লাখ।
- *লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস* ১৮ অক্টোবর বলেছে ৯০ লাখ।
- *লা লিবর বেলজিক* ১৮ অক্টোবর বলছে সংখ্যাটা ১ কোটি ছাড়িয়েছে।
- *নিউজউইক* ৬ ডিসেম্বর বলেছে ১ কোটি।
- *টাইমস* ২০ ডিসেম্বর বলেছে ১ কোটি।

একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ করলে দেখবেন, ২৫ মার্চ অর্থাৎ যুদ্ধের প্রথম প্রহর থেকেই শরণার্থীরা দেশ ত্যাগ শুরু করেন এবং সেই সংখ্যাটা মে মাসে এসে দাঁড়ায় ১৫ লাখ। জুনের মাঝামাঝি সংখ্যাটা হয় প্রায় ৫০ লাখ, যেটা আগস্টে এসে ৭০ থেকে ৭৫ লাখ হয়ে যায়। সেপ্টেম্বরে ৮৫ লাখ ছাড়িয়ে যায় এবং বাদবাকি সময়ে সংখ্যাটা ছাড়িয়ে যায় কোটির ঘর।

পৃথিবীর কোনো দেশই হঠাৎ করে এক কোটি শরণার্থীকে একসঙ্গে খাওয়াতে-পরাতে পারে না। এটা এক কথায় অসম্ভব। আর যখন এই শরণার্থীদের বড় অংশই শিশু ও বৃদ্ধ, তখন একটা অনিবার্য জিনিস ছিল মৃত্যু। এ ছাড়া গাদাগাদি করে থাকার কারণে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ে কলেরা, প্রাণ হারায় লাখ লাখ শিশু। মাঝখানে শীতের প্রকোপেও অনেক শিশুর মৃত্যু ঘটে।

এবার একটু ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিয়ে। পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আলফ্রেড কাস্টলার লা ফিগারো, *প্যারিস* পত্রিকায় ৮ অক্টোবর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যাকে হিরোশিমার পারমাণবিক বোমা হামলার চেয়েও ভয়াবহ বলে উল্লেখ করে বলেন, যাঁরা হিরোশিমা ঘটনার শিকার, তাঁরা ছিলেন ভাগ্যবান। কারণ, কিছু বুঝে ওঠার আগের তাঁরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন কিন্তু পাকিস্তানের শরণার্থীদের দুর্দশা—এর চেয়েও ভয়াবহ। তিনি লিখেছেন, পাকিস্তানি (বাংলাদেশ) শরণার্থীদের জন্য যে তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে, তা ফুরিয়ে গেছে। খাবার ও রসদ সরবরাহ থেমে গেছে, এটা নিশ্চিত। এখন থেকে কয়েক দিনের মধ্যে হাজার হাজার শিশুর মৃত্যু

ঘটবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'এখনই যদি খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা না যায়, তাহলে তিন থেকে পাঁচ লাখ বা তার চেয়েও বেশি শিশু মৃত্যুবরণ করবে।'

এরপর দেখি মালয়েশিয়ার *দ্য স্ট্রেইট টাইমস* ৮ জুন লিখেছে কলেরার মহামারির কথা। সেখানে বলা হয়েছে, মহামারিতে শরণার্থী শিবিরে এখন পর্যন্ত মৃত মানুষের সংখ্যা আট হাজার। *দ্য গ্লাতে নরওয়ে* লিখেছে, তিন লক্ষাধিক শিশু তীব্র অপুষ্টিজনিত মৃত্যুঝুঁকিতে রয়েছে। *দ্য অর্ডিন্যান্স নরওয়ে* ২৭ সেপ্টেম্বর লিখেছে, শুধু ক্ষুধা ও ঠান্ডায় লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটেছে।

ব্রিটিশ এমপি বার্নার্ড ব্রেইন *দ্য টাইমস* পত্রিকায় এক দীর্ঘ প্রতিবেদন লেখেন, শরণার্থী ইস্যুতে যেটা আলোচনার দাবি রাখে। তিনি লিখেছেন, দিনের পর রাত আসবে, এটা যেমন সত্য, আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ না এলে পাকিস্তানে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আসবে, এটাও তেমনি সত্য কথা। তিনি লিখেছেন, পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এর মধ্যে ৭৫ লাখ শরণার্থী ভারতে পাড়ি জমিয়েছে এবং এই সংখ্যাটা বেড়েই চলছে। খাদ্য উৎপাদনের ঘাটতি দেখিয়ে তিনি বলেন, শুধু খাবারের জন্য ৩০ লাখ মানুষ মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারে।

শরণার্থী ইস্যুতে জাতিসংঘের টনক নড়ানোর জন্য যুক্তরাজ্যভিত্তিক সহায়তা প্রতিষ্ঠান অক্সফাম এগিয়ে আসে। তারা প্রকাশ করে '*টেস্টিমনি অব সিক্সটি*'।[১১] ষাটজন বিশ্ববরেণ্য মানুষের সাক্ষ্য। সাক্ষ্যদাতাদের মাঝে আছেন মাদার তেরেসা, সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, সাংবাদিক জন পিলজার, মাইকেল ব্রানসন, নিকোলাস টোমালিন, অ্যান্থনি মাসকারেনহাসসহ অনেকে। বিরাট সেই দলিলে সাংবাদিক নিকোলাস টেমালিনের লেখা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি; 'যদি এই শিশুদের অতিরিক্ত প্রোটিন দেওয়া না হয়, তাহলে এরা অবশ্যই মারা যাবে। শিশুদের চার ভাগের তিন ভাগ নয় মাসের মধ্যে অবশ্যই মারা যাবে। তার মানে—১০ লাখ শিশু।'

ষাটজনের সাক্ষ্য থেকে সিনেটর কেনেডির লেখাটি উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য, সিনেটর কেনেডি বেশ কয়েকটি শরণার্থী শিবিরে যান। তিনি লিখেছেন : 'গত ত্রিশ বছরে পৃথিবী যত দুর্যোগ মোকাবিলা করেছে, তার মধ্যে ভয়াবহটি হচ্ছে পাকিস্তানের সংকট।' তিনি লিখেছেন, 'সপ্তাহের পর সপ্তাহ গড়াচ্ছে আর মৃত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। কেউ কেউ ভারতে যাচ্ছেন আর ৯০ লাখের মধ্যে মাত্র কয়েক শ জনকে খাওয়াচ্ছেন এবং শুশ্রূষা দিচ্ছেন।'

কলকাতার সল্ট লেকের শরণার্থী শিবির ঘুরে এসে তিনি জানান, ওখানকার ২ লাখ ৫০ হাজার শরণার্থী মোটামুটি ভালো আছেন; তারপরেও তাঁর মতে সেখানকার শিশুদের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। বিদেশি ও ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অবস্থা চলতে থাকলে মোট শিশুদের তিন-চতুর্থাংশ নয় মাসের মধ্যেই

মারা যাবে; সংখ্যাটা ১০ লাখ!

তিনি লিখেছেন, ৩০ হাজার শরণার্থীর দিয়ারা ক্যাম্পের কথা, যেখানে বন্যায় পুরো ক্যাম্পটাই তলিয়ে যায়। সেখানকার পরিবারগুলো কাদায় ঢাকা, নিজেদের মলমূত্র কখনোই ঠিকমতো পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। পানি ভেঙে খাবার আনতে হয়, ওষুধ থেকেও তারা বঞ্চিত পুরোপুরি। বন্যার পর আসছে শীত, এ মুহূর্তে ৯০ লাখ মানুষের চাই ৩০ লাখ কম্বল। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাপড় ও তাঁবু; এর সঙ্গে বাড়ছে কলেরার প্রকোপ। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির লেখাটি থেকে খানিকটা উদ্ধৃত না করলে এই লেখা সম্পূর্ণ হবে না। আমি তাঁর লেখা থেকে অল্প কিছু উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেন :

> আমি দেখেছি এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পের অবস্থার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য। কিন্তু অধিকাংশই বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। ক্যাম্পগুলোতে শিশু ও বৃদ্ধের সংখ্যা মোট শরণার্থীর ৫০ শতাংশ। যাদের বয়স পাঁচ থেকে কম এবং যারা বয়োবৃদ্ধ তারাই সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী। এ রকম বয়সের মানুষের সংখ্যাই শিবিরগুলোতে বেশি। এরা মোট শরণার্থীর ৫০ শতাংশ। এদের বেশির ভাগই মৃত্যুবরণ করছে। শরণার্থী শিবিরের মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেলে দেখে দেখে শনাক্ত করা সম্ভব, এক ঘণ্টার মধ্যে কারা মারা যাবে আর কাদের ভোগান্তি চিরতরে শেষ হওয়াটা কেবল কয়েক দিনের ব্যাপার মাত্র। শিশুদের দিকে দেখুন, তাদের ছোট্ট হাড় থেকে আলগা হয়ে ভাঁজে ভাঁজে ঝুলে পড়া ত্বক, এমনকি তাদের মাথা তোলার শক্তিও নেই। শিশুদের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখুন, পা ও পায়ের পাতার পানি নেমে অপুষ্টিতে ফুলে আছে। তাদের মায়ের হাতও নিস্তেজ। ভিটামিনের অভাবে তারা অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর সবচেয়ে বেশি কঠিন দৃশ্য, গত রাতে যে শিশুটি মারা গেছে, তার মৃতদেহও এখানেই। আমি যখন একজন শরণার্থী শিবিরের পরিচালককে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজনটি কী। জবাব এল : একটি শব-চুল্লি। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ একটি ক্যাম্পের তিনি পরিচালক।'

এবারে আসুন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিলটি নিয়ে। আর সেই দলিল নিয়ে আমার আগেই দুজন যোগ্য মানুষ কাজ করেছেন। তাঁদের একজন কুলদা রায় আরেকজন কিংবদন্তিতুল্য মুক্তিযুদ্ধ গবেষক এম এম আর জালাল। *জেনোসাইড* নামের একটা বই আছে, যার লেখক প্রখ্যাত গণহত্যা গবেষক লিও কুপার। বইটির প্রচ্ছদ করা হয়েছে কিছু সংখ্যা দিয়ে। লেখা হয়েছে—১৯১৫ : ৮০০,০০০ আর্মেনিয়ান। ১৯৩৩-৪৫ : ৬০ লাখ ইহুদি। ১৯৭১ : ৩০ লাখ বাংলাদেশি। ১৯৭২-৭৫ : ১০০,০০০ হুতু। নিচে লাল কালিতে বড় করে লেখা জেনোসাইড। এই অঙ্কের মানুষ গণহত্যার শিকার। এই ৮ লাখ, ৬০ লাখ, ৩০ লাখ, ১ লাখ—সংখ্যাগুলো একেকটি প্রতীক। গণহত্যার প্রতীক। ক্যালকুলেটর টিপে টিপে হুবহু মিলিয়ে দেওয়া পূর্ণ সংখ্যার হিসাব এখানে পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে পরিকল্পিত গণহত্যার মানবিক বিপর্যয়ের ইতিহাসের প্রতীক। *জেনোসাইড* বইটি নিয়ে অসাধারণ একটি প্রবন্ধ লিখেছেন মুক্তিযুদ্ধ গবেষক এম এম আর জালাল এবং

কুলদা রায়।[১২] তাঁদের প্রবন্ধ থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ তুলে ধরছি :

১৯৭১ সালের জুন মাসে *লাইফ ম্যাগাজিনের* সাংবাদিক জন সার কোলকাতায় এসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ফটোগ্রাফার মার্ক গডফেরি। তাঁরা দুজনে একটি গাড়িতে করে ঘুরে ঘুরে দেখেছেন শরণার্থীদের চিত্র। সময়টা জুন মাসের মাঝামাঝি। জন সার গিয়েছেন করিমপুরে। বৈষ্ণব ভক্তিবাদের প্রবক্তা চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের এই গ্রামটি পাকিস্তান সীমান্ত থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে। এখানে রাস্তা দিয়ে সীমান্ত পার হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে। পাক হানাদার বাহিনীর বর্বর গণহত্যার শিকার হয়ে এরা হারিয়েছেন এদের স্বজন, গবাদিপশু, ঘরবাড়ি, সহায়সম্পদ। ধারাবাহিক মৃত্যুর তাড়া খেয়ে এইসব ভয়ার্ত মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ভারতে ছুটে আসছে। সরাসরি গুলির হাত থেকে ঈশ্বরের দয়ায় এরা বেঁচে এসেছে। কিন্তু নতুন করে পড়েছে নতুন নতুন মৃত্যুর ফাঁদে। এদের পিছনে মৃত্যু। সামনে মৃত্যু। বায়ে মৃত্যু। ডানে মৃত্যু। সর্বত্রই মৃত্যুর ভয়ঙ্কর থাবা এদের তাড়া করে ফিরছে।

সাংবাদিক জন সার করিমপুরের রাস্তায় দেখতে পেলেন অসীম ধৈর্য্যের লম্বা শরণার্থী মানুষের মিছিল। তাদের কারো কারো মুখে রুমাল গোঁজা। একটা লোকের কাছে তিনি গেলেন। কোনোভাবে রুমালটি মুখ থেকে সরিয়ে লোকটি শুধু বলতে পারলেন, কলেরা। কলেরা। আর কিছু বলার নেই। পিছনে পাক সেনাদের গুলি। আর সঙ্গে কলেরা। সামনে অন্ধকার। কোথায় চলেছে তারা কেউ জানে না। মৃত্যুকে সঙ্গী করে তবু তারা এগিয়ে চলেছে। করিমপুরের মধ্যে দিয়ে যে রাস্তাটি চলে গেছে কোলকাতা বরাবর, তার বামদিকে শরণার্থী শিবির। এখানে আশ্রয় নিয়েছে ১৫০০০ মানুষ। এই শরণার্থী শিবিরে কলেরা নির্মমভাবে হানা দিয়েছে। ৭০০ জন ইতিমধ্যে মারা গিয়েছে। বাকীরা শিবির ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পালাবে কোথায়? কলেরাও তাদের সঙ্গে চলেছে। খোলা জায়গায় পড়ে আছে মরা মানুষ।

জন সার দেখতে পাচ্ছেন ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন নেমে এসেছে। তীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে মরা মানুষের দেহ। তাদের চোখ চক চক করছে। কিন্তু মৃত মানুষের সংখ্যা এত বেশী যে শকুনেরা খেয়ে শেষ করতে পারছে না। শকুনদেরও খাওয়ায় অরুচি এসে গেছে। মরা মানুষের গা থেকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলেছে জামা কাপড়। তাদের অনেকের তখনো গা গরম। সবেমাত্র মরেছে। পথে ঘাটে নালা নর্দমায় সর্বত্রই কলেরায় মরা মানুষ পড়ে আছে। জন সার দেখতে পেয়েছেন একটি শিশুর মৃতদেহ। শিশুটির গায়ে একটি শাড়ির অংশ পেঁচানো। তাঁর হতভাগী মা পেঁচিয়ে পুটুলি বানিয়েছে। ট্রাকের চলার সময় অসুস্থ শিশুটি মারা গেছে। চলন্ত ট্রাক থামেনি। মৃত ছেলের জন্য ট্রাক থামানো কোনো মানেই হয় না। আরও অনেক মৃতপ্রায় মানুষ এই ট্রাকেই ধুঁকছে। আগে পৌছাতে পারলে হয়তো কোনো হাসপাতাল পাওয়া যেতে পারে। তাদের সুযোগ মিলতে পারে চিকিৎসার। বেঁচেও যেতে পারে। এই আশায় সময় নষ্ট করতে কেউ চায় না। শিশুটির পুটুলী করা মৃতদেহটিকে ট্রাক থেকে রাস্তার পাশে ধান ক্ষেতে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

একটি ওয়ান ডেকার বাসের ছবি তুলেছে জন সারের সঙ্গী ফটোগ্রাফার মার্ক গডফেরি। বাসটির হাতল ধরে ঝুলছে কয়েকজন হতভাগ্য লোক। আর ছাদে বসে আছে, সব মিলিয়ে জনা সত্তর জন। কেউ কেউ বমি করছে। কারো কারো মুখে রুমাল চাপা। কেউ কেউ রুমালের অভাবে হাতচাপা দিয়েছে। ছাদের মানুষের বমি জানালা দিয়ে বাসের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আর বাসের মধ্যের বমি জানালা দিয়ে বাইরে ছিটকে পড়ছে পথে-ঘাটে, মাঠে, খালে, জলাশয়ে। হাটন্ত মানুষের গায়ে। বমির সঙ্গে জীবনবিনাশী কলেরার জীবাণু। এইসব হতভাগ্য মানুষের চোখ গর্তের মধ্যে ঢোকানো। আর তার মধ্যে জ্বলজ্বল আতঙ্ক। বাসভর্তি করে কলেরা চলেছে। বাইরে পড়ে আছে একটি মৃতদেহ।

এই সব মানুষ এত বেশী সংখ্যায় মরেছে যে আমরা গুনতে পারিনি। গোনা সম্ভব নয়। একজন স্বেচ্ছাসেবক সাংবাদিক জন সারকে বলছেন, এরা জানে না তারা কোথায় যাচ্ছে। তারা চলছে তো চলছেই। তীব্র রোদে হাঁটতে হাঁটতে তারা ক্লান্ত অবসন্ন। তৃষ্ণার্ত হয়ে পথের পাশ থেকে আঁজলা ভরে কলেরাদুষ্ট পানি পান করছে। তারা এত দুর্বল হয়ে পড়ছে যে, আক্রান্ত হওয়ার পর একদিনও টিকতে পারছে না। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। তিনি লিখেছেন, কাঁটাখালি গ্রামে রাস্তার পাশ থেকে হৈচৈ করে একটি ট্রাক থামাতে চেষ্টা করছে একদল শরণার্থী। তারা করুণ স্বরে আবেদন করছে ট্রাকচালককে তাদেরকে ট্রাকে তুলে নিতে। তাদের মধ্যে যারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে তারা রাস্তার পাশে মাটির উপরে শুয়ে আছে। তাদের পরিবার অসহায় হয়ে চেয়ে। তাদের হেঁটে যাওয়ার শক্তি নেই। যাদের সঙ্গে কিছু টাকা পয়সা আছে তারা কোনোমতে ট্রাকে উঠে পড়েছে। ট্রাকে করে তারা কৃষ্ণ নগর হাসপাতালে যেতে পারবে। সেখানে চিকিৎসা পাওয়ার চেষ্টা করবে।

করিমপুরের আশেপাশে গ্রামগুলোতে কোনো ডাক্তার নেই। কলেরা ভ্যাক্সিন নেই। নেই কোনো প্রতিষেধক অষুদপত্র। কাছাকাছি কৃষ্ণ নগরে একটি হাসপাতাল আছে। হাসপাতালের উদ্দেশে অসুস্থ মানুষ চলেছে মানুষের কাঁধে চড়ে। কেউবা বা বাঁশের তৈরি টেম্পোরারি স্ট্রেচারে করে। গরুর গাড়িতে। কেউবা রিকশায়। কৃষ্ণ নগর হাসপাতালে তিল ধারণের জায়গা নেই। যারা হাসপাতালে এর মধ্যে এসে পড়েছে—তখনো বেঁচে আছে, তাদের রাখা হয়েছে বাইরে খোলা মাঠে। যাদের চিকিৎসা শুরু হয়েছে তাদের রাখা হয়েছে অস্থায়ী ছাউনিতে। বাঁশের কাঠামোতে কাপড় বসিয়ে ছোটো ছোটো শিবির করে ছাউনি তৈরি হয়েছে।

সেখানে কিছু কিছু মানুষ বেঁচে থাকার জন্য মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। তাদের চোখ গর্তের মধ্যে ঢুকে গেছে। অর্ধচেতন বা অচেতন জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পড়ে আছে। তাদের মুখে মাছি পড়ছে। মশা ঘুরছে। অনন্তবিদারী দুর্গন্ধ। স্বজনদের কেউ কেউ হাত দিয়ে, তালে পাখা দিয়ে বা কাপড়ের আঁচল দিয়ে মাছি তাড়ানোর চেষ্টা করছে। সাদা এপ্রোন পরা নার্সরা তাদের শিরায় ঢোকানোর চেষ্টা করছে স্যালাইন। তাদের চেষ্টার কমতি নেই। কিন্তু নার্সের বা ডাক্তারের সংখ্যা হাতে গোনা, অপ্রতুল।

এই হতভাগ্যদের অর্ধেকই শিশু। সাংবাদিক জন সার একটি সাত বছরের ফুটফুটে মেয়ে শিশুকে তুলে এনেছে রাস্তা থেকে। তার চোখ বড় করে খোলা। তার হাত ঝুলে পড়েছে। নার্স এক পলক দেখেই বলছে, সব শেষ। কিছু করার নেই। মেয়েটি মরে গেছে। একজন ক্লান্ত ডাক্তার বলছেন, এর চেয়ে কুকুর-বিড়ালেরাও ভালো করে মরে। কিছুটা হলেও তারা চেষ্টা তদ্বির পায়। আর এই শরণার্থী মানুষদের কলে পড়া ইঁদুরের মত মরা ছাড়া কপালে আর কিছু লেখা নেই।

এতক্ষণ তো দেখলেন বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে মৃত্যুর আশঙ্কা নিয়ে অনেক অনেক লেখা, কিন্তু আদতে ঠিক কত মানুষ মারা গিয়েছিল শরণার্থী শিবিরে, সেটা আমাদের জানা নেই। আর জানা সম্ভব হবে কি না, তা-ও জানি না। তবু একটু গবেষণার পথ ধরে অনুমান করা যায় সংখ্যাটা।

*দ্য ল্যানসেট*কে বলা হয়ে থাকে পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে পুরোনো মেডিকেল জার্নাল। এটাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানজনক মেডিকেল জার্নালও বলা হয়ে থাকে। তাদের রিসার্চ জার্নালে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়েও সচেতনতা তৈরি করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী শিবির নিয়ে একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে তারা তাদের একটি জার্নালে।[১৩]

তাদের ভাষ্য কলকাতার একটি স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপকে নিয়ে, যারা একাত্তরের জুনের শেষ থেকে বাহাত্তরের ফেব্রুয়ারির শুরু পর্যন্ত পাঁচ মাস চালু থাকা একটা শরণার্থী শিবিরের ওপর সার্ভে চালায় এবং তাদের সার্ভেটি খুবই বিশ্বাসযোগ্য, কারণ সেই সব ডেটা প্রতিটি ঘর থেকে আলাদাভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সার্ভের উদ্দেশ্য ছিল ক্যাম্পের জনসংখ্যা, সেখানকার মানুষের বয়সের ধরন আর মৃত্যুহার নিয়ে।

তাদের ভাষ্যমতে, ১ লাখ ৭০ হাজার শরণার্থীর ওই আশ্রয় শিবিরে কম করে হলেও ৪ হাজার মানুষ মারা যায়। তারা বলেছে, সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি হতে পারে, স্বাভাবিক মৃত্যুকে তারা বিবেচনা করেনি এবং নিহতদের বড় অংশই ছিল শিশু। এই প্রবন্ধে আরও তথ্য আছে, তবে আমার দরকার এটুকুই।

আমাদের কাছে যে ডেটা আছে সেটা থেকে আমরা আগেই দেখছি, জুনের আগে থেকেই প্রচুর শরণার্থী ভারতে পাড়ি জমায়। *টাইম* পত্রিকার ২৪ মে ৭১ সংখ্যা থেকে জানা যায়, শরণার্থীর সংখ্যা তখন ছিল ১৫ লাখ, এরপর একই পত্রিকার ১৩ জুন ৭১ সংখ্যা অনুসারে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ৫০ লাখে। *সানডে টাইমস* ২১ জুন ৭১ লিখেছে শরণার্থীর সংখ্যা ৬০ লাখ, *ইকোনমিস্ট* লিখেছে ২৬ জুন তারিখে যে শরণার্থীর সংখ্যা তত দিনে ৬০ লাখ ছাড়িয়েছে।

এখানে দেখলাম সেই শরণার্থী শিবির খোলার আগেই প্রচুর মানুষ দেশ ছেড়েছে এবং তাদের অনেকে অবশ্যই মারা গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত *নিউজউইক*-এর ৬ ডিসেম্বর ৭১ থেকে জানা যায়, শরণার্থীর সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়েছে। ভারতের শরণার্থী শিবিরের মধ্যে কলকাতার শিবিরগুলোই মোটামুটি ভালো বলে বিবেচিত হয়, অন্য অনেক শরণার্থী শিবিরের অবস্থা ছিল অনেক ভয়াবহ, ছিল না ন্যূনতম খাদ্য আর চিকিৎসাসেবা। সুতরাং সেসব শিবিরে মৃত্যুহার হওয়ার কথা আরও ভয়ংকর রকম বেশি, কিছু ক্যাম্পে কলেরার প্রকোপের কথাও আমরা শুনেছি। বন্যা, শীত—এসব তো বাদই দিলাম। তবু অনেক কমিয়ে এই সংখ্যাটাকেই ধ্রুব ধরে যদি শরণার্থী শিবিরে নিহত মানুষদের সংখ্যাটা কত হতে পারে, সে নিয়ে ধারণা করতে চাই, তাহলে হিসাবটা দাঁড়ায় অনেকটা এ রকম :

১ লাখ ৭০ হাজার মানুষের মধ্যে কমপক্ষে মৃত ৪ হাজার, তাহলে এক কোটি মানুষের মাঝে পাঁচ মাসে ন্যূনতম নিহতের সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ।

৬০ লাখ জনগোষ্ঠী দেশ ছাড়ার পর এই হিসাব করা হয়েছে। পুরো হিসাবটা আরও ভয়াবহ, হয়তো এই সংখ্যাটার দ্বিগুণ কিংবা তিন গুণ। কারণ বলা হয়েছে এটা পাঁচ মাসের হিসাব আর ক্যাম্পটা কলকাতার সেরা ক্যাম্প, যেখানে ছিল পর্যাপ্ত ডাক্তার, খাদ্য আর থাকার জায়গা আর জন সারের হিসাবে ১৫ হাজার মানুষের মাঝে মৃত ৭০০, তাহলে; এক কোটি মানুষের জন্য হিসাবটা হয় প্রায় পাঁচ লাখ।

এখানে আমরা দেখেছি, এটা জুন মাসের হিসাব। যদি ধরেও নিই এই শিবিরটা প্রথম থেকেই ছিল অর্থাৎ মার্চের শেষ দিক থেকে তাহলে মাত্র তিন মাসের মৃত্যুর হার এটা। এই ক্যাম্প যদি ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভবত আপনারা সংখ্যাটা আঁচ করতে পারছেন। এরপর শরণার্থী শিবিরে জুন মাসেই ৫০ লাখের ৬ লাখ মারা যায়, এমন একটা নিউজ করেছিল *ওয়াশিংটন ডেইলি নিউজ* (২২ জুন)। মনে রাখবেন, জুন যুদ্ধ শুরুর ৪ মাস। ডিসেম্বরের আগেই শরণার্থীর সংখ্যা ছিল এক কোটির ওপরে। সেই হিসেবে হতাহতের সংখ্যা ১২ লাখের ওপরে ছিল।

শেষ কথা

আমার ব্যক্তিগত অভিমত, মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী শিবিরে নিহত মানুষের সংখ্যা কম করে হলেও ৬ থেকে ১২ লাখ। আজকের দিনে যারা পুরো যুদ্ধেই মৃতের সংখ্যা দুই কিংবা তিন লাখ দাবি করে, তাদের আসলে জানা উচিত শরণার্থী শিবিরে মৃত মানুষগুলোর কথা। এদের শহীদের মর্যাদা দেওয়া হবে কি না আমি জানি না, কিন্তু এদের মৃত্যুর কারণ সেই একটাই—পাকিস্তান। আশা করি সামনের দিনগুলোতে শরণার্থীদের নিয়ে আরও অনেক কাজ হবে, আমাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ অংশটির চিত্র ফুটে উঠবে আরও পরিষ্কার হয়ে।

তথ্যসূত্র :

১. http://www.theguardian.com/world/2011/may/24/mujib-confusion-on-bangladeshi-deaths

৩. "রিপোর্ট ১৯৭১" পূর্ণ কবিতার লিঙ্ক—
https://abrittiokobita.wordpress.com/2014/06/09/%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%AD%E0%A7%A7/

৪. হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট—
http://www.bangla2000.com/Bangladesh/Independence-War/Report-Hamoodur-Rahman/default.shtm

৫. https://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_famine_of_1974#endnote_Alamgir
৬. http://www.genocidebangladesh.org/refugees/
৭. http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/22787
৮. রুহেল আহমেদের সাক্ষাৎকার আমি নিজে গ্রহণ করেছি।
৯. https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Bangladesh
১০. সাক্ষাৎকার আমি নিজে গ্রহণ করেছি।
১১. "The Testimony of Sixty - Oxfam" http://www.liberationwarbangladesh.org/2015/12/the-testimony-of-sixty.html
১২. দেখুন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যা : ভিন্ন অধ্যায়, কুলদা রায় এবং এম এম আর জালাল, শৈলী, http://shoily.com/?p=10916
১৩. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(72)92225-8/abstract

বই আলোচনা

জেনোসাইড বাংলাদেশ : আপেক্ষিক বনাম তথাগত দৃষ্টিভঙ্গি

মো. ফজলে রাব্বি

কল্যাণ চৌধুরী বিরচিত *জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ (১৯৭২)*-এর আলোকে একটি পর্যালোচনা

শিরোনামকেন্দ্রিক বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় প্রবেশ করার আগে গ্রন্থের মান ও গ্রহণযোগ্যতা-সম্পর্কিত মূল্যায়ন প্রয়োজন। সাধারণ পর্যালোচক হিসেবে অভিমত, গ্রন্থ কখনো ভালো বা খারাপ, সম্পূর্ণ বা অপূর্ণ হওয়া সম্ভবপর নয়। গ্রন্থ যেকোনো বিষয়ে কিছু কথা বা তথ্য বা সংখ্যা উপস্থাপনের মাধ্যমে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কিছু পাঠককুলের মধ্যে ভাববাচ্যের অবতারণা ঘটায়। নিরপেক্ষ বা সর্বজনীন গ্রন্থ বলতে আদৌ কোনো গ্রন্থ আছে কি না তা গবেষণার বিষয়। আলোচ্য গ্রন্থটির সীমাবদ্ধতা আড়ালের জন্য যুক্তির অবতারণা নয়, বরং সব সংবেদনশীল পাঠককে ব্যক্তিমানসিক আতশি কাচ দিয়ে যেকোনো গ্রন্থ পাঠ করার সবিনয় অনুরোধমাত্র।

কল্যাণ চৌধুরী বিরচিত *জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ* (১৯৭২) গ্রন্থে একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি রয়েছে, তবে নিতান্ত প্রেক্ষাপট ও কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে এই দ্বিরুক্তি। তিনি গ্রন্থের ভূমিকা অধ্যায়ে ১৯৭১ কে বাংলাদেশের পক্ষে এবং বাংলাদেশীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থটি মূলত বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর নৃশংসতা ও জেনোসাইডের বিবরণ। এ জন্য হয়তো তিনি পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট (পৃ. ১)। গ্রন্থটি ১৯৭২ সালে রচিত এবং গ্রন্থটির পর্যালোচনার বর্তমান প্রয়াসটির সময় ২০১৬। গ্রন্থটি এবং গ্রন্থটির পর্যালোচনা দুই-ই হয়তো সংগঠিত নয় বলে প্রতীয়মান হতে পারে। গ্রন্থটি যে সময়ে রচিত মুক্তিযুদ্ধের বিজয়, ত্যাগ সব তখনো সতেজ। অনেক প্রশ্নের উত্তর হয়তো অজানা

বা জানা হলেও তখনকার পরিস্থিতিতে সরল কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে গরল। কল্যাণ চৌধুরী বিরচিত *জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ* (১৯৭২) গ্রন্থটি যে বিষয়সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে একই কক্ষপথে বক্ররেখায় সংযুক্ত বোঝানোর জন্য অন্যান্য গ্রন্থের তথ্য ও তথ্যসূত্র আলোচ্য পর্যালোচনায় ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আত্মপরিচয় ও অস্তিত্ব মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১-এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ও পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম অসাধারণ ঘটনা ছিল।[১] কোনো দেশের সশস্ত্র স্বাধীনতাসংগ্রামে হতাহতের ঘটনা কোনো বিস্ময়কর বা আকস্মিক ঘটনা নয়। তবে স্বাধীনতার জন্য জেনোসাইডের মতো নৃশংস ও বীভৎস মানবতাবিরোধী অপরাধের বলি হওয়া সর্বজনীনভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত ও ঘৃণিত। বাংলাদেশের জনগণকে দমনে সংঘটিত জেনোসাইডের মাধ্যমে ৩ মিলিয়ন বা ৩০ লাখ মানুষ হত্যা, ১/৪ মিলিয়ন বা ২ লাখ কিশোরী ও নারীর সম্ভ্রমহানি এবং ১০ মিলিয়ন বা ১ কোটি মানুষকে বাস্তুহারা ও দেশত্যাগে বাধ্য করার বদৌলতে বাংলাদেশের স্বাধিকারের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল।[২] তবে অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে বিশ্বসমাজে সর্বজনীন মনোভাবের অনুপস্থিতি ও সংকীর্ণ স্বার্থবাদী অপসামাজিক-রাজনৈতিক সংস্কৃতির কারণে জেনোসাইড বিশ্ব ইতিহাসে বারবার পুনরাবৃত্তি হয়ে আসছে। জেনোসাইডের সঙ্গে অস্বীকৃতির সংস্কৃতি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। অস্বীকৃতির সংস্কৃতির ধারক ও অভিভাবক শুধু জেনোসাইড অপরাধের অপরাধী নয়, বরং সংঘটিত অপরাধের গুরুত্ব অপেক্ষা লঘুতার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি ও সমাজ সমভাবে দায়বদ্ধ। অবশ্য দায়বদ্ধতার প্রশ্ন তখনই উত্থাপন করা যায় যখন ব্যক্তি ও সমাজ বিশ্বমানবতার প্রতি নিঃশর্তভাবে শ্রদ্ধাশীল থাকে। নচেৎ সর্বজনীনতা, বিশ্বমানবতা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ প্রতিরোধ ও বিচারের চেতনা বিশ্ববাসীর দায়বদ্ধতার আলোচনা উলুবনে মুক্তা ছড়ানো বই আর কিছু নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অভিযুক্ত অপরাধীদের অস্বীকৃতি নয় বরং তৎকালীন বিশ্বসমাজের নেতৃস্থানীয় ও তাদের প্রতিক্রিয়াশীল উত্তরসূরিদের অস্বীকৃতির জন্য বাংলাদেশে সংঘটিত জেনোসাইড আন্তর্জাতিকভাবে অস্বীকৃত ও অগ্রন্থিত রয়ে গেছে। বাংলাদেশ জেনোসাইডে ক্ষতিগ্রস্ত কেউ যদি বৈশ্বিক অস্বীকৃতিকারীদের অকাট্য যুক্তিকে (যুক্তি না মানবতা প্রণিধানযোগ্য?) আবেগতাড়িত হয়ে উন্মাদের প্রলাপ আখ্যা দেয় তা দোষণীয় কি না ভাববার বিষয়। বাংলাদেশ জেনোসাইডের অস্বীকৃতির প্রধান যুক্তিদ্বয় ছিল—১৯৭১ সালের যুদ্ধ ছিল পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধ এবং ৩০ লাখ মানুষ হত্যা ও ২ লাখ নারীর সম্ভ্রমহানির সংখ্যাতত্ত্ব আবেগী বাঙালির অতিরঞ্জন। এই যুক্তিগুলো ১৯৭২ সালে গ্রন্থিত কল্যাণ চৌধুরী তাঁর *জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ* গ্রন্থে হয়তো পরোক্ষভাবে খণ্ডন করেছেন।

১৯৭১ সালজুড়ে বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক জান্তার নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী জেনোসাইড সংঘটিত করছে বলে খণ্ড সংবাদ ও সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে। *সাটারডে রিভিউ* সাময়িকীতে 'পূর্ব পাকিস্তানে জেনোসাইড' শিরোনামে ২২ মে, ১৯৭১ একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সম্ভবত প্রথম এই নিবন্ধে পূর্ব পাকিস্তানে চলমান পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগী বেসামরিক সশস্ত্র দলগুলোর গণহারে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ও নির্যাতনকে প্রথম জেনোসাইড হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়।[৩] এই নিবন্ধ প্রকাশের এক মাসের মধ্যে অ্যান্থনি মাসকারেনহাস তাঁর 'জেনোসাইড' শীর্ষক নিবন্ধটি দ্য *সানডে টাইমস* পত্রিকায় প্রকাশ করেন।[৪] অবশ্য 'দ্য ভিক্টিমস' শিরোনামে ২৮ মার্চ, ১৯৭১ *সানডে টেলিগ্রাফ* সম্পাদকীয় পরোক্ষভাবে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী পরিকল্পিত জেনোসাইড অপরাধকে নির্দেশ করেছে।[৫] সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ব্যতিরেকে কল্যাণ চৌধুরী বিরচিত *জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ* (১৯৭২) গ্রন্থটি বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সংঘটিত 'জেনোসাইড' শীর্ষক প্রথম রচিত গ্রন্থ বলা যেতে পারে। তাঁর গ্রন্থটি ১৯৭২ সালে আর এন দাস কর্তৃক মেসার্স ওরিয়েন্ট লংম্যান লি. থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক আইন ও বিশ্ব মানবাধিকার জগতে 'জেনোসাইড' অপরাধের সঙ্গে 'অপরাধের অস্বীকৃতি' ও 'হতাহতের সংখ্যাতত্ত্ব বিতর্ক' ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর জে রামেল তাঁর বিরচিত *স্ট্যাটিকস অব ডেমোসাইড : জেনোসাইড অ্যান্ড ম্যাস মার্ডার সিন্স ১৯০০* (১৯৯৭) গ্রন্থে জেনোসাইড সংঘটনের সময়ে তাৎক্ষণিক হতাহত ও তার পরবর্তী সময়ে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার প্রভাবে হতাহতের সংখ্যাতত্ত্ব নিরপেক্ষণের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি প্রস্তুতি ও ব্যবহারের প্রয়াস পেয়েছেন। আর জে রামেল তাঁর *ডেথ বাই গভর্নমেন্ট* গ্রন্থে ডেমোসাইডের সংজ্ঞায়নে বলেছেন, 'কোনো সরকার কর্তৃক সংঘটিত জেনোসাইড, পলিটিসাইড এবং গণহত্যাসহ যেকোনো ব্যক্তি হত্যা বা গণহত্যা কাণ্ড।'[৬] তিনি বাংলাদেশ জেনোসাইডকে একটি বৃহত্তর ডেমোসাইড হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বিভিন্ন মাধ্যমিক উপাত্ত সংকলন ও পরিবিন্যাসের মাধ্যমে বাংলাদেশে জেনোসাইডে হতাহতের একটি উপাত্তভিত্তিক নিবন্ধ সংকলনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, নিশ্চিতভাবে প্রমাণ সাপেক্ষে পাকিস্তান ডেমোসাইডে ১৫ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।[৭] তবে বিভিন্ন কার্যকারণ ও পরিস্থিতি বিচারে বলা যায়, চূড়ান্ত নিহতের সংখ্যা ৩০ লাখের বেশি হতে পারে।[৮]

জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ গ্রন্থটি বাংলাদেশে সংঘটিত জেনোসাইডের নিকটতম সময়ে রচিত। তথ্যসূত্রগুলো ক্রমিক ও কাঠামোবদ্ধ না হলেও মৌলিক ও সমসাময়িক বাস্তবতাকে উপস্থাপন করেছে, যার গুরুত্ব স্বীকার করা অনিবার্য।

কল্যাণ চৌধুরী *জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ* (১৯৭২) গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশে সংঘটিত জেনোসাইডের একটি সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জেনোসাইড সংঘটনের কার্যকারণ অনুধাবনে দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও শাসনতন্ত্রের কলুষতা, বৈষম্য, শঠতা, অগণতান্ত্রিক আচরণ ও পাকিস্তানের পূর্বাংশের জনপদের (পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পরিচিত) জনগণকে দমন ও শোষণের অপচেষ্টাহেতু প্রতিবাদ ও সংঘাতের পরিক্রমার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করার অবকাশ পেয়েছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সংবাদসূত্র এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পরপর গঠিত সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন তদন্ত দলের তথ্যসূত্র ব্যবহার করে বাংলাদেশ জেনোসাইডের প্রথম ভাগ গ্রন্থিত করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে গ্রন্থকার পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বর্বরোচিত নিধনযজ্ঞের ভয়ে উদ্বাস্তু শরণার্থীদের দেশান্তর ও অমানবীয় জীবনযাপন উপস্থাপন করেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে দেশব্যাপী চলমান জেনোসাইডের দ্বিতীয় ভাগ (সংগঠিত হত্যাযজ্ঞ) উপস্থাপন করেছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশ জেনোসাইডে অপরাধের বিভিন্ন ধারাসম্পর্কিত ঘটনাবলি উপস্থাপন করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে গ্রন্থকার জেনোসাইডের সংজ্ঞায়নের আপেক্ষিক বনাম তথাগত দৃষ্টিভঙ্গির বিতর্কের অবতারণা করেছেন।

কল্যাণ চৌধুরী দেশি-বিদেশি প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানবন্দি উদ্ধৃত করে বিভিন্ন গ্রামীণ ও শহুরে অঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ, হত্যাযজ্ঞ ও পাশবিকতার কথ্যচিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। বর্ণনায় সমসাময়িক পরিস্থিতিতে বেঁচে যাওয়া এই প্রত্যক্ষদর্শীদের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতাপ্রসূত তথ্য-উপাত্ত গাণিতিকভাবে আংশিক ভ্রান্ত হলেও চিরন্তন সত্য। কল্যাণ চৌধুরী গ্রন্থনের সূচনায় তাঁর তথ্যসূত্র সম্পর্কে লিখেছেন, মূলত সামরিক অভিযানের শুরুতে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশিরা, ইউরোপীয় পাদরিগণ এবং সামরিক প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে আগত সাংবাদিক, স্বেচ্ছাকর্মী ও ত্রাণকর্মীরা। তিনি অবশ্য সচেতন গ্রন্থকারের মতো গ্রন্থের শুরুতে সচেতনভাবে তাঁর গ্রন্থের উপস্থাপনায় পক্ষপাতদুষ্টতা এবং বিষয়বস্তুর আড়ম্বরতা থাকতে পারে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

কল্যাণ চৌধুরীর মতে, পাকিস্তানের অসংহতি ও ভাঙন কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং ঐতিহাসিক পটপরিক্রমার ফল। পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহীদের ভারতের সামরিক সহায়তা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন মুক্তিযুদ্ধের ফলাফলকে ত্বরান্বিত করেছে মাত্র। বাংলাদেশ জেনোসাইডের জন্য পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আগ্রাসন বা পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সম্প্রীতির পাকিস্তান ভাঙনের প্রচেষ্টার জন্য দায়ী করা হলেও,

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের সময় থেকেই পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে কোনো মনস্তাত্ত্বিক মতৈক্য ছিল না। কল্যাণ চৌধুরীর মতে, এই অনৈক্যের কারণ ছিল পশ্চিমের পাঞ্জাবি ও আগের বাঙালি সমাজের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পার্থক্য এবং ১২০০ মাইল ভৌগোলিক দূরত্ব (পৃ. ৩)। মোহাম্মদ আইয়ুব এবং কে. সুবরিমানিয়্যামও *দ্য লিবারেশন ওয়ার* (১৯৭২) গ্রন্থে নিপীড়ন বৃত্তান্ত অধ্যায়ে পাকিস্তানের রাজনৈতিক কাঠামো এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কখনোই পূর্ব বাংলার জন্য সবান্ধব ছিল না বলে উল্লেখ করেছেন।[৯] গ্রন্থকার বাংলাদেশ জেনোসাইডের কার্যকারণ অনুসন্ধানে ২৫ মার্চ, ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পেশ করেছেন। তাঁর মতে, ১৯৪০ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত লাহোর প্রস্তাব অনুসারে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে একাধিক রাষ্ট্রগঠনের কথা থাকলেও ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ফসল হিসেবে পাকিস্তান এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। একক মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে আওয়ামী লীগ লাহোর প্রস্তাবের লঙ্ঘন দাবি করে। পাকিস্তানের শাসকশ্রেণির সদিচ্ছার অভাবে পাকিস্তান একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বাঙালি জনগোষ্ঠী ছিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ। ৭৫ মিলিয়ন বা ৭ কোটি ৫০ লাখ জনগণের মধ্যে ১২ মিলিয়ন বা ১ কোটি ২০ লাখ ছিল হিন্দু (সনাতন ধর্মাবলম্বী) যাদের বহিরাগত হিসেবে বিবেচনা করা হতো। পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকে গণপরিষদ থেকে সরকারি প্রশাসন কোথাও পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সমতা লক্ষ করা যায়নি। উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালের ৮৩ জন মুসলিম আইসিএস কর্মকর্তাদের মধ্যে মাত্র একজন বা দুজন ছিলেন পূর্ব বাংলার।[১০] পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য ও বিরোধের উৎসগুলো যেমনি গুণগত তেমনি পরিমাণগত। রফিকুল ইসলাম তাঁর বিরচিত *দ্য মিলিয়নস* গ্রন্থে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যের অসমতার একটি তুলনামূলক ছক উপস্থাপন করেছেন।[১১]

কল্যাণ চৌধুরী বলেছেন, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। তবে তাঁর গ্রন্থে ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর যে বৃহৎ জনযুদ্ধ ও জেনোসাইড সংঘটিত সেটি আলোচ্য বিষয়। অবশ্য এই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা প্রস্তুত খুব একটা সহজসাধ্য নয়, কারণ যখন মিলিয়ন মিলিয়ন (১ মিলিয়ন = ১০ লাখ) মানুষকে হত্যা করা হয় তখন মৃতদেহের শুমারি করা অসম্ভব বলে তিনি অভিমত দিয়েছেন। ১৯ মার্চ ১৯৭২ জেনারেল টিক্কা খান এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার দোষে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ৩০ হাজার বাঙালিকে হত্যা করেছে এবং ৪ জন নারী ধর্ষণ করেছে বলে জানান। অবশ্য সপ্তাহ খানেক পরই ২৬ মার্চ, ১৯৭২ জুলফিকার আলী ভুট্টো

একজন ভারতীয় সাংবাদিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিহতের সংখ্যা ৫০ হাজার বলে জানান। অন্যদিকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তে শেখ মুজিবুর রহমান ৩ মিলিয়ন বা ৩০ লাখ শহীদ হয়েছেন এবং দুই লাখ নারীর সম্ভ্রমহানি করা হয়েছে মর্মে ঘোষণা দেন (পৃ. ৫)। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্যের সমর্থনে অবশ্য ইয়াহিয়া খানের উদ্ধৃতি : Kill 3 million of them and the rest will eat out of our hands উল্লেখ করা যায়।[১২] পরবর্তী সময়ে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সূত্র ব্যবহার করে আর জে রামেল দেখিয়েছেন মোট নিহতের সংখ্যা ৩০ লাখ বা অধিক হতে পারে।[১৩]

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর ২২ ডিসেম্বর, ১৯৭১ প্রকাশিত দৈনিক *পূর্বদেশ*-এর 'ইয়াহিয়ার ফাঁসি চাই' শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধ এবং ৫ জানুয়ারি, ১৯৭২ দ্য *মর্নিং নিউজ* প্রকাশিত সংবাদে মুক্তিযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ৩০ লাখ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৪] পরিকল্পিত শুমারির মাধ্যমে কেবল প্রকৃত হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা নিরূপণ সম্ভব বলে কল্যাণ চৌধুরী উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি শঙ্কা প্রকাশ করেন যে নভেম্বর ১৯৭০ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক মানুষ, ১ মিলিয়ন বা ১০ লাখের বেশি প্রাণহানি এবং স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ২৫ মার্চ, ১৯৭১ পাকিস্তান বাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী আগ্রাসী সামরিক আক্রমণের কারণে মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ ও মহামারিতে উপকূলীয় ও প্রান্তিক অঞ্চলের বহু মানুষের প্রাণহানির ঘটনা বস্তুনিষ্ঠ শুমারি প্রণয়ন দুষ্কর করে তুলবে।

আর জে রামেল বাংলাদেশ জেনোসাইডের জন্য প্রধানত ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু এবং ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী আন্তর্জাতিক ত্রাণসহয়তা বরাদ্দ সত্ত্বেও পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসন কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে ধীরগতিতে অপর্যাপ্ত ত্রাণ সরবরাহের কারণে দুর্ভিক্ষে অনেক মানুষের মৃত্যু পূর্বাঞ্চলীয় জনগণের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সঞ্চার করে, যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে এবং সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় সত্ত্বেও তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে সামরিক শাসকের অস্বীকৃতি পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং সামরিক সরকারের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা জ্ঞাপন প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক সরকারের শাসনাধীন রাষ্ট্রে জনমত ও গণশক্তি দমনে জেনোসাইড সংঘটন অনিবার্য করে তোলে।[১৫] ঢাকায় ১৮-২০ মার্চ, ১৯৭১ অপারেশন সার্চলাইট প্রণয়ন করা হয়। সংশোধিত চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি ২৪ মার্চ সেনা কর্মকর্তাদের অবহিত করা হয়। মেজর জেনারেল খাদিম হাসান রাজা ও মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী খান অপারেশনের মূল পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নের জন্য ১৮ মার্চ ঢাকা সেনানিবাসে বৈঠকে বসেন।[১৬] টিক্কা খানের দাবি ছিল তাঁকে পর্যাপ্ত সেনাবাহিনী

দিলে তিনি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বাঙালিদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবেন।[১৭] জেনারেল টিক্কা খানের কাছে ছয় ডিভিশন সেনা প্রস্তুত ছিল বাঙালি জাতিকে চিরকালের মতো দমন করার জন্য।[১৮]

সামরিক সরকারপ্রধান ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবুর রহমানের আট দিনব্যাপী চলমান রাজনৈতিক সমাধানের জন্য বৈঠক ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হত্যাযজ্ঞ পরিক্রমা শুরু হয়। ২৫ মার্চ ১৯৭১ শুরুতে হত্যাযজ্ঞ নির্দিষ্ট কিছু স্থানে সীমিবদ্ধ থাকলেও পরবর্তী সময়ে দ্রুততার সঙ্গে অন্যান্য স্থানেও শুরু হয়। ঢাকার উত্তরাংশে অবস্থিত হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আটকে পড়া বিদেশি সাংবাদিকেরা রাতভর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের ব্যারাকসহ অন্যান্য এলাকায় জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ধোঁয়া ও স্ফুলিঙ্গ দেখেছেন। পরের দিন বহিষ্কৃত ৩৫ জন বিদেশি সাংবাদিক ঢাকা ত্যাগের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অগ্নিশিখা ও গোলাগুলির আওয়াজ শুনেছেন বলে পরবর্তী সময়ে তাঁদের সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদনে জানিয়েছেন। তাঁরা এয়ারপোর্ট রোডের দুই পাশে প্রায় ৫০০ বস্তিঘর ও দোকানপাট আগুনে ভস্মীভূত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন (পৃ. ২৩)। ৩৫ জন বিদেশি সাংবাদিক বহিষ্কারের বিষয়টি ২৮ মার্চ, ১৯৭১ *নিউইয়র্ক টাইমস*-এ গ্রেস লিকটেনস্টেইনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ও রয়টার্সের দুজন সাংবাদিক এই সময় হোটেলে উপস্থিত ছিলেন না। প্রতিবেদনে দ্য *টাইমস*-এর স্যুয়েনবার্গের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, যখন তিনি ওই এলাকার ভারপ্রাপ্ত লে. কর্নেলকে তাঁদের ঢাকা ত্যাগের নির্দেশ প্রদানের কারণ জানতে চাইলে অফিসারের মন্তব্য ছিল, 'আমরা তোমাদের নিরাপত্তাঝুঁকির জন্য তোমাদের চলে যেতে বলছি। এখানে অনেক রক্তারক্তি হবে।' দ্য *টাইমস*-এর পক্ষ থেকে পাকিস্তান সরকারের কাছে পাঠানো একটি টেলিগ্রামে স্যুয়েনবার্গ এবং অন্য সাংবাদিকদের সঙ্গে পাকিস্তান সামরিক প্রশাসনের অশোভন আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।[১৯] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা ও স্বাধীনচেতা ছাত্রদের দমনে ১৮ ও ৩২ নম্বর পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এবং ২২ নম্বর বেলুচ রেজিমেন্টের ইউনিটসমূহকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। রাতেই এই ইউনিটগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল ও জগন্নাথ হল আক্রমণ করে। ১৯৭১ সালের ২৫-২৬ মার্চ এবং ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের অবাঙালি ও প্রতিক্রিয়াশীল বাঙালি দোসররা এক হাজারের অধিক শিক্ষককে হত্যা করেছে (পৃ. ২১০)। তাঁরা মার্কিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত এম-২৪ ট্যাংক ও ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্যতম প্রধান লক্ষ্যবস্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছিল এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল দখল করে সেখান থেকে ছাত্রদের আবাসস্থলগুলোর ওপর আক্রমণ পরিচালনা করে। ব্রিটিশ কাউন্সিলে দায়িত্বরত আটজন বাঙালি পুলিশকে

পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে ও গ্রন্থাগারের বইপত্র পুড়িয়ে দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল ছিল পাকিস্তান সরকারবিরোধী ছাত্রসংগঠনগুলোর প্রধান কেন্দ্রস্থল। ৩০ মার্চ, ১৯৭১ দ্য *ডেইলি টেলিগ্রাফ*-এ প্রকাশিত সায়মন ড্রিংয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০ ছাত্র নিহত হয়েছে এবং সেনাবাহিনী ৩০টি মৃতদেহ ব্যতীত অন্যান্য মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, সাতজন শিক্ষক এবং তাঁদের ১২ জন পারিবারিক সদস্য তাঁদের নিবাসে নিহত হয়েছেন। ১৯৭৪ সালে আবুল হাসনাত তাঁর বিরচিত গ্রন্থেও দুই শ ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।[২০] রবার্ট পেইন তাঁর গ্রন্থে ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত ছাত্রসংখ্যা ১০৯ জন উল্লেখ করেছেন।[২১] অবশ্য পাকিস্তানের ৩২তম পাঞ্জাব রেজিমেন্ট যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণের পুরোধা ছিল, তাঁর একজন সামরিক কর্মকর্তা ইকবাল হলে বারো জন মারা যায় তাঁর মধ্যে সন্দেহভাজন দুজন নারী ছিল। হলের একজন ছাত্র ও একজন নৈশপ্রহরী বাদে বাকি বাইরের দশজন মারা গিয়েছে বলে ধারণা করা হয়।[২২] যদিও আর জে রামেলের *ডেথ বাই গভর্নমেন্ট* গ্রন্থে উদ্ধৃত ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ধারণকৃত বেতার কথোপকথন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহতের সংখ্যা তিন শ জানা যায়।[২৩] ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসারত একজন আহত শিক্ষার্থীর কাছ থেকে জানা যায়, পাকিস্তানি বাহিনী ১০৩ জন শিক্ষার্থীকে হত্যা করেছে। জগন্নাথ হলের হত্যাকাণ্ডে বেঁচে যাওয়া একজন শিক্ষার্থীর বর্ণনায়, সে ম্যানহোলে লুকানো অবস্থায় ৬ জন শিক্ষার্থী ও হলের পেছনে আবাসিক নিবাসে ১২ জন নারী ও শিশুকে হত্যা করা হয়েছে প্রত্যক্ষ করেছে। আওয়ামী লীগের মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত *ইত্তেফাক* পত্রিকা কার্যালয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি ইউনিট অতর্কিত হামলা চালায়। হামলায় প্রায় ৪০০ মানুষ প্রাণ হারান।[২৪] সর্বাপেক্ষা নির্মম হত্যাযজ্ঞ পরিচালিত হয়েছে ২৬ মার্চ পুরান ঢাকা এলাকায়। নয়া বাজার, ইংলিশ রোড, ফ্রেঞ্চ রোড, সদরঘাট ও বুড়িগঙ্গার তীরবর্তী এলাকায় সামরিক অভিযানে অগণিত মানুষ হতাহত হন। এই এলাকার অধিকাংশ অধিবাসী শেখ মুজিবুর রহমানের সমর্থক ছিলেন বলে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রোশের মাত্রা সবচেয়ে বেশি ছিল। ২৫ মার্চ রাত থেকে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী ও প্রায় ৫০০ ছাত্রকে হত্যা করা হয়। ইপিআর দপ্তরে পাকিস্তান বাহিনীর অভিযানে ১০০০ জন ইপিআর সদস্যের ৬০০ জনই নিহত হন এবং বাকিদের মধ্যে যাঁরা বন্দী হয়েছিলেন পরবর্তী সময়ে তাঁদের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। আর জে রামেলের *ডেথ বাই গভর্নমেন্ট* গ্রন্থ অনুসারে, ২৫-২৬ মার্চ চার থেকে দশ হাজার পুলিশ সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে।[২৫] ২৬ মার্চ সারা দিন পাকিস্তান বাহিনী সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দু অধ্যুষিত

শাঁখারীবাজার ও টানবাজারে বসবাসরত হিন্দুদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করে। আর জে রামেলের তথ্যানুসারে, শুধু ঢাকায় ২৫ মার্চ দশ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়।[২৬] স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশ সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগের খসড়া প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাকিস্তান বাহিনী শাঁখারীবাজারে ঘরে ঘরে ঢুকে প্রায় ৮০০০ পুরুষ, নারী ও শিশুকে হত্যা করেছে। ২৫-৩১ মার্চ পর্যন্ত ঢাকাজুড়ে পরিচালিত হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী মার্কিন নাগরিকদের একটি ঘটনা বিবরণী ১৪ জুলাই, ১৯৭১ মার্কিন সিনেটে উপস্থাপন করা হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শী একজন বাঙালি ছাত্রের কাছ থেকে জানা যায়, ২৬ মার্চ সদরঘাটে অপেক্ষারত সব যাত্রীকে হত্যা করা হয়েছিল। ২৯ মার্চ সদরঘাটের প্ল্যাটফর্ম ও বাথরুম রক্তে রঞ্জিত ছিল। একজন মার্কিন মিশনারি শাঁখারীবাজারে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের লোমহর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ভয়াবহ গোলাগুলির পর ২৯ মার্চ রমনা কালিবাড়িতে বসবাসরত ২০০ জন হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে ৭০-১০০ জনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। একইভাবে নয়া বাজার রায়ের বাজার ও মহাখালী হাসপাতালের নিকটবর্তী বস্তিসহ অসংখ্য বস্তি পুড়িয়ে ভস্ম করে দেওয়া হয় এবং বস্তিগুলোর ওপর নির্বিচারে গুলি চালানো হয়। (পৃ. ২৭-২৯)। বাংলাদেশ সরকারের হিসাব অনুযায়ী, ২৫ থেকে ২৬ মার্চ শুধু ঢাকা শহরে বিভিন্ন পেশার ১৫ হাজার জনকে হত্যা করা হয়েছে। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেটসহ অন্যান্য জেলা থেকে প্রাপ্ত হিসাব অনুসারে ২৫-২৭ মার্চ ১ কোটি আশি লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। পাকিস্তানি সেনারা ২ এপ্রিল বারিধারাতে আটককৃত ৬০০ জনকে দিনভর জিজ্ঞাসাবাদের পর ৪৮ জন শিক্ষক, ছাত্র রাজনীতিবিদ ও হিন্দু ব্যক্তিকে গুম করেছিল। বাংলাদেশ সরকারের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে, বুড়িগঙ্গার তীরবর্তী জিঞ্জিরায় ১০ হাজার জনকে হত্যা করা হয়, যাদের অধিকাংশ জীবন বাঁচাতে নদীপথে ঢাকা ত্যাগ করছিল। (পৃ. ৩১-৩২) *পাকিস্তান অবজারভার*-এ কর্মরত এম হাসান তাঁর এক সাক্ষাৎকারে ৬-১০ মে বুড়িগঙ্গাতে অসংখ্য মৃতদেহ ভাসমান দেখেছেন, যাদের মধ্যে অনেকের মৃতদেহ একসাথে বাঁধা ছিল। সদরঘাটে বসবাসরত অনেকে তাকে বলেছিলেন সাত্তার দেয়াশলাই কারখানার শ্রমিকদের অবাঙালি বিহারিরা পাকিস্তানি বাহিনীর নির্দেশে নির্বিচারে হত্যা করেছিল। তিনি আরও জানান, দৈনিক *পূর্বদেশ*-এর এম হাসান উল্লাহ চৌধুরীর মতো মিরপুরের অবাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় বসবাসরত অনেক বাঙালিকে অবাঙালিরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এম হাসানসহ বহু যুবককে পাকিস্তানি বাহিনী ও সশস্ত্র অবাঙালিরা ধরে ট্রাকে করে নিয়ে গুম করেছে, তাদের আর কোনো হদিস পাওয়া যায়নি (পৃ. ৩৪)।

৬ এপ্রিল পাকিস্তানের সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে দাবি করলেও বিমানবন্দরের কাছাকাছি অবস্থানরত অনেকেই বিমানবন্দরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিয়মিত সেনাদলের আগমন প্রত্যক্ষ করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক জনবল বৃদ্ধির জন্য সামরিক সরকার দুটি বোয়িং ৭০৭ একটি বেসরকারি আইরিশ কোম্পানির কাছ থেকে এক বছরের জন্য বন্দোবস্ত নেয়। বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুসারে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৮০-১০০ হাজার সামরিক সদস্য এবং হতাহতদের বিপরীতে নিয়মিত সামরিক সদস্য নিয়ে আসা হয়েছে। পাকিস্তান বাহিনীর নবম ডিভিশন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে সদর দপ্তর স্থাপন করে পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত বন্ধ করে দেয় এবং নিয়মিত টহলের ব্যবস্থা করে। অন্যদিকে ১৬তম ডিভিশন যশোর ক্যান্টনমেন্টকে সদর দপ্তর হিসেবে ব্যবহার করে পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করে।

অন্যদিকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র প্রশাসন নিজেদের হস্তগত করে। পশ্চিম পাকিস্তানি অথবা উর্দুভাষী অবাঙালিদের বাঙালি কর্মকর্তাদের অপসারণ করে দায়িত্ব দেওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারের একজন মুখপাত্র জানান, সামরিক অভিযানের ছয় মাসের মধ্যে এক হাজার বাঙালি কর্মকর্তাকে অপসারণ করে পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয় (পৃ. ৩৫)। বাঙালি স্বাধীন হলেও যেন জাতি হিসেবে মেরুদণ্ড সোজা না করতে পারে সে লক্ষ্যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কর্মদক্ষ বা অদক্ষ এক-তৃতীয়াংশ শিল্পকারখানার শ্রমিককে হত্যা করা হয়।[২৭]

পাকিস্তান বাহিনীর সামরিক আগ্রাসনের পাশাপাশি বাঙালি সংস্কৃতি ও পরিচয় পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ঢাকাসহ অন্যান্য শহরের সড়কসমূহের হিন্দু ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী নাম পরিবর্তন করে পাকিস্তানি নামকরণ করা হয়। রাতারাতি শাঁখারীপট্টি সড়কের নাম হয়ে যায় টিক্কা খান রোড। পূর্ব পাকিস্তানের সব এলাকায় পাকিস্তানি সামরিক প্রশাসন বাংলার পরিবর্তে উর্দু চালু করে। সেনাবাহিনী সরাসরি ঘোষণা দেয় পূর্ব পাকিস্তানিদের উর্দু শিখতে হবে কারণ তাদের 'মাতৃভাষা সভ্য নয়'। ব্যবসায়ীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে ইংরেজিতে রাখেন, কারণ তাঁরা উর্দু জানতেন না।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীকে বিতাড়িত করার জন্য পাকিস্তানি বাহিনী সুসংগঠিত হত্যাযজ্ঞ ও লুণ্ঠন চালিয়েছে সে সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এপ্রিলের শুরু থেকে মূলত বাঙালি শরণার্থীদের ভারতের পথে যাত্রা শুরু হয়। শরণার্থীদের লক্ষ্য ছিল সীমান্তবর্তী নিরাপদ স্থান অথবা সীমান্তের ওপারে ভারতে আশ্রয়। প্রায় আট মাস শরণার্থীদের এই স্রোত বহমান থাকে। আন্দ্রে মালরাক্স শরণার্থীদের বাস্তুহারা যাত্রাকে 'জেনোসাইডের অভিন্ন অংশ' আখ্যায়িত

করেছেন। বাংলাদেশ সরকারও ১০ এপ্রিল ভারতের আগরতলার নিকটবর্তী কুষ্টিয়ার মুজিবনগরে গঠিত হয়। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আগ্রাসনের শিকার ১০ মিলিয়ন হিন্দুসহ খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ এবং 'সাচ্চা মুসলিম' (উর্দু-আরবি শব্দ যুগল) ব্যতীত সব মুসলিম বাঙালি। পাকিস্তানি সেনারা আটক করলে কলেমা ও কোরআন পাঠ করে মুসলিম পরিচয় প্রমাণ করতে পারলে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত। জুন মাস পর্যন্ত আগত শরণার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংকলিত তথ্যানুসারে, পাঁচ লাখ মানুষ পূর্ব পাকিস্তানে নিহত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের চরের মুসলিম কৃষক ও হিন্দু জেলে অধ্যুষিত গ্রামগুলো পর্যন্ত পাকিস্তানি নৃশংসতা থেকে রেহাই পায়নি (পৃ. ৬৮-৬৯)। ২৮ জুলাই, ১৯৭১ আইআরসিতে প্রেরিত জরুরি মিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রায় ৬ মিলিয়ন বা ৬০ লাখ মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী বাঙালি শরণার্থী তাদের পূর্ব পাকিস্তানের আবাসস্থল ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের সীমান্তে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। প্রতিদিন হাজার হাজার নতুন শরণার্থীর আগমন ঘটছে। ভারতের আইআরসি মিশন পরিচালিত সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, পশ্চিম পাকিস্তানের পাশবিক ও নির্মম শাসন থেকে জীবন রক্ষার্থে তাঁরা দেশ ত্যাগ করেছেন (পৃ. ৩৫)। শরণার্থী বিষয়ে কল্যাণ চৌধুরী আরও উল্লেখ করেছেন, সামরিক আক্রমণের পর প্রায় ১০ মিলিয়ন বা ১ কোটি লোক ভারতে আশ্রয় নেয় (পৃ. ৫)। তাঁর প্রদত্ত পেশাভিত্তিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতে আগত শরণার্থীদের মধ্যে ৫.৭ মিলিয়ন বা ৫০.৭ লাখ কৃষক, ২.৫ মিলিয়ন বা ২০.৫ লাখ দিনমজুর, ০.৪ মিলিয়ন বা ৪ লাখ তাঁতি এবং ১.৫ মিলিয়ন বা ১০.৫ লাখ শ্রমজীবী ও নগরবাসী। তাঁর মত অনুসারে আগত শরণার্থীদের ৬০ শতাংশ হিন্দু (সনাতন ধর্মাবলম্বী) ছিল। জাতিসংঘের হিসাব অনুসারে, পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ৭০ শতাংশ গ্রাম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিল (পৃ. ৫-৬)। ভারতীয় সরকারের সূত্রমতে মে, ১৯৭১ ভারত আগত শরণার্থীর সংখ্যা ছিল ৪ লাখ।[২৮] পরবর্তী সময়ে ভারত সরকারের আগস্ট মাসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতে আশ্রিত পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের মধ্যে ৬৯.৭১ লাখ হিন্দু (সনাতন ধর্মাবলম্বী), ৫.৪১ লাখ মুসলিম এবং ০.৪৪ লাখ অন্যান্য।[২৯] ইয়াহিয়া খানও *নিউজউইক*কে দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকারে ভারতে পাকিস্তানের ২ মিলিয়ন বা ২০ লাখ শরণার্থী আশ্রিত আছে বলে স্বীকার করেন।[৩০] কল্যাণ চৌধুরীর বক্তব্য অনুযায়ী, ১০ মিলিয়ন বা ১ কোটি মানুষ পরবাসী শরণার্থী হলেও ৬০ মিলিয়ন বা ৬ কোটি মানুষ দেশের অভ্যন্তরে অনিশ্চয়তার মধ্যে বসবাস করছিল (পৃ. ৬)।

বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার এক মিলিয়ন বা ১০ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে বলে দ্য *টাইমস*, দ্য *গার্ডিয়ান* এবং *লা মন্ড*-এর মতো বিভিন্ন বৈদেশিক পত্রপত্রিকায়

উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও জানুয়ারি ১৯৭২ প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়ার নন্দিত পত্রিকা *প্রাভদয়* প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের সময়ে নিহতের সংখ্যা ৩০ লাখ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ বাঙালি শহীদ হয়েছেন এবং ২ লাখ নারী তাঁদের সম্ভ্রম হারিয়েছেন বলে ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ সরকারের সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী ৩০ লাখ মানুষ নিহত হয়েছে এবং প্রায় ৪০ লাখ আহত হয়েছেন। স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে সরকারি ও বেসরকারি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বাড়ি-বাড়ি গিয়ে শুমারির মাধ্যমে হতাহতের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করার কার্যক্রম শুরু করে। ১২ সদস্যবিশিষ্ট সরকারি তদন্ত কমিটির সভাপতি আবদের রহমান মার্চ, ১৯৭২ অদ্যাবধি সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিহতের সংখ্যা তিন লাখে পৌঁছেছে বলে জানান, 'সংখ্যা এত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে বাংলাদেশ সরকারের ৩০ লাখ নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ ও শিশু হত্যার খসড়া ও প্রাথমিক হিসাব ভিত্তিহীন মনে হচ্ছে না।' বাংলাদেশি সংবাদপত্রগুলোর নিজস্ব গ্রামীণ শুমারি থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও প্রথম প্রতিবেদন অনুসারে, নিহতের সংখ্যা প্রায় ৩ মিলিয়ন বা ৩০ লাখের কাছাকাছি। অবশ্য প্রতিবেদনগুলোতে দাবি করা হয়, মূলত রাজাকাররা বাঙালি মুসলিম ও হিন্দুদের হত্যা করেছে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ভয়ভীতি প্রয়োগ করে অথবা লুণ্ঠনে প্রলুব্ধ করে রাজাকার বাহিনীতে সাম্প্রদায়িক বাঙালি ও অবাঙালিদের অন্তর্ভুক্ত করত, যারা মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তাকারী সন্দেহে মানুষজনকে হত্যা করত। মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক বাহিনী ১ লাখের বেশি এবং মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজাকার, আলবদর ও সাম্প্রদায়িক দলগুলোর সদস্যরা প্রায় ১ মিলিয়ন বা ১০ লাখের বেশি বাঙালিকে হত্যা করেছে বলে ধারণা করা হয় (পৃ. ২২-২৩)। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী তাদের সহযোগী রাজাকার—যাদের ৯০ শতাংশ উর্দুভাষী অবাঙালি—সহযোগে সুসংগঠিত হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করেছিল। উর্দুভাষী অবাঙালিদের অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি অনুগতশীল ছিল। বাঙালিদের বিভিন্ন সময়ের আন্দোলন দমনে এদের পাকিস্তানের সামরিক সরকার চতুরতার সঙ্গে ব্যবহার করত। পাকিস্তান সরকারের এক পরিসংখ্যান অনুসারে, পূর্ব পাকিস্তানের অসহযোগ আন্দোলনে প্রায় ২০ হাজার উর্দুভাষী অবাঙালি নিহত হয়েছিল (পৃ. ৬৯)।

আক্রান্ত গ্রামবাসী ও মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের জবানবন্দি এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ ও নিবন্ধের প্রামাণ্য সাক্ষ্য প্রমাণ করে পাকিস্তানি বাহিনীর 'খুনি-চরিত প্লেগ মহামারির' মতো সমগ্র বাংলাদেশকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করেছিল। হত্যাযজ্ঞের পাশাপাশি লুটতরাজ ছিল খুবই তুচ্ছ ও নৈমিত্তিক ঘটনা। পাকিস্তানি বাহিনী ও

তাদের সহযোগী রাজাকারদের শান্তি কমিটি গ্রামে গ্রামে জনগণের কাছ থেকে ৫-৬ হাজার টাকা অথবা গৃহস্থালি সামগ্রী 'জীবনের কর' হিসাবে আদায় করত। কল্যাণ চৌধুরী সিলেটের দাদাপাড়া, নোয়াখালীর বাঞ্ছনগর, কুমিল্লার আশ্বিনপুরের উদাহরণ দিয়েছেন যে স্থানগুলোতে রাজাকার ও পাকিস্তানি সৈন্যরা ৫-৮ হাজার টাকা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে 'জীবনের কর' হিসাবে আদায় করেছিল। কল্যাণ চৌধুরী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর লুটতরাজের মাত্রা বোঝানোর জন্য বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখিত পাকিস্তানি মেজর জাহানজেব খানের নিকট আত্মীয়ের কাছে ১০ দিনে ৬৫ হাজার টাকা ঝালকাঠি ডাকঘর থেকে মানি অর্ডার, সুবেদার হামিদ খানের গৌরনদী ডাকঘর থেকে ২০ হাজার টাকা মানি অর্ডার এবং বরিশাল জেলার উপডাকঘর থেকে আগস্টের এক সপ্তাহে ২৩৩,৮২০ টাকা মানি অর্ডার করার উদাহরণ দেন। এ এ জে নিয়াজি ও রাও ফরমান আলীর বিরুদ্ধেও লুটের অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে। যার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ্য, ৩১ জানুয়ারি, ১৯৭২ পশ্চিম পাঞ্জাবের সাবেক গভর্নর জেনারেল আতিক রহমানের লাহোরের জমিদারে রাও ফরমান আলীর সম্পত্তির পরিমাণ ৩০ মিলিয়ন, জেনারেল নিয়াজির সম্পত্তি ৮.৭ মিলিয়ন এবং জেনারেল টিক্কা খানের সম্পত্তি ৫.৬ মিলিয়ন বলে দাবি করেন। জেনারেল রহমান আরও অভিযোগ করেন, ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তান থেকে সংগৃহীত ১০০ মিলিয়ন চীন, জেনেভা ও সুইজারল্যান্ডে ব্যক্তিগত ব্যাংকে পাচার করেছে (পৃ. ১৫৪-১৫৫)।

বাংলাদেশের তদন্ত কমিটি পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত বাসভবনে যে পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করে তাতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে তাঁরা পাশবিক ও নৃশংস মানসিকতার চূড়ান্ত শিখরে অবস্থান করছিল। তদন্ত কমিটি পাকিস্তানি সেনাদের শিশু, কিশোরী ও নারীদের শ্লীলতাহানির প্রমাণ নিবন্ধিত করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধারকৃত নির্যাতিতাদের বয়স প্রধানত ১৪ থেকে ৩০ বছর। উদ্ধারকৃতদের অধিকাংশ অবিবাহিত এবং সন্তানসম্ভবা ছিলেন। তাঁদের বেশির ভাগের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে চার হাজারের বেশি বাঙালি নারীকে উদ্ধার করা হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ বাংলদেশি পত্রিকা *সংবাদ*-এ স্থানীয় রাজাকার আলী আজমের সহযোগিতায় পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা ১৬ বছর বয়সী এক কিশোরীর পরিবারের ছয়জনকে হত্যা এবং তার ও তার চার ভাবির শ্লীলতাহানির ঘটনা প্রকাশ করা হয়। কল্যাণ চৌধুরী বাংলাদেশে সংঘটিত অসংখ্য নারীর সম্ভ্রমহানির ঘটনার কিছু সংখ্যক ঘটনা গ্রন্থিত করেছেন। তিনি ৭ অক্টোবর, ১৯৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে মেজর আসলামের নেতৃত্বে পাকিস্তানি সেনারা জোরপূর্বক প্রবেশ করে

অবস্থানরত ৪০ ছাত্রীর সম্ভ্রমহানি করে। ঘটনাটির নৃশংসতার তীব্রতার জন্য পাকিস্তানের ইংরেজি দৈনিক *ডন* সংবাদটি সামরিক বিধি লঙ্ঘন করে প্রকাশ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের পর ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি শিবির থেকে ৩০০ জন নারীকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। বিভিন্ন বয়সের মেয়েদের বিভিন্ন স্থান থেকে জোরপূর্বক ধরে বিবস্ত্র অবস্থায় রাখা হতো, যাতে তারা পালাতে অথবা আত্মহত্যা করতে না পারে এবং সেনাদের পাশবিক শারীরিক নির্যাতনে অনেক মেয়ে নিহত হয়েছে বলে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে উদ্ধারকৃতদের কাছ থেকে জানা যায়। অনুরূপ রায়েরবাজার থেকে অচেতন অবস্থায় ৩০ জন মেয়েকে উদ্ধার করা হয়, যাঁরা পরবর্তী সময়ে নির্যাতনকারী সেনাদের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। অনেক নির্যাতিতা নারী ও তাঁদের পরিবার সামাজিক লাঞ্ছনার ভয়ে ঘটনা ও পরিচয় গোপনে সচেষ্ট ছিলেন। অনেক নারী লজ্জা ও অপমানে আত্মহত্যার পথ গ্রহণ করেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান ২ লাখ নারীর সম্ভ্রমহানির দাবি করেছেন। তবে বাস্তবতার কারণে সম্ভ্রমহানির শিকার নারীদের সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে নিরূপণ করা সহজসাধ্য নয়। ডা. পটস ১ মার্চ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা দশ হাজার নারী তাদের সম্ভ্রম হারিয়েছে এবং তাদের অনেককে পরিশেষে হত্যা করা হয়েছে।' আন্তর্জাতিক রোমান ক্যাথলিক ত্রাণ সংস্থা কারিতাসের মাদার তেরেসাসহ ১০ জন পাদরি ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত চার হাজার নির্যাতিতা নারীকে উদ্ধার করে তাদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন (পৃ. ১৫৯-১৬২)।

জানুয়ারিতে দেশে ফিরে শেখ মুজিবুর রহমান দেশের বিভিন্ন প্রান্তর সফর করে পাকিস্তানিদের ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে দুই শ দেশি-বিদেশি সাংবাদিককে বলেছিলেন, 'পাকিস্তানিরা সমগ্র বাংলাদেশের প্রত্যেকটি গ্রামকে জালিয়ানওয়ালাবাগে পরিণত করেছে।'

মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পর ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে স্থানীয় আওয়ামী লীগ স্থানীয়দের তাদের পরিবারের নিখোঁজ সদস্যদের খোঁজে সহায়তার জন্য শিবির স্থাপন করে। এই শিবিরে শুধু জানুয়ারি মাসেই লিপিবদ্ধ নিখোঁজ ব্যক্তির সংখ্যা ৪০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান কেন্দ্র স্থাপন করে। তাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গড়ে প্রতিদিন কেন্দ্রগুলোতে তিন হাজারের মতো মানুষ তাদের নিখোঁজ স্বজনদের সন্ধানে সারিবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করে। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদসূত্র এবং সংশ্লিষ্ট তদন্ত কমিটির ৩১ মার্চ, ১৯৭২ পর্যন্ত প্রাপ্ত বাংলাদেশের ১৮টি জেলার ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের একটি অসম্পূর্ণ পরিসংখ্যান গ্রন্থে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুসারে, মোট নিহতের

সংখ্যা ১২ লাখ ৪৭ হাজার জন এবং সম্ভ্রমহারা নারীর সংখ্যা ৫৫ হাজার ৬০০ জন ছাড়িয়েছে (পৃ. ১৯৯-২০২)।

কল্যাণ চৌধুরী বাংলাদেশ জেনোসাইড পরিকল্পিত হলো সে প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতানুসারে, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় ইয়াহিয়া খানের পরিকল্পিতভাবে নৃশংস হত্যাকারীর ভূমিকা এবং পাকিস্তানের ভাঙনের কারণ। জেনারেল ইয়াহিয়া ভারতের হস্তক্ষেপের বিষয়ে খুব একটা শঙ্কিত ছিলেন না এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন বিশ্ব সম্প্রদায় ইন্দোনেশিয়া ও সিলনের (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) মতো পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। যদিও জেনারেল তাঁর এবং তাঁর অধীন সামরিক সদস্যদের অপরাধ ধামাচাপা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। সামরিক আক্রমণের ধরন বিশ্লেষণ করলে সহজে অনুধাবন করা যায়, ইয়াহিয়া খানের পরিকল্পনা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করে তাদের ইচ্ছানুযায়ী শাসন-শোষণ করা। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অবাঙালি উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী এবং সাম্প্রদায়িক দলগুলোর সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত আলবদর, আলশামস বাহিনী ধর্মনিরপেক্ষ, বির্নিমাণপন্থী শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী এবং হিন্দু বাঙালিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। মূলত তিনি এই কৌশল গ্রহণ করেছিলেন, কারণ তিনি বাঙালি জাতিনিধনের পাঁয়তারা করছেন—এই অভিযোগ সুনির্দিষ্টভাবে কেউ করতে না পারে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এবং পরবর্তী সময়ে জেনারেল রক্তপিপাসু মানবদৈত্য হিসেবে পরিচিতি পান। তিনি রাজাকার ও আলবদরের মতো আধাসামরিক মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করেছিলেন কিন্তু এই বাহিনীর কর্মকাণ্ডের ওপর তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ফলে এই মিলিশিয়া বাহিনীর সদস্যরা যথেচ্ছ হত্যা, লুট, সম্ভ্রমহানির মতো অপরাধ বিনা বাধায় সম্পাদন করেছে (পৃ. ৭)।

অভিযুক্ত পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তা ও তাদের দোসরদের যুদ্ধাপরাধ ও জেনোসাইডের জন্য বিচারের জন্য জেনোসাইড অপরাধ বলতে কী বোঝানো হচ্ছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থকারের মতে, জেনোসাইড প্রত্যয়টি আন্তর্জাতিক আইনে সাম্প্রতিক হলেও মানব ইতিহাসে জেনোসাইডের ইতিহাস প্রাচীন। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে আইনজ্ঞ রাফায়েল ল্যামকিন প্রথম এই প্রত্যয় ব্যবহার করেন। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ আয়োজিত জেনোসাইড-বিষয়ক সম্মেলনে তৎকালীন বিদগ্ধ আইনজ্ঞরা জেনোসাইডের একটি সর্বজনীন সংজ্ঞা প্রদান করেন—এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, জেনোসাইড বলতে কোনো জাতিগত, নৃতাত্ত্বিক, বর্ণগত অথবা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করার প্রবৃত্তি হতে সম্পাদিত নিম্নে বর্ণিত যেকোনো কর্মকাণ্ডকে নির্দেশ করা হবে—

ক. জাতি বা গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা করা।
খ. জাতি বা গোষ্ঠীর সদস্যদের মারাত্মক শারীরিক বা মানসিক ক্ষতিসাধন।
গ. উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোনো গোষ্ঠীকে সমূলে বা আংশিকভাবে নিধনের জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাপ্রসূত আরোপিত ব্যবস্থাপনা।
ঘ. জাতি বা গোষ্ঠীর বংশগতি রোধে আরোপিত ব্যবস্থাপনা।
ঙ. জোরপূর্বক কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর শিশুদের অন্য জাতি বা গোষ্ঠীতে স্থানান্তর।

এই সম্মেলনের গৃহীত ঘোষণার প্রথম অনুচ্ছেদ অনুসারে, যুদ্ধাবস্থায় বা শান্তিকালীন যেকোনো সময়ে সংঘটিত জেনোসাইড শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং চতুর্থ অনুচ্ছেদ দ্বারা শাসনতান্ত্রিক প্রধান, সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা হয়েছে। জেনোসাইড সম্বন্ধীয় দুটি বিষয় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। প্রথমত, জেনোসাইড সংঘটনে রাষ্ট্রীয় প্রধানের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ জরুরি নয় যদি তাঁর অধীনদের সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়। অধীনদের দ্বারা যদি জেনোসাইড অপরাধ সংঘটিত হয় তবে তাদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা ও অপরাধের জন্য সরকারপ্রধানও সমভাবে দায়ী। ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল ও ভিয়েতনামের মে লাই গণহত্যার ক্ষেত্রে মার্কিন ও ব্রিটিশ আইনজ্ঞরা সন্দেহাতীতভাবে এ অবস্থান গ্রহণ করেছেন। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে বাংলাদেশ জেনোসাইডের ক্ষেত্রে তাঁরা সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেছেন। ব্রিটিশদের যুক্তি ছিল, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়তো পরিস্থিতি আরও নাজুক করে তুলতে পারে, যদিও সেই সম্ভাবনা ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল ও পরবর্তী সময়ে আইকম্যানের বিচারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য (পৃ. ২০৩-২০৪)।

আন্তর্জাতিক আইনে জেনোসাইডের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কোনো জাতি বা গোষ্ঠীকে অসার ও দুর্বল করার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সংগঠিত রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টা। বাংলাদেশ জেনোসাইডে এই বৈশিষ্ট্য প্রামাণ্য সাক্ষ্যসহ সুস্পষ্ট। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সংগঠিত জেনোসাইডের পরিকল্পনায় সুস্পষ্টভাবে বাঙালি সমাজের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীদের বৃহত্তর অংশকে হত্যা ও গুমের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে অর্ধশিক্ষিত প্রতিবন্ধীতে পরিণত করার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হীন প্রচেষ্টা ছিল (পৃ. ২০৩-২০৪)। বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধের অন্তিমলগ্নে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী আলবদর ও আলশামস পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে সমূলে নিশ্চিহ্ন করতে গোপন হত্যাযজ্ঞ ও গুম পরিচালনা করে (পৃ. ২০৮)।

জাতিসংঘের জেনোসাইড-সম্পর্কিত ঘোষণায় 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' প্রত্যয়ের মাধ্যমে যুদ্ধে সাধারণ হতাহতের সঙ্গে জেনোসাইডের পার্থক্য সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

১৯৪৮ সালের জাতিসংঘ ঘোষণার অনুচ্ছেদ দুইয়ে জেনোসাইডকে 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' প্রত্যয়যোগে সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে হিটলারের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদি নিধনের ঘটনা উল্লেখ করা যায়। হিটলার ইহুদিদের তাদের কোনো প্রমাণিত অপরাধ নয় বরং তারা 'ইহুদি' বিধায় তাদের হত্যা করেছিলেন। জাঁ পল সার্ত্রে হিটলারের ইহুদি নিধনের উদাহরণটি ডেনমার্কে আন্তর্জাতিক আদালতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম জেনোসাইড মামলায় প্রামাণ্য উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন (পৃ. ২০৫)। পাকিস্তান সামরিক সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধকরণ জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণার পঞ্চম অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর আগ্রাসী আক্রমণ ও নৃশংসতা ১৯৪৮ সালের জেনোসাইড-বিষয়ক ঘোষণার অনুচ্ছেদ ২-এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন (পৃ. ২১০)।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তানের সামরিক সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারে। প্রথমত, বেসামরিক বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের (পাঞ্জাবি, বেলুচ, পাঠান) অমানবিক আচরণ; পাকিস্তান বিমানবাহিনীর পলায়নরত সাধারণ মানুষের ওপর নির্বিচার আক্রমণ; তালিকানুসারে রাজনৈতিক নেতা, প্রশাসক, শিক্ষক, বাঙালি সামরিক ও পুলিশ সদস্য, বিশেষজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যা; অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য অবকাঠামো ধ্বংস; নারী ও শিশুদের সঙ্গে পাশবিক আচরণ; সংখ্যালঘুদের নিধন-নিপীড়নে প্রতিক্রিয়াশীল ও অপরাধীদের ব্যবহার এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি (পৃ. ২০৫-২০৬)।

কল্যাণ চৌধুরী তাঁর গ্রন্থের শেষাংশে অভিযোগগুলোর নমুনা প্রমাণের জন্য দ্য *নিউইয়র্ক টাইমস*, *গ্লোব অব রিও ডি জেনিরো*, *দ্য সান*, দ্য *সানডে অস্ট্রেলিয়ান*, *ওয়াশিংটন ডেইলি নিউজ*, *মর্নিং স্টার*, *টাইমস*, ফরাসি পত্রিকা *লা মন্ড*, দ্য *শিকাগো সান টাইমস* এবং *ফার ইস্টার্ন রিভিউ*-এ প্রকাশিত বাংলাদেশ জেনোসাইডের অংশবিশেষ উপস্থাপন করেছেন (পৃ. ২০৬-২০৭)। যেকোনো জেনোসাইড ও গণহত্যায় প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য ব্যাপৃতভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং বাঙালিদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীল সহযোগীদের বিরুদ্ধেও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য ও বর্ণনা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে ব্যবহারের দাবিদার (পৃ. ২০৯)। অবশ্য পরবর্তী সময়ে রচিত ১৯৭১ শীর্ষক বিভিন্ন গ্রন্থে কল্যাণ চৌধুরীর যৌক্তিক প্রত্যাশার অস্বীকৃতি লক্ষণীয়ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। বিশেষত উল্লেখ্য, শর্মিলা

বসুর *ডেড রেকনিং : মেমোরিস অব দ্য ১৯৭১ বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়্যার*। অন্যদিকে স্থানীয় জনশ্রুতিও সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচনার যোগ্যতা রাখে। বিশেষত, কল্যাণ চৌধুরী বিমান হামলার দায় ও হতাহতের বিতর্কের যে উদাহরণ দিয়েছেন (পৃ. ২০৯) সে ক্ষেত্রে জনশ্রুতি সাক্ষ্য বাস্তবসম্মত প্রামাণ্য সাক্ষ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

সীমান্তবর্তী অঞ্চলের উদ্দেশে সড়ক ও নৌপথে পলায়নরত শরণার্থীদের ওপর হামলা, গ্রামের পর গ্রামে অগ্নিসংযোগ, বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে ট্যাংকের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং সারিবদ্ধ করে হত্যা করার দৃশ্য সাধারণ মানুষসহ অনেক বিদেশি সাংবাদিক ও ত্রাণকর্মীও প্রত্যক্ষ করেছেন (পৃ. ২০৯)। পাকিস্তান বাহিনীর আগ্রাসনের মতো সামরিক আক্রমণে সব হত্যা জনসম্মুখেই হবে অথবা প্রত্যক্ষদর্শীর উপস্থিতি ছাড়া হত্যা, ধর্ষণ, লুট ও অগ্নিসংযোগ করা হবে না এবং দায়িত্বশীলতার সঙ্গে আগ্রাসী সেনারা মৃতদেহগুলো যথাযথভাবে সৎকার এবং আহত ব্যক্তিদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করবে—এ ধরনের যুক্তির অবতারণা বাংলাদেশ জেনোসাইডের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অস্বীকৃতি প্রমাণের জন্য ব্যবহার করতে দেখা যায়। এই ধরনের যুক্তিকে বরং অতিরঞ্জনের সর্বোচ্চ ব্যবহার আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

কল্যাণ চৌধুরী পরিশেষে বলেছেন, জাতিসংঘ নীরব (বাংলাদেশ জেনোসাইড ইস্যুতে) তবে জাতিসংঘের উচিত হবে না যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে বাধা প্রদান। জাতিসংঘের জেনোসাইড-সংক্রান্ত ঘোষণার অনুচ্ছেদ ছয় অনুসারে কোনো রাষ্ট্র স্বভূখণ্ডে নিজস্ব আদালত অথবা আন্তর্জাতিক আদালতে জেনোসাইডের জন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিচারের অধিকার রাখে (পৃ. ২১৬)। বাংলাদেশ এই এখতিয়ার ও সাংবিধানিক আইনের ভিত্তিতে পাকিস্তানের বাংলাদেশীয় সেসব সহযোগীর বিচার কার্যক্রম শুরু করেছে, যারা ১৯৭১ সালে যুদ্ধাপরাধ ও জেনোসাইড সংঘটনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। হয়তো বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের প্রশ্নে আন্তর্জাতিক আইনানুসারে এবং জাতিসংঘ প্রদত্ত এখতিয়ারবলে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। তবে তথাগত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণকারীদের জন্য এই বিচারপ্রক্রিয়া যত দ্রুত হওয়া কাম্য, কারণ সময়ের পরিক্রমায় প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকেই অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের গ্রন্থিত বিবরণী ও জনশ্রুতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য সাক্ষ্য হয়ে উঠবে। ফলে অভিযুক্ত অপরাধীর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ সংকুচিত হবে। আইনের বহুল প্রচলিত বেদবাক্যগুলোর একটি 'বিচারে বিলম্ব বিচারের বস্তুনিষ্ঠতা ম্লান করে'। এই প্রবাদে নিশ্চয়ই তথাগত দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারীরা বিশ্বাস করেন। তাঁরা নিশ্চয়ই চাইবেন না তথাগত দৃষ্টিভঙ্গিতে আপেক্ষিক প্রামাণ্য

সাক্ষ্য মুখ্য নিয়ামক হয়ে উঠুক। পর্যালোচনার পরিসমাপ্তিতে কিছু প্রশ্নের অবতারণা করা প্রয়োজন : যে যুদ্ধে ট্যাংক, যুদ্ধবিমান, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবহার করা হয় সে যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা নিম্নগামী হওয়া কীভাবে সম্ভব? বিশ্ব ইতিহাসে এমন নজির বিরল যেখানে শরণার্থীদের রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদায় আশ্রিত ও সেবা প্রদান করা হয়েছে। বিশাল শরণার্থীদের স্রোত দুটি বিষয় নিশ্চিত করে—যে কার্যকারণে তারা শরণার্থী তাতে অনেকের মৃত্যু হয়েছে এবং তাদের অগস্ত্যযাত্রায় অনেকেই প্রাণ হারিয়েছেন এবং মানবিক বিপর্যয়ের কারণে প্রাণ হারাবেন। শরণার্থীদের অনিশ্চয়তার যাত্রায় এবং আশ্রয়কেন্দ্রে মানবিক সাহায্যের অপর্যাপ্ততা হেতু মৃত্যুগুলো কি জেনোসাইডভুক্ত হত্যাকাণ্ড নয়, যেখানে জেনোসাইডের সংজ্ঞায়নে উল্লেখ করা হয়েছে কোনো জাতি বা গোষ্ঠীকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করার ব্যবস্থাপনাও অন্তর্ভুক্ত। জীবনের মায়ায় কোনো নারী যদি তাঁর সম্ভ্রমহানির চেষ্টাকে প্রতিরোধ না করেন তবে কি তাঁর সম্ভ্রমহানি স্বীকৃত হবে না? ১৯৭১ থেকে ২০১৬ অনেক সময়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর পাকিস্তানি বাহিনীর বদৌলতে অর্ধশিক্ষিত বাঙালি জাতিতে পরিণত হওয়া দেশটির শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বর্তমানে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১ সালের অর্ধশিক্ষিত প্রত্যক্ষদর্শীরা স্বভাবতই সংখ্যাতত্ত্ব বা আইনের যুক্তি অপেক্ষা লোমহর্ষক স্মৃতির আবেগী রোমন্থন করবেন এবং হয়তো তাঁর অভিজ্ঞতার নাটকীয় বর্ণনা দেবেন। তাঁদের এই বর্ণনা আবেগাশ্রিত হলেও অস্বীকার করার অবকাশ যৌক্তিক বিচারে আছে বলে মনে হয় না।

তথ্যসূত্র :

১. দেখুন, Jahan, Rounaq. "Genocide in Bangladesh." In "*Century of Genocide"*, by Samuel Totten and William S.Parsons, New York And London: Routledge, 2009. P. 245.

২. দেখুন, প্রাগুক্ত।

৩. দেখুন, Cousins, Norman. "Genocide in East Pakistan." *Saturday Review*, May 22, 1971: 20-21.

৪. দেখুন, Mascarenhas, Anthony. "Genocide." *The Sunday Times*, June 13, 1971: 01.

৫. দেখুন, Editorial. "The Victims." *The Sunday Telegraph*, March 28, 1971: 20.

৬. দেখুন, Rummel, R J. "*Death by Government"*. New Brunswick and London: Transaction Publishers, 1994.

৭. দেখুন, Rummel, R J. প্রাগুক্ত। P. 315.

৮. দেখুন, Rummel, R J. "*Statistics of Democide: Genocide and Mass Murder since 1900"*. Charlottesville: Transaction Publishers, 1997.

৯. দেখুন, K. Subrahmanyam and Mohammed Ayoob. "*The Liberation War*", New Delhi: S. Chand & Co. (Pvt.) Ltd., 1972. P. 31.

১০. দেখুন, Khalid B. Sayeed, "The Political System of Pakistan", Boston: 1967, P. 156.

১১. দেখুন, Islam, Rafiqul. "A Tale of Millions: Bangladesh Liberation War-1971", Dhaka: ABCO Press Ltd., 1971. Pp. 9-10.

১২. দেখুন, Payne, Robert. *"Massacre: The Tragedy of Bangladesh and the Phenomenon of Mass Slaughter Throughout History"*. New York: The Macmillan Company, 1973. P. 50.

১৩. দেখুন, Rummel, R J. প্রাগুক্ত। P. 331.

১৪. দেখুন, সম্পাদকীয়, "ইয়াহিয়ার ফাঁসি চাই", দৈনিক পূর্বদেশ, ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১ এবং "Over 30 Lakh Killed by Pak Force*",* The Morning News, January 5, 1972.

১৫. দেখুন, Rummel, R J. প্রাগুক্ত। P. 316.

১৬. দেখুন, Salik, Siddique. "Witness to Surrender". Dhaka: UPL, 1997.

১৭. দেখুন, Rummel, R J. প্রাগুক্ত। P. 319.

১৮. দেখুন, Rummel, R J. প্রাগুক্ত। P. 320.

১৯. দেখুন, Lickttenstein, Grace. "Armey Expels 35 Foreign Newsmen from Pakistan", The New York Times, March 28, 1971.

২০. দেখুন, Hazelhurst, Peter. "Cholera Outbreak Reported:India Puts Pakistani Refugees at 4 Million". International Herald Tribune, May 31, 1971.

২১. দেখুন, Hasanat, Abul. "The Ugliest Genocide in History", Dhaka: Muktodhara, 1974. Pp. 26-34.

২২. দেখুন, Payne, Robert. প্রাগুক্ত। P. 18.

২৩. দেখুন, Rummel, R J. প্রাগুক্ত। P. 321.

২৪. দেখুন, Rummel, R J. প্রাগুক্ত। P. 322.

২৫. দেখুন, Rummel, R J. প্রাগুক্ত। P. 320.

২৬. দেখুন, Rummel, R J. প্রাগুক্ত। P. 322.

২৭. দেখুন, Rummel, R J. প্রাগুক্ত। P. 323.

২৮. দেখুন, Government of India, Minisitry of External Affairs, Bangla Desh Documents, P. 446. August 16, 1971.

২৯. দেখুন, Yahya's interview to Arnaud de Borchgrave of The News Week in International Herald Tribune, November 1, 1971. Yahya's broadcast of June 28,1971, reproduced in Institute for Defence Studies & Analysis-News Review on Pak.6/71

৩০. দেখুন, K. Subrahmanyam and Mohammed Ayoob. প্রাগুক্ত। P. 166.

খাতি চিন্তা
বই আলোচনা

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংঘাতের ইতিবৃত্ত

গোলাম মুস্তাফা

সংঘাতময় বাংলাদেশ : অতীত থেকে বর্তমান—
বদরুল আলম খান, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৫

'আওয়ামী লীগ একমাত্র বিরোধী দল। তাকে বাধাহীনভাবে রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার অধিকার দিতে হবে। কারণ, বিরোধী দল ছাড়া কোনো গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না'—এই উক্তিটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের।[১] বঙ্গবন্ধু ১৯৫২ সালের মে মাসে তৎকালীন পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের সঙ্গে করাচি শহরে অনুষ্ঠিত এক কথোপকথনে এই দাবি জানিয়েছিলেন। প্রবন্ধের শুরুতে এই উক্তি উদ্ধৃত করার কারণ হচ্ছে, বিরোধী দলগুলোর কর্মকাণ্ডের বিষয়ে এই উক্তিটি ১৯৫২ সালে যেমন যথাযথ ছিল, ২০১৬ সালেও তা একইভাবে প্রযোজ্য। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০-দলীয় জোটের একের পর এক গণবিরোধী পদক্ষেপে জনগণের মনোভাব ক্রমে সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি বিষিয়ে উঠছে। ৫ জানুয়ারি, ২০১৪ সালের বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সম্মুখীন হয় বৈধতার সংকটে এবং এটাকে ইস্যু বানিয়ে ২০-দলীয় জোট শুরু করে রাজনীতির নামে জনগণের জানমাল ধ্বংস। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্য অনুসারে ১৮ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত হরতাল-অবরোধে পেট্রলবোমা এবং আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যান ৩৭ জন। আসকের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামালের মতে, 'এ যেন লাগামহীন ভয়ের রাজত্ব'।[২]

জাতীয় রাজনীতির এই সংকটকালে প্রকাশিত হয়েছে ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনির অধ্যাপক, সমাজতাত্ত্বিক বদরুল আলম খানের *'সংঘাতময় বাংলাদেশ, অতীত থেকে বর্তমান'* গ্রন্থটি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে দ্বন্দ্বের

উৎসমুখগুলো চিহ্নিত করার পাশাপাশি সর্বশেষ অধ্যায়ে লেখক এই সমস্যাগুলোর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথ বাতলে দিয়েছেন। গ্রন্থটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, এটিতে তথ্যের সাথে সাথে সমাজতাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের ইতিহাসের নানা দিকের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গ্রন্থে লেখকের মূল থিসিস হচ্ছে: 'সংঘাত-মানসিকতা বাঙালির আত্মপরিচয়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রূপ ধর্মীয় হবে নাকি ধর্মনিরপেক্ষ হবে...আত্মপরিচয়ের সাথে যুক্ত সেই সব প্রশ্ন আজও অদ্ভুতভাবে অমীমাংসিত রয়ে গেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক শক্তি রাষ্ট্রকে তাদের নিজের মতো করে সংজ্ঞায়িত করতে চায়।...দ্বৈত পরিচয়ের কলহে একটি আধুনিক রাষ্ট্র নির্মাণের কর্মসূচি এখানে হয় নিষ্ক্রিয়, নয়তো পদে পদে তা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। অথচ দুই সামাজিক শক্তির দ্বন্দ্ব অন্তর্গতভাবে অথবা প্রকাশ্য রূপ নিয়ে সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে চলেছে। সেই আত্মপরিচয়গত সংঘাতই দেশটির রাজনীতির প্রধান উত্তেজক' (পৃ. ১৫)। এই থিসিসকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক সংঘাতের পাঁচটি উৎসমুখ চিহ্নিত করেছেন: ক. প্রকৃতি ও বিশ্বাসের জগতে দ্বন্দ্ব; এটিকে লেখক আদি ইসলামের সঙ্গে রাজনৈতিক ও লোকপ্রিয় ইসলামের দ্বন্দ্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, খ. আত্মপরিচয়ের দ্বন্দ্ব, যা জাতীয়তাবাদকেন্দ্রিক, গ. রাষ্ট্রকাঠামো এবং গণতান্ত্রিকায়নের দ্বন্দ্ব, ঘ. ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির দ্বন্দ্ব, যেখানে লেখক মুজিব-জিয়া এবং শেখ হাসিনা-খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক অবয়বের তুলনা এবং ব্যাখ্যা করেছেন এবং ঙ. গ্রাম ও শহরের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, এ অংশে গ্রাম ও শহরের মধ্যে পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা ও ব্যর্থতার সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রয়েছে।

বাঙালি কেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল?

এই অঞ্চলের মানুষদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পেছনে অন্য লেখক ও গবেষকেরা তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন: ক. শক্তি প্রয়োগ বা তরবারির ব্যবহার, খ. বর্ণবৈষম্যের কারণে ইসলামের সমতার নীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং বাড়তি সুযোগ-সুবিধা ও প্রলোভনের কারণে এবং গ. আরব ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিপুলসংখ্যক মানুষের পূর্ব বাংলায় আগমন এবং বসতি স্থাপন। লেখক এই তিনটি দাবির সব কটিকেই নাকচ করে দিয়েছেন। শাসকরূপী মুসলিমরা ভারতীয় উপমহাদেশে যেহেতু উত্তর-ভারত দিয়ে প্রবেশ করেছিল, সেহেতু জোর প্রয়োগ যদি ধর্মান্তরকরণের মূল কৌশল হয়ে থাকত, তাহলে পাঞ্জাব বা দিল্লিতেই বেশি মুসলমান থাকার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তব চিত্র তার থেকে ভিন্ন। ফলে লেখক শক্তি প্রয়োগে ধর্মান্তরকরণ তত্ত্বটি নাকচ করে দিয়েছেন, অন্তত বাংলার এই অংশের

ক্ষেত্রে তা শতভাগ সত্য। একইভাবে লেখক আগত মুসলমানদের স্থানান্তর এবং বসতি স্থাপনের উপপাদ্যটিও ভুল প্রমাণিত করেছেন। লেখক নানা তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরে দেখিয়েছেন, ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় তৎকালীন পূর্ববঙ্গ এবং আজকের বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব কতটা কম ছিল। এর দ্বারা তিনি বর্ণবৈষম্যের কারণেই যে এই অঞ্চলে হিন্দু ও বৌদ্ধরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, এই দাবির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন। লেখকের মতে, ইসলামের সমন্বয়বাদী ধারাটিই মূলত সাধারণ গ্রামীণ মানুষকে আকর্ষণ করেছিল। এ ক্ষেত্রে সুফিবাদের প্রভাব ও সাফল্যের কথা লেখক বেশ যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করেছেন।

বাংলায় সুফিবাদের দীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যাবে এই বইতে। এই ক্ষেত্রে লেখক আশ্রয় নিয়েছেন রিচার্ড ইটনের *The Rise of Islam and The Bengal Frontier, 1204-1760 (১৯৯৩)* বইয়ের। সুফিবাদের গ্রহণযোগ্যতার অন্যতম কারণ ছিল তাদের জীবনঘনিষ্ঠ জীবনাচরণ এবং কৃষক সমাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারা। অন্যদিকে সুফিবাদের সঙ্গে বৈষ্ণব এবং শ্রমণদের আন্তযোগাযোগের মাধ্যমে একধরনের সাম্প্রদায়িক সহাবস্থান তৈরি হয়েছিল। বাংলার এই অংশের ইসলামকে লেখক নাম দিয়েছেন 'বাঙালি ইসলাম'। এই ইসলাম বস্তুতান্ত্রিক এবং জীবনমুখী, যা নিম্নবর্ণের এবং লৌকিক ধর্মের অনুসারীদের সহজেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তবে কালের প্রবাহে এই সমন্বয়বাদী ইসলামের জায়গা দখল করে নেয় গোঁড়া ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। এর কারণ হিসেবে লেখক দেখেছেন বাজার অর্থনীতির বিকাশকে। বাজার অর্থনীতির বিকাশের কারণে সুফিদের সঙ্গে সমাজের এলিটদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়, ফলে সুফিরা মৌলবাদীদের আক্রমণের শিকারে পরিণত হওয়া শুরু করে। লেখকের ভাষায়, '...সুফিসাধকদের সম্পৃক্ততার ধরনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় গড়ে উঠতে থাকে। জনকল্যাণের চেয়ে সেখানে ব্যক্তিমাহাত্ম্য প্রাধান্য পায়। সুফি দরগাগুলো অর্থ, সম্মান, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার কেন্দ্রে পরিণত হতে থাকে। সমাজের এলিট শ্রেণি বা ক্ষমতাবানদের সঙ্গে সুফি-দরবেশদের আঁতাত 'বাঙালি ইসলামে'র অভ্যন্তরীণ বাঁধনকে ঢিলেঢালা করে ফেলে' (পৃ. ৬২)। এটাকেই লেখক 'বাঙালি ইসলামের সংকটকালের শুরু' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু থেকেই হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ এবং ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থানের উন্নয়ন করে। বাস্তবিক অর্থে সে রকম কোনো সুবিধা না পেলেও, মোগলদের হাত থেকে শাসনক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে যাওয়াকে মুসলিমরা নিজেদের পতন হিসেবে দেখা শুরু করে। ফলে ইংরেজ শাসনের শুরু থেকেই কোম্পানির শাসকেরা এবং মুসলিমরা একে অপরকে সন্দেহের চোখে

দেখা শুরু করে। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশদের 'ভাগ করো, শাসন করো' নীতি এবং মুসলিম নানা সংস্কারের কারণে ব্রিটিশদের সঙ্গে মুসলমানদের দূরত্ব কমে এলেও, তার পরিবর্তে জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিষবাষ্প। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর রাষ্ট্রে হিন্দুদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাবে—এই আশঙ্কায় মুসলিমরা আরও বেশিভাবে ধর্মীয় প্রতীকের ব্যবহারের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তা কোনোভাবেই তাদের ধার্মিকতা বৃদ্ধি করেছে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ধর্ম পালন এবং ধর্মীয় চিহ্নের ব্যবহারের এই বৈপরীত্য এখনো আমাদের সমাজে বহুলাংশে পরিলক্ষিত হয়। ভারত ভাগ-পূর্ব রাজনৈতিকীকরণের যে প্রলম্বিত চক্রে ইসলাম ধর্ম আটকে পড়ে, তার প্রতিক্রিয়াতেই ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক বৈরী রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

শহুরে এবং গ্রামীণ চেতনার সমন্বয়/আত্মপরিচয়ের দ্বন্দ্ব : জাতি বনাম ধর্ম

স্বাধীনতার ৪৫ বছর পরও আমাদের জাতীয় পরিচয় 'বাংলাদেশি' হবে, না 'বাঙালি' হবে কিংবা জাতীয়তাবাদ 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' হবে, না 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' হবে তা নিয়ে বিতর্ক চলছে। অনেক ক্ষেত্রে এসব বিতর্ক নিছক বিতর্কের বাইরে গিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণের পর্যায়ে চলে যায়। এসব বিতর্ক থেকে জাতীয় সংসদও মুক্ত নয়।[৩] পরিচয়ের এই দ্বন্দ্বে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে 'ধর্মের গুরুত্ব'। প্রচলিত ইউরোপীয় ধারণা অনুসারে কতিপয় বাম দল ছাড়া বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলই 'সেক্যুলার' না। প্রায় সব রাজনৈতিক দলই কোনো না কোনোভাবে রাজনীতির ময়দানে ধর্মকে ব্যবহার করেছে এবং করছে। তবে ঐতিহাসিক কারণেই প্রকাশ্য ধর্মীয় দলগুলো ছাড়া মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষত আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের বিষয়টি প্রকাশ্যে স্বীকার করে না। এর একটি কারণ হতে পারে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন গণহত্যা বৈধকরণে ধর্মের ব্যবহার। তবে যখন আত্মপরিচয়ের বিতর্ক দেখা দেয়, তখন আওয়ামী লীগ নিজেকে তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' দল হিসেবে প্রচার করে। অন্যদিকে, বিএনপি তার রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং প্রচার-প্রচারণায় বারবার ধর্মের দোহাই দেয়। লেখকের মতে, আত্মপরিচয়ের দ্বন্দ্বে এই বিতর্ক থাকলেও, এই দুই পরিচয়ের কোনোটির ভিতই বাংলাদেশে শক্তিশালী হয়নি। কিন্তু মাঝে মাঝে ক্ষমতাসীন দলের পৃষ্ঠপোষকতায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই দ্বন্দ্বের ভারসাম্য বদলেছে। সবশেষ শাহবাগ আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তির এক ধরনের উত্থান লক্ষ করেছি। যদিও নানা আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণে তা দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভে ব্যর্থ হয়েছে।

ঐতিহাসিকভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ তিনটি ধাপ অতিক্রম করেছে বলে লেখকের অভিমত। প্রথম ধাপে, ভারতীয় উপমহাদেশে যখন ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্ব চলছে, তখন ঐতিহাসিক কারণেই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এর ভিত্তিতেই ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। যদিও এর মধ্যেই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শরৎ বসুর নেতৃত্বে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল, যার মূল ভিত্তি ছিল বাংলা ভাষা এবং জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাঙালিদের জন্য একটি পৃথক জাতিরাষ্ট্র। এই আন্দোলনের ব্যর্থতা বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম উত্থান প্রয়াসকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়। দ্বিতীয় ধাপকে লেখক বাঙালি জাতীয়তাবাদের সফলতার আখ্যান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই পর্যায়ে দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময়ের পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদ জেগে ওঠে এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জাতীয়তাবাদী এই ধারার পূর্ণতা লাভ করতে দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় প্রয়োজন হলেও তার অঙ্কুর জন্ম নিয়েছিল ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এবং সময়ের পটপরিবর্তনে তা ক্রমশ ধর্মনিরপেক্ষ রূপ ধারণ করে।

তৃতীয় ধাপকে লেখক বাঙালি জাতীয়তাবাদের সংকটকাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড এবং পরবর্তী সময়ে জিয়া ও এরশাদের শাসনামলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ তার মূল ভিত্তি থেকে দূরে সরে যায় বা বলা যায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থলে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদকে স্থাপন করা হয়। এই পরিবর্তনের মূল কান্ডারি জিয়া এবং এরশাদ সরকার, তবে পরোক্ষভাবে হলেও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারকে এর দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া যায় না। স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যাত্রা কেন ব্যর্থ হলো, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ যে আধুনিক সমাজের অঙ্গীকার করেছিল, তা গড়ার প্রক্রিয়াকে বেশি দূর এগিয়ে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর এখানেই তার মৌলিক ব্যর্থতা' (পৃ. ৯৮)। তবে পরিচয়ের প্রশ্নে একজন ব্যক্তি একই সঙ্গে বাঙালি এবং মুসলিম পরিচয়কে আঁকড়ে ধরে পরিচিত হতে পারেন কি না, সে প্রশ্ন এখানে বরাবরই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এটি বাঙালি বুর্জোয়ার ব্যর্থতা। লেখকের মতে, 'বাঙালি বুর্জোয়ার এই ব্যর্থতার কারণে ধর্ম ও জাতিপরিচয়কে এ দেশে একে অপরের বিপরীত মেরুতে স্থাপন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই টানাপোড়েনের উগ্রতা একদিকে যেমন জাতিপরিচয়কে বিসর্জন দিতে চায়, তেমনি অন্যদিকে আধুনিক সমাজ নির্মাণভাবনা ধর্মপরিচয়কে উপেক্ষা করে

এগোতে চায়। এভাবে জাতিপরিচয় ও ধর্মপরিচয় পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়' (পৃ. ১০৬)। লেখকের মতে, অসম্প্রদায়িক ও আধুনিক সমাজ গড়ে তোলা যদি বাংলাদেশের লক্ষ্য হয়, তবে কোনো মধ্যপথ খুঁজতে হবে। কিন্তু মধ্যপথে ইসলামের ভূমিকা কী হবে এবং এই ইসলাম ধর্মনিরপেক্ষ বা সোজা কথায় অবিশ্বাসীদের (অ্যাথিইস্ট) কীভাবে মূল্যায়ন করবে সে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই গেল।

অন্যদিকে জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে শহুরে চেতনার সঙ্গে গ্রামের মানুষের চেতনাগত পার্থক্য ঘুচল কীভাবে বা তার যোগসূত্র কী ছিল, তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমালোচকদের তোলা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন লেখক। এ ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্লেষণ ইতিহাস এবং লোকসাহিত্যকেন্দ্রিক। লেখকের যুক্তি, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী শহরের তুলনায় পিছিয়ে থাকলেও, মানসিকভাবে গ্রামের মানুষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন নানা চিহ্নের মাধ্যমে। ভাষার জন্য ঢাকার রাজপথে ছাত্ররা প্রাণ দিয়েছেন, এই আত্মদান গ্রামের মানুষের মনে নাড়া দিয়েছিল প্রবলভাবে। লেখকের মতে, পলাশীর যুদ্ধ এবং কারবালার যুদ্ধের স্মৃতি তাদের মনে একটি ক্ষত তৈরি করেছিল। সেই ক্ষতে নতুন খোঁচা দেন ১৯৫২-এর ভাষাশহীদেরা এবং তা কাজ করে একধরনের পরোক্ষ জাতীয়তাবাদী উত্থানের।

অন্যদিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের দ্বিতীয় উপাদান 'সোনার বাংলা'র চেতনা পরিপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদানে। 'গোলা ভরা ধান আর পুকুর ভরা মাছে'র মতো আপ্তবাক্য বাঙালির মননে ভর করেছে। ঐতিহাসিক হারানোর বেদনা, যা শুরু হয়েছিল পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর এবং পুনরায় সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাকে আরেকবার জাতীয়তাবাদী চেতনায় চাঙা করে তোলে। লেখকের মতে, সোনার বাংলার প্রশ্নে মাত্রাতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ হয়েছিলেন স্বাধীনতা-উত্তর নেতৃত্ব। কিন্তু বাস্তবতার বন্ধুর পথে চলতে গেলে যে বাধাগুলো সামনে আসতে পারে বা এসেছিল, তার বাস্তবিক বা তাত্ত্বিক কোনো যোগ-বিয়োগ নিয়ে সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টারা ভাবেননি। এ ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এবং তা ঘিরে যে সংঘাতময় রাজনীতির উত্থান, সেই উদাহরণটি লেখক টেনেছেন বেশ পটু হাতেই।

১৯৭২-৭৫ সালকে লেখক বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন এবং বাংলাদেশিমাত্রই এর কারণ উপলব্ধি করা কঠিন নয়। এই সময় জাতীয় ঐক্য বা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তৈরি করা খুব সহজ ছিল বা গণতান্ত্রিক ভিত তৈরির জন্য জনগণ তুলনামূলকভাবে অধিকতর উপযোগী ছিল। কিন্তু তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সে সুযোগটি হাতছাড়া করেছিল, অন্য কথায় বললে নষ্ট করেছিল। সংসদে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৩টি আসন থাকা সত্ত্বেও ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করেছিল। রাজনৈতিক সহনশীলতা এবং আলোচনার বদলে ভিন্নমতের সব পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। রাজনৈতিক সংঘাতের বর্তমান চেহারার উত্তরাধিকার খুঁজতে গেলে তাই ১৯৭২-৭৫ সময়কালকে আলোচনার বাইরে রাখা উচিত হবে না বলেই লেখক মনে করেন।

রাষ্ট্র এবং গণতন্ত্র

একটি গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যই এ দেশের মানুষ পাকিস্তানি স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক পথেই রাষ্ট্র তার যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বহুদলীয় সরকার পদ্ধতি বিলুপ্ত করে বাকশাল গঠন করা হয়। এর মাধ্যমে স্বাধীন হওয়ার পাঁচ বছরেরও কম সময়ের মধ্যেই রাষ্ট্র স্বাধীনতাসংগ্রামের অন্যতম গণদাবি এবং ১৯৭২ সালের সংবিধানের চার মূলনীতির (জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা) একটি থেকে বাংলাদেশ বিচ্যুত হয়। গণতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্রহীনতাকে আঁকড়ে ধরে বাংলাদেশ। পাকিস্তানের সঙ্গে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামোর পার্থক্য কোথায়, লেখক এই প্রশ্ন তুলেছেন। গণতন্ত্রহীনতার এই রেশ এখনো থেকে গিয়েছে তা হয়তো কেউই অস্বীকার করবে না।

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের অন্যতম দুর্বলতা হচ্ছে এখানে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বজায় রাখার জন্য যেসব প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন, যেমন শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন, নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ, নিরপেক্ষ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ইত্যাদি এখানে গড়ে ওঠেনি বা গড়ে তোলা হয়নি। অন্যদিকে, এসব প্রতিষ্ঠান গড়ার দায়িত্ব যাদের ছিল, অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের সংগঠনের মধ্যেই গণতন্ত্রের চর্চা চালু করতে পারেনি। তার পরিবর্তে ব্যক্তিই দলের হয়ে সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এর ফলও হয়েছে করুণ। মিজানুর রহমান খানের[৪] মতে, 'স্বাধীন বাংলাদেশ যেহেতু গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি রাজনৈতিক দল গঠনের দিকে নজর দেয়নি, তাই সব সময় ব্যক্তিকে ওঠানো ও নামানোর রাজনীতিটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই একদলীয় নয়, বাংলাদেশ আসলে ব্যক্তির শাসনের সংকটে বেশি ভুগছে।'

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য দিনা এম সিদ্দিকী[৫] বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কয়েকটি পরস্পর-সম্পর্কিত প্রতিপাদ্য চিহ্নিত করেছেন। প্রতিপাদ্যগুলো হচ্ছে: ক. সংকটের সময় স্বৈরতান্ত্রিকতাবাদের ওপর নির্ভরতা, খ. সংসদের বাইরে রাজনৈতিক মতপার্থক্য/দ্বন্দ্ব সমাধানের চেষ্টা, গ. জাতীয়তাবাদী মতাদর্শকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বগুলোর প্রতি মানুষের আকর্ষণ, ঘ. রাজনৈতিকভাবে ভিন্নমত পোষণকারীদের

রাষ্ট্রবিরোধী হিসেবে তুলে ধরা এবং ঙ. নির্বাচিত এবং সামরিক উভয় সরকারের আমলেই পৃষ্ঠপোষণের রাজনীতির রমরমা অবস্থা। সিদ্দিকীর মতে, 'এসবের ফলে ক্রমান্বয়ে একধরনের রাজনৈতিক, মতাদর্শিক এবং আচরণগত অন্তঃসারশূন্যতা তৈরি হচ্ছে।'

লেখক বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশের পথে কিছু বাধা চিহ্নিত করেছেন। লেখকের মতে, রাজনৈতিক নেতাদের স্বৈরাচারী চরিত্র, অপরিপক্কতা, গণতন্ত্রের পরিধি ও গভীরতার সীমাবদ্ধতা, নিরপেক্ষ নির্বাচন না হওয়া, জবাবদিহির অভাব, দেশে নাগরিক সংস্কৃতির অভাব, নিরপেক্ষ আমলাতন্ত্রের অনুপস্থিতি ইত্যাদি বাংলাদেশে গণতন্ত্র বিকশিত না হওয়ার অন্যতম কারণ। গণতন্ত্র বিকশিত না হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে নিয়মিত সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া অন্যতম কারণ। বিশেষ করে জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রায়ই ক্ষমতাসীন দল চেষ্টা করে ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরতে এবং এটা নিশ্চিত করার জন্য তারা নানা অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। সর্বশেষ ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং সেনা-সমর্থিত ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। রাজনীতিবিদদের দেউলিয়াপনার কারণেই ১৯৯০ সালের পর সেনাবাহিনী আবার সরাসরি রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পেয়েছিল। এরপর ২০১১ সালের ৩০ জুন তারিখে ক্ষমতাসীন মহাজোট সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে এবং বাংলাদেশের রাজনীতি পুনরায় সংকটের মুখে পড়ে। সর্বশেষ ২০১৪ সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০-দলীয় জোট নির্বাচন বয়কট করে এবং জাতীয় সংসদে ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৪ জন সাংসদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন, যা সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় শুধু বাংলাদেশেই নয়, গোটা বিশ্বেই বিরল। এবার শুধু গণতন্ত্র নয়, গোটা নির্বাচনব্যবস্থাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়! এই সংকটের সমাপ্তিবিন্দুই বলে দেবে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের শেষ পরিণতি কী হয়।

ব্যক্তিত্বের সংঘাত : মুজিব বনাম জিয়া

রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, 'এখানে না আছে সংঘাতের সম্মানজনক মীমাংসার পথ অনুসন্ধানের আগ্রহ বা পরিকল্পনা, না আছে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কৌশলগত দক্ষতা। রাজনৈতিক নেতৃত্ব এখানে নিজ নিজ সংগঠনের কোটরে বসে বিভেদের উঁচু প্রাচীর নির্মাণ করে রেখছে। সে প্রাচীর ভেদ করে আত্মোপলব্ধির

জাগরণ অসম্ভব' (পৃ. ২১৫-১৬)। বাংলাদেশে রাজনীতিতে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বের ধ্রুপদি উদাহরণ হচ্ছে মুজিব বনাম জিয়া দ্বন্দ্ব। যদিও তাঁরা দুজন বেঁচে থাকার সময় তাঁদের মধ্যে কখনো সামনাসামনি বা পরোক্ষভাবে এই নিয়ে বিতণ্ডা হয়েছে, তার কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই। তবে অনেকে মনে করেন মুজিবের হত্যাকাণ্ডে জিয়ার প্রত্যক্ষ সায় ছিল বা জিয়া আগে থেকেই হত্যা পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এ নিয়ে অনেক জল ঘোলা করা হয়েছে। কোনো গবেষণা বা সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই একদল মুজিবকে বিতর্কের ঊর্ধ্বে ভাবছে, অন্যদল তাঁর প্রতিপক্ষ হিসেবে জিয়াকে দাঁড় করিয়ে, তাঁকে মুজিবের সমকক্ষ বা প্রতিপক্ষ বানানোর প্রয়াস নিয়েছে, এ দুটি প্রচেষ্টাকেই ভ্রান্ত হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি এবং অগ্রনায়ক, সে বিষয়ে কোনো ধরনের বিরোধ থাকার অবকাশ নেই। মুজিবনগর সরকার বঙ্গবন্ধুর নামেই এবং তাঁকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান মেনেই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল। অনেক ভুল-ভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও মুজিবই আমাদের প্রধান জাতীয় নেতা। অন্যদিকে জিয়াউর রহমানের অনেক কর্মকাণ্ড নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, তিনি যে একজন জনপ্রিয় রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন তা বোধ করি অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে দুই নেতাই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। লেখকের মতে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডটি শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল না, তা ছিল মুজিবের রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ও শাসননীতির প্রতিও আঘাত। এটি প্রমাণিত হয় তাঁর পরিবারের সদস্যদের এবং জাতীয় চার নেতার (সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামান) হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে জেনারেল জিয়ার পতনের ও হত্যাকাণ্ডের বীজ রোপিত ছিল তাঁর শাসনক্ষমতা গ্রহণের মধ্যেই। লেখকের মতে, 'যে রাজনৈতিক কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্রের আঁকাবাঁকা পথ ধরে জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন, সেই পথেই তাঁর দৈহিক ও রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে' (পৃ. ২২০)।

একটা বিষয় বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতিতে সত্য যে মুজিব এবং জিয়ার মতো শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়াও তাঁদের নিজ নিজ দলে রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিকভাবে একক আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন। আজও তাঁদের ডাকে হাজার হাজার মানুষ রাজপথে নামতে ইচ্ছুক। ফলে জনপ্রিয়তার প্রশ্নে তাঁরাই বাংলাদেশের রাজনীতির দুই অভিভাবক। অন্যদিকে ইতিহাস যে রকমই হোক না কেন মুজিব এবং জিয়া বাংলাদেশের রাজনীতির দুই ঐতিহাসিক রাষ্ট্রনেতা। লেখকের মতে, 'বাংলাদেশের মানুষের মনে, যেভাবেই হোক, এই বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে যে শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমান উভয়ই জাতির জন্য

অপরিহার্য। উভয়েরই ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই রয়েছে' (পৃ. ২২৭)। কিন্তু, তাঁদের ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করা বা সমকক্ষ মনে করা চূড়ান্ত বোকামির কাজ। শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়ার ক্ষেত্রেও প্রায় একই কথাই প্রযোজ্য। যদিও বর্তমানে নেতৃত্ব, দূরদর্শিতা এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে তৎপরতায় শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়াকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গিয়েছেন বলা বোধকরি অন্যায্য হবে না। অন্যদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে জাতীয় চার নেতার রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক অবদানকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ কোনো একক প্রচেষ্টা ছিল না, এটা ছিল বাংলাদেশের মানুষের একটি সম্মিলিত প্রয়াস।

গ্রাম-শহরের বিরোধ

বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত মূলত গ্রামনির্ভর রাষ্ট্র। বর্তমানের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শহরে বাস করলেও, প্রায় প্রত্যেকেরই গ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। এখনো ঈদ বা পূজার মতো ধর্মীয় উৎসবগুলোতে লাখো মানুষ ঢাকা-চট্টগ্রামের মতো বড় শহরগুলো থেকে গ্রামের বাড়িতে ফিরে যায়। এই বন্ধন সত্ত্বেও, লেখকের মতে গ্রাম ও শহরের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন বিরোধ বিদ্যমান। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক বলেছেন, মনোজাগতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শহর তার উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রামের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সমাজকাঠামোয় পরিবর্তন নিয়ে আসবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশি বুর্জোয়া শ্রেণির অপরিণত বিকাশের ফলে প্রয়োজনীয় মনোজাগতিক বিকাশ এখনো এখানে অপরিপক্ব। ফলে গ্রামকে প্রভাবিত করা দূরে থাক, তারা নিজেরাও নাগরিক সচেতনতার মূলমন্ত্র আত্মস্থ করতে পারেনি।

অন্যদিকে প্রকৃত শিক্ষার অভাব এবং আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক নানা কারণে বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন এখনো অনেকটাই রক্ষণশীল। এই রক্ষণশীলতার অন্যতম একটি উপাদান হচ্ছে ধর্মীয় বিষয়গুলোতে বিদ্যমান মারাত্মক স্পর্শকাতরতা। এই ধর্মীয় স্পর্শকাতরতা থেকে শহরের মানুষও মুক্ত নয়, কারণ তাদের অধিকাংশই মূলত অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত কারণে গ্রাম থেকে সরাসরি শহরে এসেছে। ফলে একদিকে শহুরে আধুনিকতা এবং অন্যদিকে গ্রামীণ রক্ষণশীলতা একধরনের দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছে। লেখকের মতে, 'সমাজে সমস্যা-সংকট, পশ্চাৎপদতা বা অনুন্নয়ন, অনাচার, দুর্নীতি প্রতিকারের অন্য কোনো আদর্শ না থাকায়, ধর্মীয় চেতনা রাজনৈতিক ভাষায় পরিণত হয়েছে' (পৃ. ২৯২)। অনেক ক্ষেত্রেই এই দ্বন্দ্ব ব্যক্তি পর্যায়ে সুপ্ত থাকলেও, জাতীয় রাজনৈতিক

এবং সামাজিক কাঠামো এর থেকে পরিত্রাণ পায় না, কারণ এসব ব্যক্তির সমন্বয়েই বৃহত্তর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে মনোজাগতিক সমৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য না থাকায়, গ্রামের ওপর শহরের প্রভাব প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প। এই স্বল্পতা একধরনের ভারসাম্যহীনতা ও দ্বান্দ্বিকতার জন্ম দিয়েছে। এই দ্বান্দ্বিকতার প্রশমন কীভাবে হবে, তা অনেকটা জাতিরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গতিপথের ওপরই নির্ভর করবে।

শেষ কথা : সংঘাত নিরসনের পথ

এটি শেষ অধ্যায়ের শিরোনাম। এই অধ্যায়ে বইটিতে আলোচিত দ্বন্দ্বগুলো সমাধানে লেখক কিছু সুনির্দিষ্ট সমাধানের পথ বাতলে দিয়েছেন। সমাধানগুলোর মধ্যে পাঠক অতটা নতুনত্ব খুঁজে নাও পেতে পারেন। এসব সমাধানের কথা আমরা বিগত আড়াই দশক অর্থাৎ ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকেই শুনে আসছি। সমাধানের এসব পথের অধিকাংশের সঙ্গেই একমত হলেও, কিছু বিষয় নিয়ে সচেতন পাঠক দ্বিমত পোষণ না করে হয়তো মানসিক শান্তি পাবেন না। বিদ্যমান দ্বন্দ্বগুলো সমাধানে লেখক একধরনের সামাজিক চুক্তির কথা বলেছেন, যার মাধ্যমে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে মতৈক্য ঘোষণা করবে। লেখকের মতে, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সব কর্মকাণ্ড মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে পরিচালিত হবে...' (পৃ. ৩০০)। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস হচ্ছে, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' এই প্রপঞ্চটির সংজ্ঞায়ন নিয়েও এখনো রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রকে[৬] মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূল দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেটি একটি চমৎকার পথ হতে পারে। কিন্তু যাঁরা এই দাবির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করবেন তাঁদের ক্ষেত্রে সংজ্ঞায়নের এই দ্বন্দ্বটি থেকেই যাচ্ছে।

অন্য একটি বিষয় আলোচনায় আনা জরুরি মনে করছি। বিষয়টি বেশ স্পর্শকাতর এবং ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়ে এবং বিগত বছরগুলোতে যেকোনো ব্যক্তিকে, যিনি শাসকদলের কোনো মতামত, নীতি বা সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, তাকে বা তাদের 'স্বাধীনতাবিরোধী' বা 'দেশদ্রোহী' বা 'পাকিস্তানের দালাল' ইত্যাদি অভিধায় চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও এই সংস্কৃতি নতুন কিছু নয়। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী ঘোষণা করেন যারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ভোট দেবে তারা 'রাজাকার' এবং 'স্বাধীনতার শত্রু'।[৭] বিগত বিএনপি এবং তারপর চারদলীয় জোটের শাসনকালেও যখনই কেউ তাদের সমালোচনা করেছে, তাদের গণহারে 'ভারতের দালাল' বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'ইসলামের শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করা

হয়েছে। এখন যদি আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মতো মৌলিক বিষয়গুলোতে জাতীয় মতৈক্যে পৌঁছাতে পারি, তবে এসব অসার বাক্যবিনিময় রাজনীতিতে কিছুটা হলেও কমবে বলে আশা করা যায়। কারণ মনে রাখতে হবে, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম চেতনা বা প্রেরণা ছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গনির্বিশেষে গণতান্ত্রিক এবং শোষণমুক্ত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা। যেখানে দ্বিমতের এবং যুক্তিযুক্ত বিরোধিতার যথেষ্ট স্থান থাকবে। এর প্রমাণ হিসেবে আবারও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের কথা টানতে হয়। মুক্তিযুদ্ধের অনেকগুলো রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণ থাকলেও, মূলত ১৯৭০ সালের পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে গণতান্ত্রিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পরও আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে না দেওয়াই এবং ২৫ মার্চের কালরাতে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর নির্মম গণহত্যার ঘটনাই মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে কাজ করেছিল।[৮]

রাজনৈতিক ও সামাজিক চুক্তি বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ[৯] কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তুলে ধরেছেন। সেই প্রস্তাবগুলো বিবেচনাযোগ্য, তাই প্রস্তাবগুলো এখানে হুবহু তুলে ধরছি। আহমেদের মতে এই চুক্তি বা রাজনৈতিক মতৈক্যের বিষয়গুলো হতে পারে :

'১. ১৯৭১-এর ব্যাপারে কোনো আপস না করা। যেমন: যুদ্ধাপরাধ যদি কেউ করে, সেই অপরাধকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবেই দেখতে হবে। তবে একে যেন দলীয় রাজনীতির অংশ হিসেবে না দেখা হয়, তথা এর রাজনৈতিকীকরণ করা যাবে না। এ বিষয়টিকে নির্বাচন বা রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখতে হবে। যেহেতু এটা জনগণের দাবি, তাই আইনের শাসনের অংশ হিসেবেই একে দেখতে হবে। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

২. জাতির পিতার ব্যাপারে, তাঁর অবদানের স্বীকৃতি বিষয়ে জাতীয়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে।

৩. বাংলাদেশের ফাউন্ডিং হিরো তথা প্রতিষ্ঠা নায়কেরা যেমন মাওলানা ভাসানী, তাজউদ্দীন আহমদ, জিয়াউর রহমানসহ যাঁরা স্বাধীনতাসংগ্রামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় অবদান রেখেছেন, তাঁদের উচ্চসম্মানের আসন দিতে হবে, পরে তাঁদের ভূমিকা যা-ই হোক।

৪. ঘৃণা-বিদ্বেষের ভাষণ তথা 'হেইট স্পিচ' থেকে বিরত থাকা। সেটা সংসদের ভেতরে বা বাইরে যেখানেই করা হোক। রাজনৈতিক নেতা, সরকারি কর্মকর্তা, সিভিল সোসাইটি বা অন্য যেখানেই কেউ থাকুন, সবাইকেই এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল হতে হবে।

৫. হরতাল ডাকা যেতে পারে, কিন্তু পিকেটিং করা বা কাউকে বাধ্য করা যাবে না। একে জনগণের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। পিকেটিং বা সহিংসতা হলে তা ফৌজদারি অপরাধ বলে গণ্য হবে।

৬. দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক দল যেহেতু জনগণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়, সেহেতু তারা বলতে পারে না তারা নিজেদের মতো করে দলের নিয়মকানুন ঠিক করে নেবে। সব দলীয় পদে দলীয় নির্বাচন দিতে হবে এবং কোনো নেতা এক পদে দুই মেয়াদের বেশি থাকতে পারবেন না। ওই পদে ফিরে আসতে হলে তাঁকে মাঝখানে বিরতি দিয়ে আসতে হবে।

৭. সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসনের জোরে সংবিধান সংশোধন করা যাবে না। দেখা যায় ৫০ শতাংশের কম ভোট পেয়ে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সম্ভব। সুতরাং মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে গণভোট দিতে হবে।'

অন্যদিকে ১৯৯০ সালে তিনজোটের (আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং বাম দলগুলো) যে রূপরেখা সেটাকেও সমস্যা সমাধানের পথ হিসেবে বিবেচনা করা যায়, যদিও তাতে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র মতো আদর্শিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রওনক জাহানের মতে, এ ধরনের চুক্তি সম্পাদনের জন্য বর্তমান সময় ১৯৯০ সালের তুলনায় বেশ ভিন্ন। জাহানের মতে, ১৯৯০ সালে জোটগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য ছাত্রসংগঠনগুলো ছিল এবং সমঝোতার কাজটি করেছিল বাম দলগুলো; বর্তমানে যার কোনোটিই আগের মতো সংগঠিত এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নয়। তবে তিনি সমাধানের একটি পথও বাতলে দিয়েছেন। তাঁর মতে, এ ক্ষেত্রে বর্তমান ক্ষমতাসীন জোটের নেতা শেখ হাসিনাকেই এগিয়ে আসতে হবে। জাহান মনে করেন, 'এই পরিস্থিতিতে স্রেফ আওয়ামী লীগের নেতা শেখ হাসিনা যদি মনে করেন, বিএনপির কিছু দাবি মেনে নিলে তাঁর আলোকিত স্বার্থ সংরক্ষিত হবে, তাহলেই কোনো ঐকমত্য হতে পারে'।[১০]

'গণতন্ত্রায়ণ-সংক্রান্ত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা'র আওতায় লেখক অন্যান্যের মধ্যে একটি বিষয় সুপারিশ করেছেন: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধকরণ। প্রথমত, এটা স্বীকার করে নিতে হবে যে বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্তমানে ছাত্ররাজনীতি একটি আতঙ্কের নাম। প্রায় সময়ই বিবদমান দলগুলোর মধ্যে বা একই দলের বিবদমান উপদলগুলোর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে। এতে শুধু শিক্ষার পরিবেশই ব্যাহত হচ্ছে তা-ই নয়, প্রায়ই শিক্ষার্থীরা গুরুতরভাবে আহত হন এবং নিহত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ছাত্ররাজনীতি

বন্ধ করে দিলেই এসব দ্বন্দ্বের সমাপ্তি হবে কি না এবং এর চেয়েও মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে 'ছাত্ররাজনীতি'র নামে যা করা হচ্ছে, তা আদৌ রাজনীতির কোনো সংজ্ঞায়নে পড়ে কি না। ঐতিহাসিকভাবেই আমাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কিছুটা সংঘর্ষপ্রবণ, লেখক তাত্ত্বিকভাবে তা ব্যাখ্যাও করেছেন। কিন্তু এই যুক্তিতে প্রতিপক্ষকে দিনের আলোয় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এবং কোনো কোনো সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সামনেই হত্যা করাকে জায়েজ করা যায় না। তাই নিষিদ্ধকরণের পরিবর্তে মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ছাত্ররাজনীতির পুনর্গঠন। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোকেই উদ্যোগী হতে হবে। ক্যাম্পাসে সংঘর্ষকে নিছক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে বিবেচনা করে প্রচলিত আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। যদিও রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হবে, তবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চাইলে এসব বাধা উপেক্ষা করা অসম্ভব নয় বলেই আশা করি।

উপসংহার

নিত্যদিনের হাজারো সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাওয়ার এক সহজাত প্রবৃত্তি আছে বাংলাদেশের মানুষের। স্বাধীনতা অর্জনের পাঁচ বছরের মধ্যেই একটি বড় দুর্ভিক্ষ, তিনটি সফল সামরিক অভ্যুত্থান, ৩০টি ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান এবং চারটি ভয়াবহ বন্যার পরও বাংলাদেশ তার তলাবিহীন ঝুড়ি হওয়ার দুর্নাম দূর করতে সক্ষম হয়েছে।[১১] এ দেশের মানুষের অমিত সম্ভাবনা এবং প্রাণশক্তির জোরেই, সুষ্ঠু শাসনের এত অভাব এবং দুর্নীতির রমরমা অবস্থা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রায় সবগুলো সূচকেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাবে বাংলাদেশ তার যোগ্য সম্ভাবনা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারছে না। রাজনৈতিক সংঘাত এবং দুর্বৃত্তপরায়ণতার সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে একদল ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদ, যারা ব্যক্তিস্বার্থের জন্য রাষ্ট্রকে ব্যবহার করছে। অন্যদিকে, শাসকশ্রেণি তার একাধিপত্য ধরে রাখতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কায়েম করছে ত্রাসের রাজত্ব। এরপরও আমরা আশাবাদী। আশার পাখায় ভর করেই আমরা আগামীর পথ চলতে চাই। এই প্রসঙ্গে মিয়ানমারের গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অং সান সু চির কিছু কথা আমাদের আশার ভিত্তিমূলকে আরও দৃঢ় করতে পারে। সু চি তাঁর *'ভয় থেকে মুক্তি'* শীর্ষক এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'যখন মানুষের মৌলিক মানবাধিকার অস্বীকার করা হয়, তখন ভয়ই নিয়মে পরিণত হয়। কিন্তু মানুষের পক্ষে কখনোই পুরোপুরি ভয়ের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। সে কারণেই এমনকি কঠিনতম সময়েও সাহসে ভর করে জেগে ওঠে মানুষ। কারণ ভয় তার সহজাত প্রবৃত্তি নয়, বরং সাহসই তার সহজাত'।[১২]

আমরা আশা করি, বাংলাদেশ অচিরেই সব ধরনের রাজনৈতিক সংঘাত সমাধানের প্রচেষ্টা শুরু করবে এবং এ ক্ষেত্রে বদরুল আলম খানের *'সংঘাতময় বাংলাদেশ, অতীত থেকে বর্তমান'* গ্রন্থটি হবে একটি সময়োপযোগী দিকনির্দেশক।

তথ্যসূত্র :

১. শেখ মুজিবুর রহমান (২০১২), *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ.২১৩।

২. সুলতানা কামাল (২০১৫), 'ভয়ের সংস্কৃতি বনাম মানবাধিকার সংস্কৃতি', আসক বুলেটিন, মার্চ, ২০১৫, ঢাকা।

৩. সংসদে অশালীন ভাষা, দৈনিক *যুগান্তর*, ২২ জুন, ২০১৩. http://www.jugantor.com/editorial/2013/06/22/7203 (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ২২ ডিসেম্বর, ২০১৫)।

৪. মিজানুর রহমান খান (২০১৫), *স্বায়ত্তশাসন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও গণতন্ত্র, প্রতিচিন্তা*, অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা ২০১৫, পৃ. ১৫১-১৭৪।

৫. দেখুন Dina Mahnaz Siddiqi, Political Culture in Contemporary Bangladesh: Histories, ruptures and contradictions, in Ali Riaz and C. Christine Fair (edt.) (2011), *Political Islam and Governance in Bangladesh*, Routledge, New York.

৬. ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, সপ্তম তফসিল [১৫০(২) অনুচ্ছেদ], গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১১।

৭. দেখুন Muntassir Mamoon and Jayanta Kumar Ray (1996), Civil Society in Bangladesh: Resilience and Retreat, firma KLM, Calcutta, p. 106. বর্ণিত হয়েছে, Dina Mahnaz Siddiqi, Political Culture in Contemporary Bangladesh: Histories, ruptures and contradictions, in Ali Riaz and C. Christine Fair (edt.) (2011), *Political Islam and Governance in Bangladesh*, Routledge, New York.

৮. সলিমুল্লাহ খান (২০১৪), মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, www.bdnews24.com http://opinion.bdnews24.com/bangle/archives/16290 (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ২০ ডিসেম্বর, ২০১৫)।

৯. ইমতিয়াজ আহমেদ, রাজনৈতিক এবং সামাজিক চুক্তি জরুরি, *প্রথম আলো*, ২২ ডিসেম্বর, ২০১৫।

১০. রওনক জাহান, গণতান্ত্রিক উত্তরণের ২৫ বছর, *প্রথম আলো*, ২২ ডিসেম্বর, ২০১৫।

১১. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশ প্যারাডক্স : বাংলাদেশ নামক ধাঁধা, *প্রথম আলো*, নববর্ষ সংখ্যা ১৪২০ বঙ্গাব্দ, ১৪ এপ্রিল, ২০১৩।

১২. উদ্ধৃত হয়েছে, সুলতানা কামাল, আসক বুলেটিন, মার্চ ২০১৫।

লেখক পরিচিতি

মির্জা হাসান

সমাজবিজ্ঞানী এবং বর্তমানে ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনব্যবস্থা-বিষয়ক অ্যাডজাংক্ট ফেলো। পড়াশোনা করেছেন ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন এবং এমআইটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। তাঁর গবেষণা মূলত রাজনৈতিক উন্নয়ন, বেসরকারি খাতের উন্নয়ন, জাতীয় ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থা এবং দক্ষিণ এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিচারব্যবস্থা ও মানবাধিকার বিষয়ে রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ।

সোহেলা নাজনীন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (আইডিএস) ফেলো হিসেবে কর্মরত আছেন। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা ভয়েসিং ডিমান্ডস : ফেমেনিস্ট অ্যাক্টিভিজম ইন ট্রান্সন্যাশনাল কনটেক্সটস (জেড বুকস, ২০১৪)। গবেষণার বিষয়: জেন্ডার এবং শাসনব্যবস্থা, জীবিকা, সামাজিক আন্দোলন, রাজনৈতিক অর্থনীতি ইত্যাদি।

এম এম আকাশ

অর্থনীতিবিদ ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক। কৃষি খাত ও অর্থনীতির নানা বিষয়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা *বাংলাদেশের অর্থনীতি: অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ* (প্যাপিরাস, ২০০৪); *ভাষা আন্দোলন: শ্রেণীভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ* (ইউপিএল, ১৯৯০); [যৌথ] *রিফর্ম অব স্টেট ওন্ড এন্টারপ্রাইজেস অ্যান্ড প্রাইভেটাইজেশন* (পাঠক সমাবেশ ও সিপিডি, ১৯৯৮)।

আলী রিয়াজ

লেখক ও গবেষক। ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির পলিটিকস অ্যান্ড গভর্নমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক। ক্লেফিন ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব লিঙ্কন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক। বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা *রিলিজিওন অ্যান্ড পলিটিকস ইন সাউথ এশিয়া* (রুটলেজ, ২০১০); *ফেইথফুল এডুকেশন: মাদ্রাসা ইন সাউথ এশিয়া* (রাটগার্স ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৮); *ইসলামিস্ট মিলিট্যান্সি ইন বাংলাদেশ: আ কমপ্লেক্স ওয়েব* (রুটলেজ, ২০০৮); *ইসলাম অ্যান্ড আইডেন্টিটি পলিটিক্স অ্যামাং ব্রিটিশ বাংলাদেশিজ: অ্যা লিপ অব ফেইথ* (ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৩)।

শাহাদুজ্জামান

শাহাদুজ্জামানের জন্ম ১৯৬০ সালে ঢাকায়। গল্প এবং উপন্যাস তাঁর কাজের প্রধান ক্ষেত্র হলেও গবেষণা, অনুবাদ, ভ্রমণ এবং প্রবন্ধ সাহিত্যেও উল্লেখযোগ্য রচনা রয়েছে তাঁর। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করার পর চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছেন উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্পে। পরবর্তীকালে জনস্বাস্থ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এবং নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা নৃবিজ্ঞানে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। তিনি দীর্ঘদিন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যের নিউক্যাসল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

আরিফ রহমান

তরুণ মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষক। ১৯৯২ সালের ১২ মে ঢাকাতে জন্ম। মুক্তমনা ব্লগ, বিডি নিউজে নিয়মিত কলাম লেখার পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়ও তাঁর লেখা মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। পেশাগত জীবনে তিনি এখনো ছাত্র। বর্তমানে তিনি জাতীয় বস্ত্র প্রকৌশল ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে বস্ত্র প্রকৌশলে চতুর্থ বর্ষে অধ্যয়ন করছেন। তাঁর লেখা বই *ত্রিশ লক্ষ শহিদ: বাহুল্য নাকি বাস্তবতা* (২০১৫) প্রকাশিত হয়েছে সময় প্রকাশন থেকে।

মো. ফজলে রাব্বি

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাস, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র অধ্যয়ন, মিয়ানমার, আর্কাইভস এবং সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণারত। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক দ্বৈমাসিক পত্রিকা *ফরেন অ্যাফেয়ার্স ইনসাইটস অ্যান্ড রিভিউস*-এর (এফএআইআর) সদস্য সম্পাদক এবং ল্যাঙ্কেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়-ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ গবেষণা প্রকল্পে জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী হিসেবে কর্মরত আছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়ন করেছেন। ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ও মিয়ানমার বিষয়ে ইংরেজি দৈনিক *দ্য ডেইলি সান, দ্য ডেইলি স্টার ও ফরেন অ্যাফেয়ার্স ইনসাইটস অ্যান্ড রিভিউস*-এ একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

গোলাম মুস্তাফা

বর্তমানে *প্রতিচিন্তার* সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করছেন। নিয়মিত পেশাদার অনুবাদক। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়ন করেছেন। গবেষণার আগ্রহের মূল বিষয়গুলো হচ্ছে বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস, সেক্যুলারিজম, রাজনীতি এবং ধর্ম, সিভিল-মিলিটারি সম্পর্ক, বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক এবং সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধ্যয়নের বিভিন্ন তত্ত্ব।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তা*র গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। অফিসে সরাসরি উপস্থিত হলেই শুধু নগদ টাকা গ্রহণ করা হবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুই শত) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চার শত) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/ বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/ দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/ পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রসিদ দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ (সিএ ভবন), কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৮১